ার মত

নেন

ল

এ দেশের মেয়ে

শারদ অর্ঘ—১৩৭১

[মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত এবং মেয়েদের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত]

তৃতীয়বর্ষ মহাষষ্ঠী—১৩৭৭

সম্পাদনা :

বেলা দে

প্রকাশনায় :

সীমা রায়

দাম :—দুই টাকা

রিগ্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩৮।১এ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬
হইতে সম্পাদিকা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

CALCUTTA UNIVERSITY PUBLICATIONS

1. Bhakti Cult & Ancient Indian Geography : Edited by D. C. Sircar — Rs. 12·50
2. Course of Geometry By Dr. R. N. Sen. — ,, 25·00
3. Classical Indian Philosophy : By Dr. Satish Chandra Chatterjee — ,, 5·50
4. Dictionary of Indian History : By Sachchidananda Bhattacharya — ,, 40·00
5. Education & the Nation : By Prof. Khagendra Nath Sen. — ,, 30·00
6. Foreigners in Ancient India & Laksmi and Sarasvati in Art & Literature Edited by D. C. Sircar. — ,, 12·00
7. Fundamental of Hinduism : By Dr. S. C. Chatterjee. — ,, 5·00
8. গোবিন্দ বিজয় (অভিরাম দাস বিরচিত) ডঃ পীযুষকান্তি মহাপাত্র কর্তৃক সম্পাদিত — ,, 25·00
9. Studies on Hindi Idioms (HINDI MUHABARE) By Dr. Protiva Agrawal — ,, 75·C0
10. Indian Religion (Girish Ghosh Lecture) By Dr. Ramesh Ch. Mazumdar. — ,, 3·00
11. Illusion & its Corrections : By Dr Jatil Coomar Mukherjee — ,, 20·00
12. মহাভারত (কবি সঞ্জয় বিরচিত) ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ — ,, 40·00
13. কৃষি বিজ্ঞান ১ম খণ্ড (কৃষির মূলনীতি) By রায়বাহাদুর রাজেশ্বর দাসগুপ্ত — ,, 10·00
14. ফাউস্ত : (মহাকবি গন্থের বঙ্গানুবাদ) : শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অনুদিত — ,, 8·00
15. Poison & Poisoning (Kshentamani & Nagendralal Memorial Lec. 1966) By Dr. K. N. Bagchi — ,, 7·50
16. Songs of Live & Death : By Manomohan Ghose — ,, 8·00
17. First, Second & Third Tibetian Reader : By L. M. Dorji — ,, 5·00 (Each)
18. শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত : শ্রীগুরুসদয় দত্ত ও ডঃ নির্ম্মলেন্দু ভৌমিক কর্তৃক সম্পাদিত — ,, 15·00
16. Old Bengali Language & Text : By Dr Tarapada Mukherjee — ,, 12·00
20. Towards the Unification of Faith : By G. P. Conger — ,, 6·00

For Further Details : Please Enquire :

PUBLICATION DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CALCUTTA

48, Hazra Road. Calcutta-19

সম্পাদিকার নিবেদন—

পরিচিত শরতের হাসি ছড়িয়ে আকাশ আজ সমুজ্জ্বল। তার বুক থেকে মুছে গেছে বিগতদিনের বেদনার চিহ্ন। বাঙ্গালীর ঘরে আজ ধ্বনিত হচ্ছে আগমনীর গান। মাতৃপূজা সমাগত। কিন্তু বাংলা দেশে এবারে উৎসবের মধ্যেও একটা করুণতার রেশ থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জের এখনো কাটেনি। যাঁরা বন্যার ফলে আর্ত ও ক্লিষ্ট হয়েছেন তাঁরা কি করে আগমনীর এই মহোৎসবে অন্য সকলের সঙ্গে যোগ দেবেন? আনন্দময়ীর আগমনে যখন আনন্দে সারা দেশ ছেয়ে যায় তখনো ধনীর দুয়ারে অপেক্ষমানা দুঃখী কাঙ্গালিনী মেয়েটির মলিন মুখের ছবিটি কবির তুলিতে অক্ষয় হয়ে আছে। উৎসব তখনই সুন্দর হয় যখন সবাই একসঙ্গে সেই উৎসবে যোগদানে করতে পারে। তবুও আমাদের যত বেদনা যত সমস্যাই থাক উৎসবের লগ্নে তাকে আমরা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়ে আনন্দকেই সত্য বলে বরণ করবো। সকলের জন্য প্রার্থনা জানাব এই আনন্দ চিরস্থায়ী হোক। আমাদের দুঃখ-দৈন্যের হোক অবসান। মানুষ কল্যাণবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হোক্ প্রীতির বন্ধনে।

প্রতি বছরের মতো এবারেও ‘এ দেশের মেয়ে’ শারদ সংকলন প্রকাশিত হলো। শিল্পী ও শিল্পের সমাদর জনসাধারণের হাতে তাই তারাই বিচার করবেন জাতীয় জীবনে ভারতীয় নারী প্রতিভা কতখানি বিকশিত হয়েছে এই বিশেষ শারদ সংকলের মাধ্যমে। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করবো সকলের ঋণ যারা আমাকে এই অর্ঘ রচনায় নানাভাবে সহযোগিতা করছেন।

মায়ের আগমনীর সুরে যে আনন্দ, যে সান্ত্বনা এবং শান্তি তা বিরাজ করুক সকল মানুষের মনে—এই হোক সকলের মিলিত প্রার্থনা—

প্রতিদিন সংসারে কর্মশালার দ্বার প্রথম কে উদ্ঘাটন করে? গৃহলক্ষ্মী নারী। যখন সকলেই নিদ্রিত তখন জীবধাত্রী ধরণীর এই জাগরণ-কালের প্রথম ব্যবস্থা করিবার জন্য শয়ন গৃহ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসেন। জাগ্রত জগতের স্নান-পান, পোষণ-তোষণের জন্য দিবসের প্রথমেই রমণীগণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দেন। এই যে প্রতিদিনের প্রয়োজন সমাধার জন্য—এই যে প্রতিদিনের মঙ্গল সাধনের জন্য সংসারে রমণীর প্রথম জাগরণ, প্রথম উদ্যোগ—ইহার দ্বারাই জগতের প্রত্যেক দিবস পবিত্র হইয়াছে।

—রবীন্দ্রনাথ

দুর্গোৎসবের রূপান্তর

সুনীতি গুপ্ত

এখন যাঁদের বয়স অর্দ্ধ শতাব্দীর উর্দ্ধে দুর্গোৎসবের একটা আলাদা চেহারা আছে তাঁদের চোখে। তখন সহরের অলিতে গলিতে এমন বারো-য়ারীর হিড়িক ছিল না। বেশীর ভাগ পূজোই অনুষ্ঠিত হোত ধনীদের পারি-বারিক উদ্যোগে। সেই উপলক্ষে যাত্রা, কবিগান, আত্মীয়-স্বজনের ভোজন, কাঙ্গালী ভোজন হোত। এখনকার মতে তখন গৃহস্থরা সদলবলে পূজোর ছুটীর কদিন হাওয়া বদলেও যেতেন না। যাঁরা গ্রামের মানুষ তাঁরা এই সময় স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেশে যেতেন। এত আলো বাজী বাজনা কেনাকাটা হৈ-চৈ কিছুই ছিল না। তবু মানুষের মনে ছিল পূজোর আনন্দ পুরোমাত্রায়।

আজ দেশের জীবনযাত্রায় দেখা দিয়েছে কত পরিবর্ত্তন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তা দেওয়াই স্বাভাবিক কারণ সময় থেমে থাকে না। সময়ের ধর্মে সব কিছুর মত পূজোরও হয়েছে রূপান্তর। প্রথমতঃ পারিবারিক পূজো প্রায় উঠেই গেছে। তার জায়গায় পাইকারী হারে বারোয়ারী পূজোর অনুষ্ঠান এবং ক্লাব পাঠাগার, পথ, পার্ক সর্বত্র আজ পূজামণ্ডপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পূজোর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দিকটা সঙ্কুচিত হয়েছে প্রাধান্য নিয়েছে উৎসবের অংশটা।

অভিজাতদের দালান থেকে পূজোকে সার্বজনীনে নামিয়ে এনে দুর্গোৎ-সবের যেমন গণতান্ত্রীকরণ ঘটানো হয়েছে তেমনি প্রতিমা রচনাতেও এখন চিরাচরিত ধারা পরিহার করে সৌন্দর্য্য ও শিল্প রুচিকেই দেওয়া হয়েছে বেশী অগ্রাধিকার। অনেকের সেকেলে মন হয়তো প্রতিমার এই সাধারণী-করণে অপ্রসন্ন হয় কিন্তু কালপ্রবণতা এতে দোষের কিছু দেখে না।

শুধু এইটুকুরই পরিবর্ত্তন নয়, পরিবর্ত্ত এসেছে পোষাকে প্রসাধনে, খাদ্যে,

পানীয়ে, চলাফেরাতে পর্যন্ত। আজকের পূজামেদ্রীদের সঙ্গে পুরনোদের গরমিল যতটা, মিল তার চেয়ে অনেক কম। বড় পরিবর্তনের কথাটা আগেই জানিয়েছি। আগেকার সহুরেরা পুজোয় গ্রামে যেতেন। আজ পারলে বেশীর ভাগই সমুদ্রতীর, পাহাড়ে পাড়ি দেন। অন্ততঃ পক্ষে দীঘা, দেওঘর, মধুপুর, রাজগার কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসেন। পুজো সম্বন্ধে সেদিনের মানুষের এই নির্লিপ্ততা সেদিন ছিল না।

তখনকার দিনে পূজোর আসরে যাত্রা হোত, পাঁচালী হোত, একটু আধুনিকেরা মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার করতেন। তাছাড়া পেশাদার মঞ্চে ও নতুন নতুন নাটক খোলা হোত। সিনেমা তখন জন্মায় নি। এখন পুজো উপলক্ষে সিনেমার মহলই হয় সবচেয়ে বেশী জমজমাট। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেরয় দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক সমস্ত পত্র পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা। আজ-কাল আবার 'মিনি' পত্রিকাও মাথা তুলে দাঁড়াল সবার উপরে। অর্থাৎ পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয় এবং আমোদ প্রমোদের মতো সাহিত্যের দুনিয়াতেও আসে পুজো উপলক্ষে মস্ত একটা বাড় বাড়ন্তের জোয়ার। এটা একালের বৈশিষ্ট্য।

এর কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তা নিয়ে তর্ক তোলা নিষ্ফল। আজকের মানুষ এর মধ্যেই নিশ্চয়ই নতুন নতুন উপভোগের পাথেয় পাচ্ছেন, লাভ করছেন করছেন নতুন নতুন আনন্দের সঞ্চয়। আজকের এই দিনগুলির আনন্দময় স্মৃতি রোমন্থন কর্ব্বেন আগামীদিনের পরিণত বয়স্করা। তবে এই টুকুই সর্বাগ্রে লক্ষ্যণীয় যে সহস্র ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও দুর্গোৎসব আমাদের জীবনে আজ পর্যন্ত জাগ্রত সত্য হয়ে রয়েছে এবং তার আবেদন ছোট বড় সকলের অন্তরকেই সমান নাড়া দিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের স্তরে বাংলা কথা-সাহিত্যের আসন বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। মানব জীবনকে কেন্দ্র করে বর্ত্তমান গল্প সাহিত্যের আরম্ভ। তবে যুগের পরিবর্ত্তনে ছোটগল্পেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তবুও পাঠকমন ছোট গল্প পড়তেই বেশী ভালবাসে। বাংলার কয়েকজন সাহিত্যিকের লেখা ছোট গল্পের মালা গেঁথে আপনাদের উপহার দিলাম।

আমি স্টেলা বলছি !

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভিক্টর আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তাই বলে ও আমাকে ত্যাগ করে নি। শুধু স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। বাধা—ওর বোন। বোন মানে সহোদরা নয়—ওর মায়ের প্রথম বিবাহের সন্তান।

আমি কষ্ট পেলাম সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু ভিক্টরকে ভুল বুঝতে পারলাম না।

এই বত্রিশ বছর বয়সে আমি অনেকগুলো প্রেম করেছি। অনেক বাঙালী এ্যাংলোইণ্ডিয়ান পার্সি ও ইউরোপীয়ানকে দেখেছি—কিন্তু ভিক্টরের মত সুন্দর দ্বিতীয় কোন মানুষ দেখিনি। ওর বোন মেরিলিন তেমনি অসুন্দর। কাউকে চট করে অসুন্দর বলা উচিত নয় জানি। কারণ আপাত দৃষ্টিতে কটা সুন্দরই বা সংসারে পাওয়া যাবে? তা সত্বেও মেরিলিনের মতো অসুন্দরের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? তার রং ফর্সা—ভিক্টরের মতোই! চোখগুলি স্বচ্ছ, ব্রাউন, ঠিক যেমনটি ভিক্টরের আছে! কিন্তু ভিক্টর সুন্দর, মেরিলিন কুশ্রী।

লোক বলে আমাকে দেখতে ভালো। সেজন্য আমার মনে একটা সূক্ষ্ম গর্ব আছে। আমি নিয়মিত হকি আর বাস্কেটবল খেলি—কাজেই আমার শরীর রীতিমত তাজা আর ফ্লেক্সিবল।

মলি ব্রাউনের জন্মদিনে, এডির সঙ্গে বলরুম নেচেছিলাম। এডি ব্রাউন মলির কাজিন্। খানিকক্ষণ আলাপের পরই সে আমার চেহারার প্রশংসা করেছিল। তারপর বার বার আমার সঙ্গে দেখা করেছে; আমাদের বাড়ীতে চা খেয়েছে, ডিনার খেয়েছে। সিনেমায় নিয়ে গেছে। তার হৃদয়ের প্রথম পাপড়িটি আমারই জন্য মেলে ধরেছিল।

তখন আমি ভিক্টরকে চাই। তাই এডিকে সরিয়ে দিতে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা জাগেনি।

এডি ক্যানাডা চলে গেল—ফর গুড্।

মনে কষ্ট হয়েছিল কিনা জানি না—তবে এডির মতো চমৎকার ছেলেটিকে আর দেখতে পাবো না ভেবে কেমন যেন শূন্য বোধ করেছি।

কিন্তু ভিক্টর আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে এ চিন্তাও তো কখনও করিনি। এ যেন এক আশ্চর্য ঘটনা। —আমাদের সমাজ নাক সিটকে বলেছিল যে —"এডিকে তাড়িয়ে দিয়েছ তার ফল ভোগ কর এখন। বাঙালীরা এমনি খেলোয়াড়। খেলা করে চলে যায়।"

ভিক্টর শুধু যে বাঙালী তা নয়—ভিক্টর একটি অদ্ভুত বিদ্‌ঘুটে চরিত্র! নয়তো মায়ের প্রথম বিবাহের সন্তান মেরিলিনের জন্য সে বিয়েই করল না? বোনের বিয়ে হয় নি তাই ভাই ব্যাচেলর রয়ে গেল। মেরিলিনকে কেই বা বিয়ে করবে। —অমন কুৎসিত! যার চেহারার অন্তরালে একটি পবিত্র হৃদয় আছে তার পরিচয়টি নেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি! কোন বয় ফ্রেণ্ড্ বা কোন দরদী মন!

চার্লস ল্যাম্ব নাকি উন্মাদ বোনের জন্য নিজেই চিরকুমার ছিলেন। ভিক্টর সেই রকম! মেরিলিনের বিয়ে হয়নি—ওকে দেখবে কে? সুতরাং ভিক্টরের নিজের সংসার রচনা করা চলে না।

আমি অনেক কেঁদেছিলাম। চিঠিপত্রগুলো সযত্নে বাক্সে ভরা ছিল। মা বলেছিলেন—ওগুলো নষ্ট করে ফেলো, রেখে কাজ নেই। তবে ভিক্টরের সঙ্গে আর মেলামেশা কোর না।

আমার বাবা শান্ত মানুষ। বাবা বললেন—"জীবনে অনেক কিছু মেনে নিতে হয়—Time is the best healer!"

সে সময় আমি ভাল হকি খেলি; নাম ছিল আমার। স্তাবকেরও অভাব ছিল না। আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁরা দুজনেই দেখতে খুব সুন্দর। লোকে বলে আমার চেহারা সেইজন্যেই এতো ভালো।

আমি মেক-আপ করি নি কখনও। আমার মাও করেন নি—কাকীমার মতো কিংবা পাশের বাড়ীর জুনি আন্টির মতো। কখনও বা পার্টিতে যাবার

সময় একটু আধটু লিপস্টিক লাগিয়েছেন—তাতেই তাঁকে সবচেয়ে বেশী গ্ল্যামারাস্ লেগেছে। মা ইংলিশ ; তিনি বলেন তাঁর দেশের মেয়েরা সঙ সাজে না। তার ওপর মা পার্টিতে ড্রেস পরেন না—শাড়ী পরেন। কেমন যেন বাঙালী ভাব। রুচি-প্রকৃতিতে বাঙালী কালচার।

বহু বছর আগে আমরা পর্তুগীজ ছিলাম। বাবা বলেন—পর্তুগীজরা বৃটিশের মতো নিতে আসে নি। তারা এদেশের অনেক উপকার করেছে—আর্টে, লিটারেচারে, শিক্ষায়, ধর্মে। বাবাকেও পর্তুগীজ মনে হয় না। তিনি ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসেন ; গরমের দিনে সন্ধেবেলায় পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরেন। আমাদের সমাজে বাবা-মাকে নিয়ে লোকে ঠাট্টা করে। করুক! বাবা বলেন—"কি করি বল—কত জন্ম বাংলাদেশে বাস। এদেশে জন্মেছি—এদেশেই মরব—তাই আমরা বাঙালী।"

বাবা ও মা'র দেখাদেখি আমি রবীন্দ্রনাথ পড়তে ভালোবাসি—অবশ্য ইংরিজিতে। আমার বাঙালী বন্ধুদের কাছ থেকে ছোটবেলা থেকেই বাংলা বলতে শিখেছি। আমি শাড়ী পরি ; তাই অনেকে আমাকে বাঙালী মনে করে। যদিও আমার নাম স্টেলা-ডি-কস্টা। বাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমার বাঙালী বয় ফ্রেণ্ড হয়। তাই ভিক্টরকে বাবার খুব পছন্দ ছিল। বলেন—বাঙালীরা সংস্কৃতিবান—তাদের এস্থেটিক সেন্স আছে।

ভিক্টর আমার কাছের মানুষ ছিল ; এখন সে দূরে। আমি জানি ও আমাকে ভালোবাসে। আর সেই জন্যেই তাকে আমি ক্ষমা করি। বিয়ে না করলেও ভালোবাসা যায়। দূরে থাকলেও ভালোবাসার সৌরভ জীবনকে মধুময় করে তুলতে পারে। এই বিশ্বাস, এই গভীর নিশ্চিন্ততায় শান্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাঙালী প্রীতির পরিণাম অনেক দূর গড়িয়েছিল। আমার বান্ধবী দেবিকার দাদার বন্ধু চিত্রজিৎকে যখন পছন্দ করতে শুরু করলাম—তখন দেখি ভিক্টরের প্রভাব কেমন অবলীলাক্রমে মন থেকে চলে গেল। অথচ পরে শুনেছি চিত্রজিৎ আড়ালে—'চুনোগলির মেম সাহেব' বলে আমাকে উল্লেখ করেছে। আমার সঙ্গে মিশলে নাকি লোকে থুথু দেবে।

কি যন্ত্রণা। কথাটা বাবা মাও শুনলেন। বলতে গিয়ে আমার চোখে জল এসেছিল। আমি চিত্রজিৎকে সত্যিই এ্যাড্মায়ার করতাম। এ্যাডমিরেশনের কি কোনই মূল্য নেই? বাবা বললেন—'কি করবে মা—এখনও

বাঙালীদের মধ্যে সংস্কার আছে তাই সে অমন কথা বলেছে। সে তো তোমার বংশ পরিচয় জানে না। তুমি শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক উঁচুতে। তাকে ক্ষমা করে সরে দাঁড়াও। সে তার ভুল যদি বুঝতে না পারে তো সে তোমার অযোগ্য—তাকে বর্জন করা উচিত।

চিত্রজিৎকে আমি গভীর ভাবে ভালোবেসেছিলাম। ভিক্টরকেও বোধ হয় এমন ভাবে ভালোবাসিনি।

বাবা বললেন—'যীশুর ছবির দিকে চেয়ে দেখো, মানুষের দেওয়া বেদনা বুকে নিয়ে মানুষকেই ক্ষমা ক'রে গেছেন—বাইবেল খুলে পড়, মনে শান্তি আসবে।

শান্তি পেতে আমার বেশী সময় লাগে না। কিছুদিন পরে সব ভুলে যেতে পারি! যেমন করে অনায়াসে ভিক্টরকে ভুলে গেছি। বাবার সব কথার মধ্যে ঐ একটা কথা আমার মনে হয় খুব খাঁটি! —Time is the best healer! সময়, সবই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

দেবিকার ভাইয়ের বন্ধু হিসাবে চিত্রজিৎকে কদিনই বা দেখেছিলাম। ওদের সংসারে আমার মতো মেয়েকে নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হোতো, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

আমাদের বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীটা যেন আমার সম্পূর্ণ জগৎ হয়ে উঠল। বাবা-মা ও আমি—বই আর মিউজিক, এই হোল নিটোল একটি শান্তির আশ্রয়।

ইতিমধ্যে চাকরী পেয়ে গেলাম একটা। আমার চেহারার জন্যেই পেলাম। একটি বিমান কোম্পানীর রিসেপসনিস্ট! এখানে সকলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। অথচ আমি কথা বলায় কোনদিনও দক্ষ নই। কোন চটুলতা বা ইয়ার্কি ঠাট্টা আমার আসে না। বরঞ্চ আমার অন্যান্য সহকর্মীনীরা অনেক স্মার্ট—বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলে—হিউমার বোঝে, আমার ওসব আসে না। উপরন্তু আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে কান্না আসে।

অফিসে গিয়ে দেখি চিত্রজিৎ দত্ত ওখানকার একজন কর্মচারী। চিত্রজিৎকে দেখতে লোকের চোখে ভাল নয়; শিখরিণী, আমার লরেটোর বন্ধু, —বলে ওর কেবল স্মার্টনেস আছে আর কিছু নেই। আমার চোখে চিত্রজিৎ এঞ্জেল

তার ওপর অফিসে যখন ইউনিফর্ম পরে আসত, চোখ ফেরাতে পারি না।

এবারে নিজে থেকেই চিত্রজিৎ আলাপ করতে লাগল। পুরোনো অপমানের কথা ভুলে গেলাম যেন। আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করল অফিসের আর পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে। কেননা অফিসে তখন আমার ফীগার নিয়ে,—চোখের রং নিয়ে আলোচনা; সকলেই আমার সঙ্গে ভাব করতে চায়।

চিত্রজিৎ আমার সঙ্গে ডেট্ করতে শুরু করল। আমরা গেলাম সিনেমাতে-বোটানিকল্‌স্-এ। ও থাকতো ভবানীপুরের একটা ফ্লাটে একেবারে একা। সেখানেও যেতাম। দেখলাম আমি ছাড়া সংসারে বোধ হয় ওর আর কেউ নেই। কখনও কখনও রান্না করে খাইয়ে এসেছি। একবার ফ্লু তে ভীষণ ভুগেছিল—সেবাযত্ন আমিই করলাম।

ওর সঙ্গেই যে আমার ভবিষ্যতের বন্ধন সকলেই সেকথা বুঝল। ভিক্টর ছিল বাঙালী ক্রিশ্চান। কিন্তু চিত্রজিৎ হিন্দু। অবশ্য বাবা মায়ের সেজন্য কোন সংস্কার ছিল না। বন্ধু বান্ধব, অফিসের লোকজন সকলেই জানত যে সময় মত আমরা স্বামী স্ত্রী হয়ে সংসার রচনা করব।

সেবার দুদিন পর পর সে অফিসে এলো না। কোন খবর নেই। কি হল দেখবার জন্য অফিস থেকে অসময়ে ছুটি নিয়ে ভবানীপুরে গেলাম। গিয়ে দেখি—কয়েকজন সুসজ্জিত পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে চিত্রজিৎ গল্প করছে। আমাকে দেখে যেন অপ্রস্তুতে পড়ল বলে মনে হল।

উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রত ভাবে বলল—'আচ্ছা, তুমি যাও ওদিকে, আমি আসছি।'

অবাক হলাম। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারতো না? না কি ওদের কাছ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই এতো তাড়া!

মনটা নিমেষে কালো হয়ে গেল। গম্ভীর ভাবে চলে এলাম পিছনে—কিচেনে। শুনতে পেলাম স্পষ্ট—চিত্রজিৎ বলছে—'ও একটা এ্যাংলো মেয়ে! আমার অসুখের সময় নার্স করেছিল আর রান্নার বন্দোবস্ত করত। এখানে আমার কেউ নেই তো! ওর সঙ্গে পরিচয়ের দরকার নেই; তাছাড়া ও একটা চুনো গলির ফিরিঙ্গী।'

অপর একটা গলার স্বর শোনা গেল—দেখতে ভারী সুন্দর তো!

হাহা করে হেসে চিত্রজিৎ জবাব দিল—জাতে তো ট্যাস্।

আর শুনতে ভয় করল। ওরা যেন কোথায় মেয়ে দেখতে যেতে বলল চিত্রজিৎকে।

এই ব্যাপার? এ রকম? আমার শরীরের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল। মনে হল কি করে মুখ দেখাবো? আমি ট্যাঁস ফিরিঙ্গী। তা বলে আমারও সমাজ আছে—মনুষ্যত্ব আছে!

এর পর চিত্রজিতের মুখ দেখিনি। অফিসে চিনতে পারিনি। টেলিফোনে বার বার কি যেন বলতে চেয়েছে—নামিয়ে রেখেছি, শুনিনি।

দেহে ও মনে চিত্রজিতের দেওয়া কালি মেখে বিনিদ্র রজনী যাপন করলাম। মুখ ফুটে এ অপমানের কথা কাউকে বলিনি—শুধু বাবা মাকে ছাড়া! কিন্তু একথা সবাই জেনেছে। চিত্রজিৎ আমাকেব বাঙালী না বলে ফিরিঙ্গী বলে অভিহিত করেছে এজন্যে আমার কাজিন্‌রা খুব আনন্দিত। ওরা হেসে হেসে বলল—'বাঙালীগুলো ঐ রকম হৃদয়হীন!'

আমার শোচনায় অপমানের কথা ভিক্টরও শুনেছিল।

তখন আমি নার্সিং হোমে। চিত্রজিতের দেওয়া কালি আমি রাখতে চাই না।

ভিক্টর দেখা করতে এলো। বহুদিন পরে আবার দেখলাম। সেই অপরূপ মানুষটির স্বচ্ছ ব্রাউন চোখের দৃষ্টিতে মনে হল আশ্রয়ের ছায়া।

ভিক্টর আমার হাত ধরে বলল—কেমন আছ?

ঘাড় নাড়লাম নিঃশব্দে।

—তুমি এমন সাদা হয়ে গেছ কেন? তোমাকে ঠিক বৃষ্টি ধোয়া জুঁই ফুলের মতো দেখাচ্ছে?

—ঠিক বিধবার মতো তাই না?

হাতে গভীর চাপ দিয়ে বলল—স্টেলা আমি তোমাকে বিয়ে করব।

—কিন্তু মেরিলিনের কি হবে?

তোমাকেও বাঁচানো দরকার স্টেলা!

—সে প্রয়োজন আর হবে না ভিক্টর; আমি মুক্ত।

—তোমার ভবিষ্যৎ? আমি যে তোমাকে নিতে এসেছি।

—তুমি মহৎ ভিক্টর। এই কলঙ্কিত জীবন নিয়ে তোমার মহত্বের অপমান করি কি করে?

দুজনেই চুপ করে রইলাম।

তারপর বললাম—হয়ত কোন দিন বিয়ে করব।

কিন্তু সে কোন বাঙালীকে না। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকেই করব। ট্যাঁস-ফিরিঙ্গী যাই বল, তারাই আমার আপনার।

—এ তোমার অভিমানের কথা স্টেলা। সব বাঙালী কি সমান?

—তা নয় বাঙালী সমাজে চিত্রজিৎ যেমন আছে—ভিক্টরের মতো মানুষও আছে।

ভিক্টরকে ফিরিয়ে দিলাম।

সঙ্গে অনুভব করলাম—আমি সত্যই সাদা হয়ে গেছি। বিধবা হলে এমনি শুভ্র হয়ে যেত হয় বোধ হয়। এমনি বৃষ্টি ধোয়া জুই ফুলের মত। চিত্রজিৎকে গ্রহণ করে কালো হয়ে গিয়েছিলাম, আজ ভিক্টরকে ত্যাগ করে সাদা হয়েছি।

* * * *

বিশ্বাসের অধিকার প্রেমের অধিকার হৃদয়ের অধিকার কি সর্বোচ্চ অধিকার নহে? ভিক্ষুক যদি সর্বত্রাণে দাতার করুণার প্রতি নির্ভর করে তবে তাহাকে ফিরানো দাতার অকর্ত্তব্য।"

—স্বর্ণকুমারী দেবী

জলতুফানের ডাক

জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী

সোনাদার চর ভাঙা নদীর তীরবর্তী হ'য়ে জাঠান তার নৌকা বাঁধলো জোর কষে। ওদিকে মেঘ ঘন মসীলিপ্ত আকাশের নৈঋত কোণে চিকুর হানা বিদ্যুৎ কেঁপে উঠলো বার ক'য়েক।

হাট বারে বাজার থেকে পূবমুখী যে দলটা ফিরছিল সোনাদার মাঠ রাস্তায়, সে জায়গা লক্ষ্য করে জোর হাঁক দিল জাঠান—হে-ই-ও-ও পরান, ই দিক শোন।

রোগা কালো দেহী কাপড়ের ওপর চৌখুপী লাল ডোরা কাটা গামছার বেড় দেওয়া শরীরটা, ডোবার ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে বলে উঠলো—ক্যানে ডাকিস শুনি ?

—আরে হেই শুন্যা যা, বলি কতা জাঠান বৈঠা ধরে উত্তর দিল।

পরান তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এলো চরের ভাঙন রাস্তায়। তার বিরক্ত কুঞ্চিত মুখে, একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠতেই জাঠান লাফ দিয়ে নৌকো থেকে নেবে এসে পরানের গলা জাপটে বলে উঠলো—দেখতি ক্যানে পাইনে ? মট্টেও ইদিকে পাও লড়েনা কেমুন ?

পরান হাসলো। —কুথায় সময় ? দোপরে হাট সারতি তো এই সন্ধ্যেকখানি, কখন তুমার খবরটা লিবো ?

জাঠান তার ময়লা কাপড়ের ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো—পিরীতের কতা শুনাব তুকে এট্টা। কিন্তুক গিয়ে এট্টা কাজ করতি হবেক বলে, জাঠান একটু চুপ করে, ঝড় বাতাসের উত্তাল নদী জলের দিকে তাকালো।

মেঘদীপ্ত আকাশ তার আরো ঘন মসীলিপ্ত অন্ধকার ছড়াতে লাগলো...., মেঘের গুরু গম্ভীর থমথমে ডাকও শোনা গেল বার কতক। কে জানে, এ সময় ঝড় বৃষ্টি আসবে কিনা !

এই রকম সমস্যা সঙ্কুল চিন্তা নিয়ে জাঠান বলে উঠলো—বেষ্টি আসবি বলে মনে করতিছি লৌকা লিয়ে যাতি হবি এখুনি তবে তু সোঙ্গে যাতি পারলি, বেবাগ কতাগুলান সারবোখ'ন।

পরান হাতের বোঝাটা, কাঁধে তুলে বললো—তবে তো চল দিকিন ধেইয়ে ...লৌকা লামাও...।

জাঠান ত্বরিতে নৌকো ছাড়লো।.. ছলাৎ ছলাৎ জলের কলতান তুলে পূবের হাওয়ার টানে, হাল্কা কাঠের পাঠাতনের নৌকোটা ভেলার মত ভেসে চললো মাঝ দরিয়ায়......।

জাঠান বৈঠা চালাতে চালাতে ঈষৎ চাপা কণ্ঠে বললো—এখন খুব তোড়ে লৌকা নে যাতি পারলি হয় বন্দীপুরের ঘাটে...।

পরান মাঝি একটা বিড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো—ইবার তুমার কতা-গুলান কও দিকিন সদ্দার? বেপারটা কি শুনি? জাঠান তার বাবরি চুলের মাথা নাড়িয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে অর্ধস্ফুট গলায় বলে চললো—মোর মেজাজ মট্টেও সুবিধার লয়। বন্দীপুর গেরামের শিবন ছোতরের বৌ সোনামতিরে ভাগায়ে লিয়ে আসতি হবি। কতা মোদের সব সারা। কিন্তুক সাহস লাগেনা। তুই মোর সাথে থাকলি পরে বুকের জোর টুকনে থাকে ভাই।

পরান কুঞ্চিত কপাল তুলে শুধালো—শিবন ছোতরের বৌ সোনামতীরে পরান দিছিস কবেক তরে?

—সি মেলা কতা। তুর অত জানতি হবেক না। সোনামতী মুইকে সোহাগ চইখে লিয়েছে মুইও দেখি বেবাগ পরান খান। এই সাঁঝ বিলাতেই যাতি হবেক শিবন ছোতরের ঘর পানে। সোনামতী থাকবেক ক'য়েছে, রায় পুকুর ধারে। ত্বরা করি উরে নে আসি এই লৌকায়। পরে উই শহর দিকে ধাঁইবোখন। বলে, জাঠান সাফল্য সূচিত হাসিতে, তার পুরু লোমশ কালো গোঁফ ফেলালো বাঁকা চাউনির ফাঁকে। একটু চুপ করে ফের বললো—তুর যা ভাগ বখশিস লাগবো তা আনায় গণ্ডায় মিটায় দিবো। কেমুন?

পরান বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়ার জাল বুনতে বুনতে, তেরছা চোখে চেয়ে, মুচকি হেসে জবাব দিল—পরের বো ভাগায়ে লিয়ে ঘর বারাবি কোন স্থাশ পানে শুনি?

—ক্যানে? যেথায় তু' আঁথ যাবেক, সেথায় যাবো মোরা দু'জনা। জাঠান বৈঠা টানতে টানতে, আমেজী কণ্ঠে উত্তর দিল।

হাওয়ার উজান টানে নৌকো যেন খুব দ্রুত এগোতে লাগলো বুন্দাপুরের ঘাট পানে আর ততই যেন, জাঠান মাঝির মন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জাঠান আবেগে আধভাঙা গলায় বেসুরো গানের সুর তুললো—

……ও' আমার সখীরে…
লাও লিয়া যাব ত্বরা
ঘাটপানে তুই থাকবি সদা
দেইখে চিনিস লো—
মনের লাগর……

বন্দীপুর অসমতল ঘাট সীমানায়, জাঠান অতিক্রুত নৌকো বেঁধে, গ্রাম পথে হাটতে সুরু করলো।…পরান বসে রইলো নৌকোর পাটাতনের ওপর. পা ডুবিয়ে রাখলো আধ হাটু জলে।

এতক্ষণে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ। অন্ধকার ঝিল্লি দিয়ে রাত নেবে আসছে… বন্দীপুর গ্রামের সারা চত্বর জুড়ে। জাঠান যেতে যেতে তার অভিসন্ধিপূর্ণ মনের নানান কল্পনার রঙিন ছবিগুলো দেখতে লাগলো।…

শিবন ছোতরের বৌ সোনামতাকে নিয়ে এই সাঝ অন্ধকারেই রূপ নগরের ঘাটের কাছে পৌছতে হবে? সে ভাল করেই জানে, সোনামতা তাকে বিশ্বাস করে। এবং তার ভালবাসার অভিনয়ে—এতটুকু সন্দেহ নেই সোনামতীর।

জাঠানের নৌকোর একবার পাটাতন ভেঙে যেতে, ওই শিবন ছুতোর এসে সারাই করে। সেই থেকে আলাপ হয় শিবন ছুতোরের সংগে। তারপর ওদের বাড়ীতে বার কতক আনাগোনা করতে করতে—যৌবনশ্রী সোনামতীর মন ভোলায় জাঠান। অভাবি ছুতোর বৌকে রাজরাণী করে সুখে রাখবে বলে জাঠান দেখিয়েছিল—এক সুখ স্বপ্ন।

সেই হিজল গাছের নীচে, এক গাঁও সাঁঝের অন্ধকারে চুপিসারে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠেছিল ধূর্ত জাঠানের কণ্ঠ—তু যাতি পারবি মোর সাথে?

ভীরু চোখের ঝলক লাগার চাউনিতে তাকিয়েছিল সরলপ্রাণা সোনামতী। বলেছিল—কুথাকে নে যাবি আমারে?

—ক্যানে দোজনে সুখের ঘর বানিয়ে লিয়ে যেথাকে মোরা থাকবো?
উদ্দীপ্ত গলায় উত্তর দিল জাঠান। ফের আবার বললো—শিবন তুকে খাতি পরতি দিতি পারে না। তুর সুখ সুবিধার দিকে মট্টেও উর মন লাই। কি হবেক তুর, এই আদারে পইড়ে থিকে?

সরলা সোনামতী চমক লাগা শরীর নিয়ে, গাঁও বনের অন্ধকারে ফুলে উঠতে উঠতে, শেষ অবধি সম্মতি জানালো—আমি ঠিক যাবেক তুর সাথে…

জাঠান বিচিত্র আবেগে হিজল গাছের সন্ধ্যে ছাওয়ায় সোনামতীর কপাল চুম্বন করে বিদায় নিয়েছিল …।

তারপর, সন্ধ্যেতে পাকা কথা হ'য়েছিল—রায় পুকুর পাড়ে সোনামতী অপেক্ষা করবে—তার মন দোসরের সংগে পালিয়ে যাবার জন্যে।

জাঠান দূর থেকে দেখলো, ভূতের ছায়ার শরীরের মত সোনামতী লম্বা ঘোমটা টেনে রায় পুকুরে গেমো বয়রার ঝোপে দাঁড়িয়ে আছে।

জাঠান দ্রুত পা চালিয়ে সোনামতীকে সংগে নিয়ে সোজা এসে উঠলো অপেক্ষমান নৌকোয়। পরান মাঝি মুচকি হাসির ঢেউ তুলে অন্ধকার রাতের রেখাছোল জলের দিকে তাকালো… ওদিকে আকাশে, গুরু গুরু মেঘের রব শোনা গেল। সমস্ত দিকের কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীরেট বুক ঘিরে আসন্ন বর্ষণের গর্জন ভেসে উঠলো।

পরান মাঝি বললো—কুথায় লৌকা লিয়ে ভিড়বে ঠিক কইরেছো?

জাঠান ঈষৎ নিম্ন স্বরে বললো—ইবার মুই সত্যি কতা বলি। রূপ লগরের ঘাটে লৌকো ভিড়াবো। রূপ লগরের জমিদার বাবু সাবের খাস নোক দেইড়ে থাকপো। বাবুসাব মেলা ট্যাকায় মেয়ে মানুষ কিনা ল্যায়। শিবন ছোতরের বউকে বেইচলে হাজার ট্যাকা লগদ মিলবে—তুর আমার আদাআদি। কথা শেষে, চতুর জাঠানের একচোখে অদ্ভুত হাসির ঢেউ তুললে।

এই সময় সোনামতী, জাঠানের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে ছইএর ভেতর থেকে লাফ দিয়ে উঠলো।

—শয়তান। মোরে মন ভুলায়ে লিয়া, বেইচ্তে চইলেছো—রূপ লগরে? খবরদার জাঠান ত্বরায় লৌকা ভিড়াও ঘাটে…।

জাঠান ধূর্ত হাসির ঢেউ তুলে বললো—এখন তু কুথায় যাবি? মোর হাতে তু বাঁধা পইড়েছিস লৌকাও এখন মাঝ দরিয়ায়…

নিজেকে অসহায় অনুপায় জেনেও, সোনামতী ক্রমাগত চিৎকার করতে লাগলো। আকাশের ঘন মেঘের গর্জনে সোনামতীর আর্তরব, সোনাদা নদীর জল তরঙ্গেই আছড়ে পড়তে লাগলো...

সোনামতীর উচ্চকিত কণ্ঠরোধ করতে জাঠান ত্বরিতে ছইএর ভেতর এলো। ততক্ষণে পরান মাঝি বৈঠা ধরলো। এবং বললো নীচু স্বরে—এ কাজ তুর জাঠান সাজেনা। মেয়ে বেইচে দিবার মতলব মট্টেও সুবিধার লয় কিন্তুক কয়ে দিলাম।

জাঠান ধমকে উঠলো—পরান রূপ লগরের জমিদার বাবু সাবের নায়েবের সাথে পাকা কতা সারা। কতা আর ফিরোন যাবে না।

সোনামতী এবার আর্তরবে কাঁদতে লাগলো। ওদিকে সোনাদা নদীর মাথার ওপরের আকাশও বর্ষণ সুরু করে দিল। নদীর দুকূলে তুফান জল ছাপিয়ে উঠলো!

সোনামতীর আর্তকান্নার সঙ্গে সরব চিৎকার উঠলো—আমাকে মেরে ফেললো...কে কুথায় আছো রক্ষা কর...রক্ষা কর...

জাঠান এবার রোষে, শক্ত বাহুর বেষ্টনে সোনামতীর গলা চেপে ধরে। চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো—খবরদা তু চেঁচাতি পারবিনা মট্টেও। তা হইলে তুরে ঝাঁপায়ে জলে ফেইলে দিতি হবেক কিন্তুক।

সোনামতী ভয় পেলনা জাঠানের হুমকিতে। রক্ষা পাবার আশায় প্রাণ-পণ শক্তিতে দূরবর্তী দুই তীরের মানুষকে ডাকতে লাগলো আর্তরবে।

তখন নিরুপায় রোষক্ষুব্ধ জাঠান, সজোরে ছইএর বাইরে সোনামতীকে টেনে বার করলো পাটাতনের ওপর। তারপর দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে বললো—তুকে আমি আজ জলে ভাসাব...তবে মোর নাম জাঠান সর্দার। মোর হাজার ট্যাকা লষ্ট করে দিলি তুর পরান লিয়ে মুই ছাড়বো।

শ্বাপদ শয়তানের খুনে মূর্তি নিয়ে জাঠান তার নিষ্ফলতার আক্রোশে, সোনামতীকে ঠেলে জলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ধ্বস্তাধ্বস্তির আর বৃষ্টির অঝোর ধারায়, এক ভয়াবহ দৃশ্যের সুরু হোল। ঠিক এই সময়ে পরান লাফ দিয়ে উঠে, জাঠানের কবল থেকে বিপন্না সোনামতীকে উদ্ধার করবার চেষ্টায়, চিৎকার করে উঠলো—খবরদার জাঠান সদ্দার অবলা মেয়ে মানুষের পরান নেলে, তুকে আর রক্ষা রাখবনি...।

জাঠান তখন উন্মত্ত। সে শুনতে চায়না পরানের কথা। সোনামতী তার এখন হাত ফসকানো শিকার। কাজেই—খুনের নেশায় জাঠান বে-পরোয়া। সোনামতী তার অসফল উদ্দেশ্যের—ব্যর্থ যন্ত্রণা। কাজেই নারী হত্যায় সে উদ্যত হোল।

তাকে যেন সোনাদা নদীর জল তুফান ডাক দিয়েছে…। ঝড় বাদলের বহ্নি মূর্তি সোনাদার মাঝগাঙের জল তুফান নৌকো টলাতে লাগলো প্রবল বেগে।…

পরানও আক্রোশে ফুলছে…জাঠানের এই নারী জিঘাংসা তাকেও উন্মত্ত করে তুললো! শেষ পর্যন্ত জাঠানকে বিরত করতে না পেরে সর্বশক্তি দিয়ে সে জাঠানকেই—সজোরে ধাক্কা দিয়ে—সোনাদার মাঝগাঙে-ফেলে দিল।

জোর একটা পাক খেয়ে—স্বল্প সাঁতার জানা জাঠান নিমেষে তলিয়ে গেল জলে। এদিকে বৈঠা ধরে পরান—দ্রুত বিপরীত দিকে নৌকো ভেড়ালো…।

মাঝগাঙের অথৈ কলোচ্ছ্বাসে জাঠান কোন অন্ধকার তলে মিলিয়ে গেল। পরানের তা দেখবার সময় সময় ছিলনা। সে দ্রুত নৌকো চালাতে লাগলো। বৃষ্টিও যেন সেই মুহূর্তে থেমে গেল। শান্ত হয়ে আসা সোনাদার নদীর ওপর পরান বৈঠা চালাতে চালাতে বললো, সোনামতীর দিকে চেয়ে—"এট্টা শয়তানের মেরত্যু হোল বটেক মোর হাতে। কিন্তুক সোনা বো' তুর জেবন রক্ষা করতি পারলাম, এই আমার পুণ্যি! জাঠান শয়তান মোরে পাপ কাজ করতি লিয়ে আসতিছিল। কিন্তুক এখন আমার মনে লয়, বেধাতা মোরে পেইটেছেলো, শিবন ছোত্তরের বৌকে রক্ষা করতি। আর উই পাপীর সাজা দেতে। আমি এই রেত্তেই, তুকে বন্দীপুর ঘাটে নে গিয়ে বাড়ী টুকান পয্যন্তি পৌছে দিবো……।

মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হওয়া বাকরুদ্ধ সোনামতীর দু'চোখ কৃতজ্ঞতার ছল ছল করে উঠলো।

নৌকো তখন দ্রুত সোনাদা নদীর জল কেটে কেটে এগোতে লাগলো—বন্দাপুরের দিকে…।

নিরীক্ষা

অঞ্জলী বসু

নিকুঞ্জবাবুর ছোটনাতি আজ ফিরছে। চোদ্দ বছর পরে রামের বনবাস। চোদ্দ বছরের ইস্কুলের ছেলে গিয়েছিল। আজ আটাশ বছরের পূর্ণ যুবক ফিরছে। ছোট মামা যখন বিলেত গিয়ে বসত করলেন কুড়ি বছর আগে, তখন থেকেই এই আদরের ভাগ্‌নেটির উপর তাগ্‌ করেছিলেন।

এইট থেকে যেই নাইনে উঠল, মামা সোজাসুজি তাঁর জামাইবাবুর বাবা অর্থাৎ রাতুলের ঠাকুর্দা অর্থাৎ নিকুঞ্জবাবুকে লিখে পাঠালেন—তালুইমশাই আপনি তো জানেন আপনার ডানপিটে ছোট নাতিটির সঙ্গে আমার চিরদিনই খাতিরটা একটু বেশী। দিদি মানে আপনার রাঙা বৌমা তাঁর ছটি ছেলে মেয়ে নিয়ে দিনরাত হিম্‌সিম্ খান। আমার তো ওসব পাট নেই, অর্থাৎ বিবাহ করিনি, করার ইচ্ছেও নেই—ওর একটি ছেলে মানুষ করার ইচ্ছাটা বরাবরই আছে। সেজন্য আপনার কাছে নিবেদন, শ্রীমান রাতুলকে এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। পড়াশুনোর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

আপনি থাকতে জামাইবাবুকে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করলাম। তবে তাঁর পুত্র, যা বলবার আপনিই তাকে বলবেন। পাঠাবার বন্দোবস্তটা শুধু আপনি করে দেবেন। রাহা খরচের কথা আপনাকে বলা আমার শোভন দেখায় না আমি টাকা নিয়ে প্রস্তুত আছি। আপনি আদেশ করলে আমি এখান থেকে ব্যবস্থা করব আর যদি আপনার নাতির জন্য আপনি খরচ করেন তাতেও আমি গর্বিত বোধ করব।

যাই হোক, মূল ব্যাপারটায় আপনার আপত্তি হবে না জেনেই এত কথা লিখলাম। কবে কোন প্লেনে রাতুলকে পাঠাতে পারবেন জানাবেন। আমি এয়ার পোর্টে উপস্থিত থাকব।

যেন সিনেমার টিকিট কেটে মামা ভাগ্নেকে ফোনে খবর দিল, অতটার সময় অমুক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবি। তোকে নিয়ে হলে ঢুকব।

তা সিনেমা না হলেও সিনেমার মতই ঘটে গেল ঘটনা পরম্পরা। ভারত আকাশের নীল ছোঁয়া লেগেছে যাকে রাতুল ভাবছে সে কথা।

চোদ্দ বছরের হাফ প্যান্ট পরা ছেলে নতুন ক্লাসের বুকলিস্টটা নিয়ে বাড়ী ঢুকল। এসব ব্যাপারে দাদুই খাস দরবার। দাদু তখন গরম র‍্যাপারে পা ঢেকে বেতের আরাম চেয়ারে বসে কড়া তামাক পাইপে ভরে টানছিলেন। রাতুল গিয়ে সোজা চেয়ারের হাতলে বসে লিস্টটা তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরে বলল দাদু এই যে! সঙ্গে সঙ্গে নিকুঞ্জবাবু ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা চিঠি রাতুলের সামনে খুলে ধরে বলেন—দাদু এই যে। লিস্টটা দেখতে দাদুর তত আগ্রহ আছে মনে হ'ল না। চিঠিটা রাতুল গোগ্রাসে পড়তে লাগল—

তারপর দু দাদুই চুপচাপ। বুড়োদাদুর পাইপের ধোঁয়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। আর কচি দাদুর চোখের সামনে সবই ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হয়ে উঠছে—

তবু ঐ ধোঁয়া আর ঝাপসার মধ্য দিয়েই সব আয়োজন চলতে লাগল। কোন কিছুর মধ্যে কিছু নেই ছোটমামা রাতুলকে বিলেত নিয়েযেতে চাইলেন, কোন দাদু কারো মতামতের অপেক্ষা না রেখে এক কথায় তাকে পাঠাতে রাজী হয়ে গেলেন, কেনই বা সে রোদ আর আলোর দেশ ছেড়ে চোদ্দ বছর ধোঁয়া কুয়াসা বরফ আর বর্ষার দেশে নির্বিবাদে কাটিয়ে এল-এর সবটাই যেন আজ আবার আশে পাশের নীল আলোর ধূপের ধোঁয়ার মত কাঁপতে কাপতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

চলে গিয়েছিল সেটাই সত্যি না এই যে ফিরে আসছে এটাই সত্যি নাকি মাঝখানে যে বছরগুলো পেরিয়ে গেল সেটাই সত্যি!

মামা আর ভাগনে। মামার আয় ব্যবসায়। পাঁচটি মহাদেশেই তাঁর কারবারের ভালবাসা আছে। রাতুল স্কুলের পড়াশুনো শেষ করল, ঢুকলো বিজনেস মেনেজমেণ্টে। পড়া চলতে লাগল। ছোট মামার কাছে হাত মক্সও চলতে লাগল। ডিপ্লোমা নিয়ে বেরোলো যেদিন, সেদিন ছোট মামা দেশে একখানা চিঠি দিলেন আর তার এক মাস পরে রাতুলকে পাঠিয়ে দিলেন মেলবোর্ণে। অস্ট্রেলিয়ায় মাস ছয়েক থেকে ইষ্ট আফ্রিকা সেখান থেকে সাউথ আফ্রিকা। বছর খানেক। আবার ফিরে এল ইংল্যাণ্ডে।

মাস তিনেক তারপর কানাডা তারপর মেক্সিকো। বছর দেড়েক কাটল। এর ফাঁকে ছুট্‌কো ছাটকা দু চারবার কন্টিনেন্টে ঘুরে আসা সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মাস আষ্টেক হোলো আবার ফিরেছে ইংল্যাণ্ডে। তখন থেকেই সূত্রপাত।

ছোট মামা আজও বিয়ে করেননি। দেশে এবং বিদেশে যখনই এ অবান্তর প্রসঙ্গ কেউ তুলেছে, ছোট মামা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—ওসব অভ্যেস নেই বাবা, কোন দিন যা করিনি।

তা বিয়ে তো আর দৈনন্দিন কেউ করছে না, অভ্যেস আবার কার কবে হয়। আর একদিন করলে তবে না কোনো দিনটা হবে। এই একথায় ছোট মামার একই উত্তর ওসব আপনারা করুন গিয়ে, আমার অন্য কাজ আছে।

এ হেন মামার কাছে ভাগনের চোদ্দ বছর কাটল। বিয়েটা যে একটা করবার মত জিনিষ সে কথা মনে পড়বার আর সময় হোলো কই? কুয়াসা বিষন্ন আবছা আবছা দুপুরে এয়ার পোর্টে এসে যখন সে নামল তখন থেকে আমার শিক্ষানবিশীতে ভর্তি হয়েছে। সেই থেকে রাতুল নিজের কাছে নিজেই আবছা আবছা রয়ে গেছে। কেন এল এখানে সেটাও যেমন ছোট মামা কোন দিন ধরিয়ে দেননি ওকে, তেমনি তাকে নিয়ে যে উনি কি করতে চান সেটাও কোনোদিন বুঝতে দেন নি।

দেশ থেকে দাদু বাবা মা কাকা পিসী অন্য মামারা দাদা দিদিরা—বলতে নেই ষাট্‌ শ্বশুরের মুখে ছাই দিয়ে—তিন কুলে আত্মীয় স্বজনের তো অভাব নেই—যে যখন চিঠি লিখেছেন—তা চিঠি তো আর চোদ্দ বছরে কম পায়নি—তার মূল উপদেশ হোলো, ছোট মামা যেভাবে বলবেন সেভাবে চলবে। যেখানে তুমি আছ সেটা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দেশ হলেও তুমি তো এ দেশের ছেলে, এখানের আদর্শমত গুরুজনের কথা সর্বদা শিরোধার্য করবে। তোমার ভাল ছাড়া ছোট মামা আর কিছু চান না, এটা নিশ্চয় তুমি এতদিনে বুঝতে পেরেছ। বড় হয়েছো তো।

তাতো ঠিকই—কোন কথাটাই বা অস্বীকার করবো। বড় তো নিশ্চয় হয়েছে। বয়স তো আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। আর ছোট মামার কথা! ভাল না চাইলেও কে কার জন্য বছরের পর বছর ধরে হাজারের উপর হাজার টাকা খরচ করে চলে? সে যে ভারতবর্ষের ছেলে সে কথা মনে না রেখে

উপায় কি? ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দেশে চোদ্দ বছর কাটিয়েছে, তাতে তার কি? দেশে থাকতে যেটুকু বা স্বাধীনতা ছিল এখানে এসে তাও যেন ভুলে গেছে।

প্রথম প্রথম নতুনের ভয় কাটাতে ছোটমামাকে আঁকড়ে থাকত। তারপর যখন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হোলো, তখন দেখল ছোটমামা ওর থেকেও এগিয়ে গেছেন। নিজে কিছু বলার আগেই ছোটমামার বন্দোবস্ত সব পাকা। কোথায় রোমিং করা, সাঁতার কাটা, ফুটবল টেনিস ক্রিকেট খেলা, প্লেন চালানোর উত্তম শিক্ষক পাওয়া যায়, কোন সিনেমা হলে ড্রইং রুমে আরামে বসা যায়, কোন অপেরা হলে দেশী বিদেশী সব বই-ই সমান যত্ন-সহকারে দেখানো হয়, কোন অর্কেস্ট্রা হলে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয়বিধ সঙ্গীতই নিয়মিত পরিবেশিত হয়, কোন ক্লাবে শুধু তরুণদের গতিবিধি, কোথায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রাজনীতিক, শিল্পরসিক, সমালোচকদের পাওয়া যায়, ভারতীয়দের কোথায় বেশী দেখা যায়, কালাআদমী বাঁচিয়ে চলতে চায় কারা—এ সবের ডিক্সনারী ছোটম্। ছোটমামাকে এ নামেই ডাকে রাতুল বরাবর।

শুধু কি এই? উঁচুঘরের সুখুরী মেয়েরা কোন ক্লাবে যায়, কোথায় ছাত্রীদের আনাগোনা, কোথায় বা ফালতু মেয়েদের ভীড়—সব লিস্ট করে রেখেছেন ছোটমামা। এমন কি শ্রেণীবিভাগ রকমারি লেবেল, কার কি ফলাফল, তাও মামা রাতুলকে মুখস্থ করিয়ে দিতে ভোলেন নি। এ হেন গুরুজনের দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করা রাতুলের পক্ষে অন্ততঃ সম্ভব নয়, করার কোনো প্রয়োজনও নেই। মামাই যখন মুখের কাছে সব বয়ে দিচ্ছেন, তখন ভাগনে আর উপযাচক হয়ে কিছু চাইতে যায় কেন? বরং খিদে পাবার আগেই খাবর সামনে এলে যা হয়, খাবার ইচ্ছেটাই ক্রমে যেন চলে যায়। রাতুলের শেষে দাঁড়াল অবস্থাটা সেই রকমই। বেসামাল ফুর্তি করা কি বে-আব্রু কাজের ঝুঁকি নেওয়ার ঝোঁকই হোলো না কখনও। একযুগের উপর অথচ কেটে গেল এই কামনাজর্জর প্রতীচ্য ভূমিতে।

গোল বাধালেন ছোটমামা, এবারে রাতুল লণ্ডনে ঘোরার পর। বড়-দিনের আগের দিন। রাতুল বেরোয়নি সারাদিন। সারা সহরে উৎসব সজ্জা, গৃহস্থের বাড়ী সরগরম, গীর্জায় কতসুরে ঘণ্টা বাজছে। ঘরে বসে

কেও রাতুলের মনে আনন্দের ছোঁয়াচ লেগে গেল। কাল ফিরেছে বিদেশ কে। ভাবছিল সন্ধ্যার রোশনাইতে কোথাও বেরিয়ে পড়ে—অনেক বিশ্রাম য়েছে সারাদিন ধরে। এমন সময় ছোটমামাকে আসতে দেখে বেজায় খুসী-সী লাগল। আজ চোদ্দ বছর ধরে এত ঘনিষ্ঠভাবে আর কাকে পেয়েছে ।। আত্মীয় বল বন্ধু বল পথপ্রদর্শক শিক্ষক বল সব এই ছোটম্। শের অভাব বুঝতে দেননি ছোটম্। বিপথে চলে যাওয়ার সামান্যতম পলক্ষ্যও ঘটতে দেননি ছোটম্। নিজের দৃষ্টি পূর্ণ মেলে ধরে পথ চলতে খিয়েছেন। অবাধ মুক্তির আনন্দে বিচরণ করতে শিখিয়েছেন ছোটম্।

বাইরে বরফ ঝরা ঠাণ্ডা, ঘরে সেণ্ট্রাল হীটিং এর উষ্ণতা, ড্রইং রুমের কানায় নীচু টেবিলে নরম একটা ল্যাম্প গোলাপী আভা ছড়াচ্ছে। সোফায় হলান দিয়ে বসে টেলিভিসনের চাবি ঘোরাচ্ছিল রাতুল। পরদার তলা দিয়ে ছোট মামার জুতোর ডগা দেখতে পেয়েই লাফ দিয়ে উঠল—'ছোটম্ তুমি কি ভাল! ঠিক যখন একা একা লাগতে যাচ্ছিল, তখনই তুমি এসে গেছে। বোরাবে ছোটম?'

টুপি ছাতা ওভারকোট একটা একটা করে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে, রাতুলের সামনা সামনি বড় সোফাটার হাতলে পা তুলে দিয়ে শুয়েই পড়লেন ছোট মামা।

'ভাবছি'—

চুপচাপ।

খোঁচাদিল রাতুল—'কতক্ষণ ভাববে? বেরিয়ে পড়ি চল'।

'ভাবছি, দেশে গেলে কেমন হয়? যাই-চল্। কি বলিস'?

'দেশে? এখন?'

'এখন না হোক, এবারে। তার মানে যোগাড় যন্তর এখন থেকেই করতে হবে।'

কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গেছে রাতুল। 'দেশে? সে কেমন হবে, ছোটম'?

'কেমন হবে কিরে? চোদ্দ বছর দেশ ছেড়ে এসেছিস, দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে না?'

'ইচ্ছে? কি জানি! ইচ্ছেটা কি রকম হয় বুঝতে পারছি না। আমার সব ইচ্ছে কেমন যেন এখানের সঙ্গে মিশে গেছে।

আপন মনে আরও অনেক কিছু হয়তো বলে যেত রাতুল। হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। ছোট মামার মুখের উপর দিয়ে একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে গেল না? মামার কাছে মনের কথা লুকোবার প্রয়োজন কোনদিন হয়নি রাতুলের। আজও সেজন্য দেশে যাওয়ার কথা শুনে মনের পর্দায় যেমন যেমন ছায়া পড়েছে। ভাষায় একে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু এ আবার কি?

'থিসীসটা পাল্টে লিখতে হবে দেখছি।'

'থিসীস্? সে আবার কি?'

'না, সে কিছু নয়! তা'হলে তালুইমশাইকে আজই একটি টেলিগ্রাম করে দিতে হয়। তারা আবার এর মধ্যেই কিছু বিলি ব্যবস্থা না করে ফেলেন।'

একটা কথারও মানে বুঝতে পারল না রাতুল।

'দেশে ফিরতে চাইছিস্ না তুই, জানিয়ে দেওয়াই ভাল। অন্য ভদ্র লোকেরা অপদস্থ হবেন কেন?'

'কে অপদস্থ হবে না হবে আমার দেখায় দরকার নেই। কারো সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়নি। কিন্তু আমি ফিরতে চাইছি না কে বলল? তুমি যেন ধরেই নিয়েছ। চোদ্দ বছর ধরে এক জায়গায় থেকে। হঠাৎ তার শিকড় শুদ্ধ ধরে টান দিলে—চম্‌কে উঠতে হয় না? আমি কি চিরকাল রামচন্দ্র হয়েই কাটাব? চোদ্দ বছরের ছেলে, স্কুলে পড়ি, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, টেনে তুলে নিয়ে এল বিলেতে। আবার যেই চোদ্দ বছর কাটল, চল ফিরে দেশে! একিরে বাবা! রঘুপতির তবু এক দফা বনবাস হয়েই চুকেছিল, আমার আবার রেগুলার ইন্টারভ্যালে দ্বীপান্তর।' জোয়ান ছেলে কিন্তু চোখে জল এসে গেল।

'ঠিক আছে ঠিক আছে। বল্লাম তো টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি দেশে এখন যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই কাজটা হয়ে যাক। তা কি করবি? ষোলো আনা বাঙালী চাই না মিশেল না পুরোপুরি বিলিতী?'

'কিসের?'

'আরে বাবা বিয়ের!'

'বিয়ে?'

বোমার স্প্রিন্টায়ারের মত ছিটকে উঠল রাতুল। মামার কাছে এসে

ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

'পাগল কি তুমি হয়ে গেছ না আমি হয়েছি পাগল?'

'পাগলের তো বিয়েই হয় না জানি'।

'ওঃ তাহলে বিয়েটা তুমি করছ? 'স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস পড়ল রাতুলের।

'আমার বিয়ে করবার দরকারটা কি পড়ল?'

'দরকার তবে কার পড়েছে? আমার'?

'আপাতত আপনি ছাড়া আর কে আছে এখানে'?

এই পর্যন্ত বলে জুতো জোড়া কার্পেটের উপর খুলে রেখে পাশের শেলফ্ থেকে একটা জার্মান মাসিক পত্রিকা নামিয়ে নিয়ে মামা গভীর মনোনিবেশ করলেন আরও টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

রাতুল খানিকটা ঘরময় দাপিয়ে বেড়াল।

টেলিভিসনটা বন্ধ করে দিল। রেডিওগ্রামটা খুব জোরে চালিয়ে দিল। বন্ধ করল। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল। সবকটা আলো খট্‌খট্ করে জেলে দিল।

মাঝের চোদ্দটা বছর জীবন খাতা থেকে মুছে গেছে। এ সেই চোদ্দ বছরের রাতুল। সে প্রথমদিন ইস্কুল থেকে এসে মাস্টার আর ছাত্রদের একটা কথাও বুঝতে না পারায় অপমানে হাউমাউ করে কেঁদেছিল—আমি কক্ষনো স্কুলে যাব না, লেখাপড়া করব না। তুমি কেন আমাকে বিলেতে নিয়ে এলে? এক্ষুনি দেশে রেখে এস। আমি দেশে গিয়ে পড়ব। দাদু কেন আমাকে এখানে পাঠিয়েছে? এসে আমাকে নিয়ে যেতে বলো।'

ওর অস্থিরতায় সস্নেহে হাসলেন মামা। তারপর ধীরে সুস্থে আবার জুতোয় পা গলালেন, ফিতে বাঁধলেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের ভাঁজটা ঠিক করে নিয়ে ছাতা আর ওভারকোটের জন্য হাত বাড়ালেন। রাতুল হুঙ্কার দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

'যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'বাঃ কেব্‌লটা করতে হবে না? তালুইমশায় যা ব্যস্ত মানুষ, এতক্ষনে রোশনচৌকি অর্ডার দিয়ে বসে আছেন কিনা কে জানে। রাঙাদি তো নির্ঘাৎ গায় হলুদের তত্ত্বের ফর্দ্দ করতে লেগে গেছেন। আর তোর

বড়দাকে নিয়ে জামাইবাবু বসেছেন নেমন্তন্নের লিস্ট করতে। ঠিক বলিনি বল? আমি যে দেখতে পাচ্ছি।'

কাঁধ ধরে চেপে মামাকে বসিয়ে দিল রাতুল। পাশে বসে শক্ত করে দু'হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরল। মামার চেয়ে ছ'আঙ্গুল বড় লম্বায়। তবু হাত বাড়িয়ে মামা ওর চোদ্দ বছরের তেল না দেওয়া রেশমের মত চুলে হাত বোলাতে লাগলেন।

দেশের কথা তোর মনে পড়ে না রাতুল? তোর এখানে আসা যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন কে কি বলল, কি করল, তোর মনে নেই?

'মনে আছে ছোটম্। সব মনে পড়েছে। মন কেমন করছে। বাবা কখনও খুব গম্ভীর মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কখনও আমার কাছে এসে তোমার মত এমনি করে মাথায় হাত বুলোচ্ছেন পিঠ চাপড়াচ্ছেন।

মা সমানে চেঁচামেচি করে চলেছেন, সকলকে বকছেন, টান মেরে বাসন-পত্তর কাপড় চোপড় বার করছেন, বাড়ীতে কোন ব্যাপার ঘটলে মা যেমন করেন বরাবর। দিদি আর ছোড়দির তো দিনরাত চোখে আঁচল। বড়দা আমাকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। এদিকে ভিসা বল, পাস-পোর্ট বল, জিনিষপত্তর কেনা বল, এজেন্টের অফিসে ছোটাছুটি বল, মাল ওজন করা বল, সবভার নিয়েছে মেজদা। যেন কত কাজে ব্যস্ত, আমার সঙ্গে সারাদিন দেখাই করে না। ছোড়দাটা তো দিনে সাতবার করে দোকানে খাচ্ছে আর বাজারে খাচ্ছে।

'রাতুল এইটা খেতে ভালবাসে। বিলেতে কি আর এসব পাবে ছোট-মামার ঘর সংসার নেই, এ সব কে করে দেবে ওকে। এটা ছাড়া রাতুলের মুখেই রোচে না, কোথায় পাবে ওখানে? কবে আবার দেশে এসে এসব খায়, এখন পেট ভরে খেয়ে নে।' —দিনরাত এই করছে কেবল। অত যে অনবরত আমার পেছনে লাগত চিমটি কাটত, মুখ ভ্যাঙাতো, সে সব কোথায় চলে গেছে। তখন আমি খেতে পারি ছোটম্, তুমিই বল? আমার মনের মধ্যে তখন যে তোলপাড়া চলছে, সে কেউ বুঝছে না। তা-ছাড়া আত্মীয়-স্বজন পাড়ার লোক বন্ধুরা ভায়েরা সকলের বাড়ী যাও, খাও। আর এককথা হাজার বার শোনো এমন মামা ক'জনে পায়, এমন ভাগ্য কার বা হয়, দেশে কি আর ফিরবে কোনদিন, আমাদের সব

ভুলে যাবি না তো ?—এই।

ওদিকে ঠাকুরমা সেই একমাসের মধ্যে কত যে বড়ি আর আচার আর মালো নাড়ু করে ফেললেন তার ঠিক নেই, আমার পেটটা কি জাহাজ! পেটে একবার হাতটাই বুলিয়ে নিল রাতুল।

'কিন্তু বুড়ো মা, দাদুর মা আর কি। তুমি তো জান। সেই এক মানুষ। বাতে অচল। কিন্তু আর সবদিকে টন্‌টনে। চোদ্দ বছর আগের কথা তো! তখনও সেই ভেতরদিকের বারান্দায় গদীমোড়া চেয়ারটায় বসে সমানে আমার রুমালে ফুল তুলে দিয়েছেন, সাদা কাপড় জামায় সুতো দিয়ে নাম লিখে দিয়েছেন, তিনচারটে জামা-মোজা-মাফ-লার বুনে দিয়েছেন। কয়েকবছর পর্যন্ত আমাকে চিঠিও লিখেছেন। এখন আর পারেন না, চোখ গেছে। বয়স প্রায় একশো তো হোলো। আর তাই তো! দেখছ মনে নেই একদম? দেশে ফিরে বুড়োমার সেন্টিনারী করতে হবে না? তুমি বল ছোটম্ বুড়োমা ততদিন বেঁচে থাকবেন তো?'

'আলবৎ থাকবেন। না থাকলে চলবে? কিন্তু দেশের কথা বলতে বসে যে তুই ঝুড়ি ঝুড়ি বকে যাচ্ছিস। তবে নাকি তোর দেশে যেতে ইচ্ছে নয়?'

'কে বলেছে? তা শোন না—বুড়োমার মুখে সবসময় একবুলি—মা জগদম্বার ইচ্ছে—এক এক সময় মন্দ লাগে না। পরীক্ষার রেজাল্ট যদি খারাপ হোলো, বুড়ো মা যেই বল্লেন মা জগদম্বায় ইচ্ছে, মনে বেশ উৎসাহ হোলো। যাক্ তাহ'লে পুরোপুরি দোষটা আমার নয়। কিন্তু খেলায় কাপ জিতে ফিরে এলেও যখন তাই বল্লেন, তখন মনটা দমে গেল। মনে হোলো আমি নিজে বোধ হয় কিছুই করতে পারিনি। বিলেত আসার আগেও ঠিক তাই কত লোক কত কি বলছে বুড়োমাকে জিগেস করলাম তুমি কিছু বলবে না? ঐ একই উত্তর—আমি আর কি বলবরে! সবই মা জগদম্বার ইচ্ছে। কি যে ভাবেন বুড়োমা কে জানে।'

'দাদুর কথা বললি না তো! আমার তালুইমশায়?'

'তুমি তো ঐ এক চিনেছ তালুইমশায়! তা দাদুর কথা আর বলব কি! তার তো সুখদুঃখ কিছু বোঝার উপায় নেই। এইটা কর, এইটা কোরো

না, এইটা করতে হবে, এইটা করতে নেই, একটার পর একটা অনুশাসন।

স্থির হয়ে একমিনিট কি যেন ভাবল রাতুল। তারপর আবার চকমক্ করে উঠল। 'কবে যাবে ছোটন? কেন আমাকে সব মনে করিয়ে দিলে? একটুও আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঐ দূরে হোটেলটায় অর্কেষ্ট্রা বাজছে, এর থেকে কত মিষ্টি না দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের শব্দ? কুয়াসার মধ্যে দিয়ে ঝাপসা ঝাপসা দোকানের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে,—কোথায় লাগে বাতাসে কাঁপা কাঁপা দীপান্বিতার প্রদীপশিখার কাছে। অম সেজেগুজে ওভারকোট চাপা দিয়ে রকম বেরকমের হ্যাট মাথায় চাপিয়ে, কোরাশাড়ী পরা ঘোমটা মাথায় দেওয়া পুজোর ডালা হাতে আমাদের দেশের মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে পারে এরা। কি করে যে এতগুলি বছর এখানে আছি, ভেবেই পাচ্ছি না।'

'তাহলে আর টেলিগ্রাম করে কাজ নেই কি বলিস?' স্বপ্ন থেকে উঠল রাতুল! 'কি টেলিগ্রাম?' 'এই যে আমাদের এখন খাওয়া হ'চ্ছে না, বিয়ের সম্বন্ধ টম্বন্ধ ঠিক করা, এইসব।

'বিয়ের সম্বন্ধ? দাদু লিখেছেন বুঝি?'

'দাদু কখনও লিখতে পারেন? যে নাতি একযুগের উপর দেশ ছাড়া তার বিয়ের ব্যাপারে? আমিই লিখেছিলাম। সামনের বছর রাতুলকে নিয়ে দেশে ফিরব। সংসার করবার ওর বয়স তো হোলো। এখন ও বিয়ে না করলে, পরে আপনারা আমার ঘাড়েই দোষটা চাপাবেন—ঐ আইবুড়োটার সঙ্গে থেকে থেকেই নাতির আমার বিয়ের ফুল শুকিয়ে গেল। সুতরাং আপনারা মেয়ে দেখতে থাকুন। আমার ইণ্ডিয়ার ব্যবসাটা রাতুলই দেখবে। অতএব দেশেই থাকবে। মাঝে মাঝে বৌমাকে নিয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে আসবে বৈকি। কয়েকটি মেয়ের বাপের নাম পরিচয় ইত্যাদি পাঠিয়েও দিয়েছিলাম। গত সপ্তাহে উত্তর এসেছে। তুই ফিরিসনি তখনও। তোর সঙ্গে কথা বলেই প্যাসেজের ব্যবস্থা করব ঠিক করে রেখেছিলাম। কালতো খ্রীষ্টমাস, পরশু রবিবার। সামনে নিউইয়ার্স ডে, সপ্তাহটা কাটুক, তারপর জোগাড়যন্তর শুরু করে দিই, কি বল?'

'যে চোদ্দ বছর দেশে ছিলাম। আমার সবই ঠিক করে দিতেন বাবা-মা-ঠাকুমা-দাদু। এখানের চোদ্দ বছর সব ঠিক করলে তুমি। এখন আমাকে কিছু ঠিক করতে বললেও পারব না।'

তা পারতে হয়ও নি রাতুলকে। যা দিয়ে থাকবার ছোটমামাই করেছেন। তাই আজ রাতুল এখানে। সে ফিরছে চোদ্দ বছর পরে, ছোটমামা কুড়ি বছর পরে। ছত্রিশ বছরের পরিণত যুবক মামা পাড়ি দিয়েছিলেন মহা-সাগরের বুকে। আজ ছাপান্ন বছরের প্রৌঢ়ে ফিরছেন। মাঝে দু'একবার ব্যবসার খাতিরে ঘুরে গেছেন দেশে। সে নেহাতেই ট্যুর প্রোগ্রামে। তবু এসেছেন। রাতুলকে চোদ্দ বছর আসতেই দেননি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকের সঙ্গে রাতুলের দেখা হয়েছে বিদেশে ঠিকই। দু'একজন ওসব দেশে রয়েও গেছে। কিন্তু দেশের মাটি তো ছুঁতে পায়নি রাতুল। সবচেয়ে যারা আপনার তাদেরকে তো পায়নি কাছে।

মনটা যেন ওর ভাসছে। কোনটা ধরবে কোনটা ছাড়বে বুঝতে পারছে না। সেই হাফপ্যান্ট পরা ক্লাস নাইনের ছাত্র। সেকি বেঁচে আছে এখনও? অথবা পাঁচ মহাদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট পরিপক্ক এক নাগরিক সেই হয়েছে জীবন্ত। ছোটমামার মনে কি হচ্ছে কে জানে! সারাদিন রোদে জলে বল পিটে শীল্ড জিতে ঘরে ঘোরা ছেলের মুখে যে ক্লান্তির কালো সেডের তলায় উজ্জ্বল সোনালী আলো জ্বলতে থাকে, ছোটমামার মুখে তা'ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সে যে নিজের অস্থিরতায় নিজেকে কোথাও বসাতে না পারার অস্বস্তিতে টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌ছে। যেখান থেকে আসছে সেখানের স্মৃতির ফেনা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। বাঁধনটা যেন আলগা হয়ে আসছে। যেখানে যাচ্ছে সেখানের ছবিটা এককালে চেনা ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় রং উঠে গেছে। কয়েকটা ছোটো-খাটো দাগ চোখ পড়েও না।

বড়মামারা গেছেন। সেজপিসী পিসেমশায় দুজনেই নেই। মেজকাকীমা মারা গেছেন। মেজকাকা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, কেউ খোঁজ পায়নি। নতুন পিসির বিয়ের কথা আজও পরিষ্কার মনে পড়ে। তার নাকি ডাইভোর্স হয়ে গেছে। লালপাড় শাড়ী ছাড়া পরতেন না যে মামীমা, তিনি আজ ছ'বছর থান কাপড় পরছেন। রত্নামাসির ছ'মাসের

মেয়েকে দেখে এসেছিল, তিন বছর বয়স থেকে নাকি সে পোলিওতে পঙ্গু হয়ে আছে। ছোড়দি এক শিখ ভদ্র লোককে বিয়ে করে রাওলপিণ্ডিতে আছে। বড়দির শ্বশুরবাড়ী নাকি বেজায় বড়লোক আর ভীষণ গোঁড়া। বড়দা বৌদি মা-বাবার কাছেই আছে। ছোড়দা তার শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে-সেখানেই থাকে। মেজদা বিয়ে করেনি—বাবা নাকি কানে একদম শোনেন না। মায়ের দৃষ্টি খুব খারাপ। টুকরো টুকরো এমনি কত কথা আপনা থেকেই মনে আসছে, চলে যাচ্ছে। কে আসবে এয়ার পোর্টে? তাদের ও চিনতে পারবে এতদিন পরে! ওকেই কি একদানে চিনবে সকলে? ওর বিশুদ্ধ বাংলা কথাতেও নাকি নির্ভেজাল ইংরেজী টান ধরে গেছে ঠাট্টা করবে নাতো কেউ? কলকাতাটা কেমন আছে? চোদ্দ বছর। সে কতদিন? চোদ্দ ইনটু তিনশ' পয়ষট্টি—কত হয়? দূর ছাই—আর কিছু ভাবতে পারবে না।

সব ভাবনার শেষ হোলো। সব কল্পনার ইতি টেনে। রাতুলের হৃৎ-পিণ্ডের লাফালাফির সঙ্গে তাল রেখে চক্কর খেতে খেতে ঠোক্কর মারতে মারতে বি, ও, এ, সির বিরাট প্লেনখানা দমদমের মাটি ছুল। তারপর কিছুক্ষণ রাতুল স্বপ্ন দেখল। অনেক কিছুই দেখল—মনে করতে পারলো না কোনটাই। অনেক চিন্তা মনের মধ্যে ডানামেলে উড়ে বেড়ালো—ধরতে পারলোনা কোনোটাকেই। অনেক শব্দই কানের পর্দায় তরঙ্গ তুলল—গ্রাহকযন্ত্রে প্রতিক্রিয়া হোলো না কিছুই।

অনেক আলিঙ্গন, করমর্দন, শিরচুম্বন, আনন্দাশ্রু বিসর্জন, শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন, প্রণাম আদান প্রদানের পর মাকে জড়িয়ে ধরে গাড়ীতে ওঠার সময় দাদুর গলাটা স্পষ্ট হয়ে কানে বাজল—ছোটমামাকে বলছেন

'তা'হলে তোমার থিসীসটা কমপ্লিট করতে পারলে সুচরিত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ পারলাম আপনাদের আশীর্ব্বাদে।'

'সময়টা বড্ড বেশী লেগে গেল না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—চোদ্দ বছর!'

চোদ্দ বছর। থিসীস? ফিরে দাঁড়াল রাতুল। ভিড়ে ওঁরা ওকে দেখতে পেলেন না। তখনও কথা চলছে। 'কি নামে দিলে?' দাদুর প্রশ্ন।

'আজ্ঞে নামটাও একটু বড় হয়ে গেল—নাম দিলাম—বাঙালীকে কে তৈরী করে—পরিবার বন্ধন না পরিবেশের প্রভাব ?'

'আর ইলাস্ট্রেশন ?'

'এই যে তালুই মশায়—আমার জ্যান্ত জীবন্ত সার্থক ইলাস্ট্রেশন—আপনাদের গৌরব আমার আনন্দ শ্রীমান রাতুল মুন্সুর।' মাথায় হাত রাখলেন ছোটমামা। পরিজনের প্রীতি বন্ধনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে যেন মুক্তি পেল রাতুল।

সর্পিল
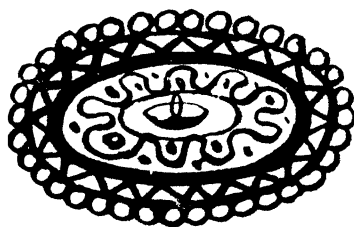
বেলা দেবী

সুজাতা সুশ্রী। বেশ ঢলঢল মিষ্টি চেহারা। মায়ামায়া লাবণ্যভরা মুখখানি। একনজরেই চোখ পড়ে যায় তার দিকে। তাই পুষ্পেন্দুর বাবা আর কালক্ষেপ করলেন না। তড়িঘড়ি কথাটা পেড়ে বসলেন।

পুষ্পেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, সুজাতার বাবা শৈলেশ সরকারের বন্ধু। থাকেন আসানসোল। রেলওয়েতে চাকরি করেন। দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছেন সুজাতাদের বাড়ী।

শৈলেশ সরকার ও পূর্ণেন্দু বিশ্বাস সেই স্কুল-জীবন থেকেই পরস্পরের বন্ধু। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছেন। কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন। তারপর কর্মসূত্রে যদিও এক একজন এক একদিকে ছিটকে গেছেন তবু প্রথম দিকে সুযোগ পেলেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ছুটে এসেছেন। তারপর কালচক্রে আস্তে আস্তে তা কমেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শেষ দেখা হয় প্রায় দশ বছর আগে। দীর্ঘকাল বাদে আবার এই দেখা।

পূর্ণেন্দু বললেন—শৈলেশ, আমার পুষ্পর জন্য তোমার সুজাতাকে দাও। আগামী ফাল্গুনেই আমি পুষ্পর বিয়ে দিতে চাই।

শৈলেশ বিস্মিত হয়ে বললেন—বিয়ে! খুকুর! খুকু এই তো সবে আঠারোয় পা দিল। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। এখুনি বিয়ে কি! আরও পড়াশুনো করুক—।

পূর্ণেন্দু জোর দিয়ে বললেন—করুক না। আমার ঘরে গিয়ে করবে। তোমার কাছ থেকে কিছু অনাদরে থাকবে না আমার কাছে।

সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু বয়সটা খুব কম কিনা—

পুষ্পর বয়সও তো এই সবে চব্বিশ। তুমি তাকে ভাল করেই জান। তবে তার সম্বন্ধে তোমার মনে যদি কোন সংশয় থাকে—

আরে না, না, সেসব কিছু নয়। পুষ্পর মত এমন পাত্র বাংলা দেশে ক'টা আছে। এই বয়সে এমন চাকরি, তবে কিনা—

ওই তবে-টবেগুলো ছেড়ে দাও শৈলেশ।

পূর্ণেন্দুর নির্বন্ধাতিশয্যে সত্যিই পুষ্পেন্দুর সঙ্গে সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল। বেশ মানিয়েছে দুটিতে. দুই পক্ষই খুশি হল। এবার সবাই বলতে লাগলো—ভাল পাত্র পাওয়া গেলে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়াই তো ভাল।

পূর্ণেন্দু কথা রাখলেন বটে। সুজাতার পড়া বন্ধ হলো না. আর আদর যত্ন।

সুজাতার কমনীয় মুখে সবসময় যে আলো ঠিকরে পড়তো তাতেই বোঝা যেত সে আদরে আছে কি অনাদরে আছে।

এমন রূপসী বৌ পেয়ে পুষ্পেন্দুও একেবারে বেসামাল। ঝালাপালা করে মারত সুজাতাকে।

সুজাতা বলত—আঃ, ছাড়ো দি'কিনি। সব সময় জ্বালাতন। আমার কাজকর্ম নেই বুঝি।

পুষ্পেন্দু চাপা কৌতুকে বলতো—বা রে, বাবা কথা দিয়ে এনেছেন তোমাকে ওখান থেকেও এখানে বেশি আদরে রাখা হবে। শেষকালে আদরে কমতি হলে আমার বাবাকে তোমার বাবার কাছে জবাবদিহি করতে হবে আর আমাকে আমার বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মরতে হবে।

সুজাতা খিলখিল করে হেসে ওঠে—আদর না ছাই! জ্বালাতন জ্বালাতন! একটু কমতি হলে রেহাই পাই।

পুষ্পেন্দু আরও গম্ভীর হয়ে বলে—না, বুড়ো বয়সে বাবার কাছে বকুনি খেতে পারবো না।

সুজাতা হেসে গড়িয়ে পড়তো। খুসির রামধনু উঠত ওর মনের আকাশে। তার সারামুখে সেই রঙের প্রতিফলন।

বিয়ের বছর দেড়েক পর সুজতার একটি ছেলে হল। ছেলেটি যখন

এক বছরের তখন ঘটল সেই চরম সর্বনাশ। ট্রেন এ্যাকসিডেন্টে পুষ্পেন্দু মারা গেল। বজ্রাহত হয়ে গেল দুটো পরিবার। পূর্ণেন্দু আর্তকণ্ঠে বার-বার বলতে লাগলেন—আমায় ক্ষমা কর শৈলেশ, আমায় ক্ষমা কর।

তোমার কি দোষ।

আমিই সুজাতার এই সর্বনাশের 'নিমিত্ত' শৈলেশ। আমার যা হবার তা তো হলই কিন্তু আমি সেদিন এত জোর না করলে তুমি হয়তো আজও মেয়ের বিয়ে দিতে না।

শৈলেশ শুধু বললেন—নিয়তি, সবই নিয়তি।

পুষ্পেন্দুর মা ছিল না। সুজাতা নিজের মা বাবার কাছেই রয়ে গেল।

কিছুদিন যেতেই শৈলেশ বলতে আরম্ভ করলেন—একুশ বছর বয়সে একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে! এ হতেই পারে না। আমি খুকুর আবার বিয়ে দেব।

সবাই বললো—সে তো ভাল কথা। কিন্তু ছেলে রয়েছে যে একটি। এই অবস্থায় কে ওকে বিয়ে করবে।

বাংলাদেশে কি এমন উদার পাত্র একটিও পাওয়া যাবে না?

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। সুজাতার ছেলে বাচ্চু যখন চার বছরের তখন নির্মল গুহ বাচ্চুর পুরো দায়িত্ব নিয়ে সুজাতাকে বিয়ে করল।

সুজাতার মন পুষ্পেন্দুর জন্য আবার নূতন করে শোক অনুভব করলো। সুজাতা ভয় পেলো। সঙ্কোচে আড়ষ্ট হল। কিন্তু প্রতিবাদ করবারও সাহস পেল না। 'না' বলার মত মনের জোর নেই। মন ভীরু হয়ে গেছে। নিতেও ভয় ছাড়তেও ভয়। পুষ্পেন্দু সুজাতার জীবন যতখানি ফাঁকা করে দিয়ে গেছে তা কি সম্পূর্ণ ভরলো! তবুও সে যেন একটা অবলম্বন পেলো।

আর অন্যরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একুশ বছরের একটা জীবনকে তিলে তিলে ব্যর্থ হতে দেখলে কি সহ্য করা যায়।

একটা মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হলো।

কিন্তু সমাধান কি হলো? গোল বাধাল ঐ একরত্তি ছেলে। সবাই যা স্বীকার করে নিল ঐ ছেলে তা স্বীকার করল না।

নির্মল আদর করে বাচ্চুকে বলে—বাচ্চু, আমি তোমার কে হই বলত?

জানি না।

আমি তোমার বাপি হই। বুঝলে?

কক্ষনো না। আমি আমার বাপির ছবি দেখেছি।

হ্যা বাচ্চু, আমি তোমার বাপি। কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তবে তুমি বলবে তোমার নাম পুলকেন্দু গুহ আর তোমার বাপির নাম নির্মল গুহ।

এঃ, মিছে কথা। আমার নাম পুলকেন্দু বিশ্বাস আর আমার বাপির নাম পুষ্পেন্দু বিশ্বাস। না মামনি?

অর্থাৎ এক কথায় নিজের নাম বা বাপের নাম ভুলিয়ে দেবার মত কাঁচা ছেলে ও নয়।

সুজাতা অসহায় চোখে চেয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না। একদিন এই নামগুলো সুজাতাই তো বাচ্চুকে শিখিয়েছিল। পাখীর মত পড়িয়েছিল। সুজাতার ড্রয়ারে পুষ্পেন্দুর একখানা ছবি ছিল। একদিন সুজাতা দেখে বাচ্চু কি করে ড্রয়ার খুলে ছবিখানা বের করেছে। সামনে রেখে হাত জোড় করে প্রণাম করছে। সুজাতাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো এই তো আমার বাপির ছবি। না মামনি?

সুজাতার বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল। এক সময়ে সুজাতাই রোজ বাচ্চুকে ছবিখানা দেখিয়ে বলতো—বাচ্চু, এই তোমার বাপির ছবি। প্রণাম কর। বলে দু'টি কচিহাত জোড় করে প্রণাম করা শেখাত।

সুজাতা মুখে কোন কথা জোগাল না। শুধু বাচ্চুর হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে আলমারিতে তুলে রাখলো।

এমনি করে বাচ্চু সুজাতার নূতন সংসারে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল যেদিকটা সুজাতা আগে কখনও ভাবেনি। সুজাতা কি ভুল করলো?

একদিন যা হারিয়েছিলো তা কি সুজাতা আবার ফিরে পেয়েছে? সেই মন, সেই রঙ। কখনো না। কখনো না। উপরন্তু বাচ্চুর প্রতিটি কথা প্রতিটি আচরণ সুজাতার মনকে খেঁতলে দিচ্ছে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। সুজাতা আজকাল বাচ্চুকে ভয় করে। এই ছেলে যখন আরও বড় হবে—আরও বড়—তখন? সুজাতা শিউরে ওঠে।

ইতিমধ্যে সুজাতার আরও একটি ছেলে হয়েছে। তারপর একটা মেয়ে, বুলু আর রাণু। তারা নির্মলকে 'বাপি' ডাকতো বাচ্চু কিন্তু কিছুই ডাকতো না। হয়তো সুজাতা কখনও বলে ফেলেছে—বাচ্চু, বাপিকে ডাকতো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে।

অমনি বাচ্চু গম্ভীর মুখে জবাব দিতো—তুমি কি জান না মামনি যে ও আমার বাপি নয়। ওকি দেখতে ছবির বাপির মত?

স্কুলে ভর্তি হবার সময়ও বাচ্চু নাম নিয়ে তুলকালাম করে ছাড়লো। নির্মল বাধ্য হল তার নাম পুলকেন্দু বিশ্বাস এবং বাবার নাম স্বর্গীয় পুষ্পেন্দু বিশ্বাস দিতে, শুধু অভিভাবক হিসেবে নির্মল গুহ নামটা রইল।

ইতিমধ্যে বুলু আর রাণু বড় হয়েছে। আজকাল অনেককিছু তাদেরও চোখে পড়ে। তারা বলে—মামনি, আমাদের বাপি দাদার কি হয়? দাদা তাকে বাপি বলে না কেন? বা-মামনি, আমরা নামের পরে গুহ লিখি দাদা বিশ্বাস লিখে কেন? এই প্রশ্নগুলোর কি জবাব দেবে সুজাতা? তার মনে একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একরাক মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে।

পোষ্য

গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়

পারমিতার নতুন সখ হয়েছে—কিছু একটা পোষার। নন্দিনীর কি লাভলি একটা ককার স্পেনিয়েল আছে—ব্যস্ত থাকার কি চমৎকার একটা কারণ। গম্ভীর হয়ে কত গল্প করে নন্দিনী। কখনো বলে—"আমি ভীষণ ওয়রিড রে ডগিটাকে নিয়ে—কি রকম ফ্যাট গ্রো করছে দেখেছিস? ঐ জন্যে রোজ একটু করে এক্সারসাইজ করাচ্ছি এখন—"

আবার কখনো যদি পারমিতা নন্দিনীকে ফোন করে বলে—"যাবি নন্দিনী সকালের দিকে একটু মার্কেটে?" নন্দিনী কি সুন্দরভাবে দুঃখিত হয়ে বলে—"ভীষণ সরি রে—আজ ডগিটাকে শ্যাম্পু করাবার দিন—"

তাছাড়া কুকুরটা কাজই বা কত করে। মুখে করে খবরের কাগজ এনে দেয়। ওপর থেকে নীচে চাবি পৌঁছে দেয়। এমন কি নন্দিনী কোথা থেকেও বাড়ী ফিরলে ওর বাড়ীতে পরবার স্লিপার জোড়াও মুখে করে এনে দেয়। পারমিতার যদি ওরকম একটা কুকুর থাকতো। বেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে—বাড়ীতে অতিথি এলে দারুণ বিক্রমে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে—আবার নন্দিনার মত মিহিসুরে ধমক দিলেই গুটি গুটি সোফার তলায় গিয়ে ঢুকবে। পারমিতা নন্দিনাকে বলেও রেখেছে—যদি ওকে একটা ঐ রকম কুকুর জোগাড় করে দেয়।

ওর বন্ধু মীরাদের একটা উল্লুক আছে। সেটাও দারুণ কাজের। মীরা যখন পারমিতাকে ওদের বাড়ীর গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে বিদায় দিতে আসে—উল্লুকটা মীরার কাঁধের ওপর বসে পিট পিট করে পারমিতার দিকে তাকায়। মীরা আবার ওটার নাম রেখেছে 'সুন্দরী'! মীরার ছোড়দা বলে 'ছুছুন্দরী। ছুছুন্দরা কাজ করে কত। এই তো সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মীরা পারমিতার সঙ্গে গল্প করছিল ওর হাত থেকে চিরুণীটা টপাস

করে পড়ল নীচের লনে। ব্যস্—ছুছুন্দরী অমনি লম্ফ দিয়ে ছুটলো। বারান্দার কার্নিশ বেয়ে, জানালার গরাদ বেয়ে, একেবারে লনে। আবার চোখের পলকে চিরুণীটা এনে হাজির করলো মীরার হাতে। এ ছাড়া সারাদিনই ফাইফরমাস খাটছে ছুছুন্দরী। সারাদিন ওদের লনের ধারে ধারে বড় বড় গাছগুলোয় চড়ে খেলে বেড়ায়। পারমিতা মুগ্ধ হয়ে দেখে। পারমিতার যদি ওরকম একটা উল্লুক থাকতো।

সেই মীরাই সেদিন টেলিফোন করে বললে—"মিতা তোর তো উল্লুকের সখ? নিবি একটা? আমাদের ছুছুন্দরীর একটা ভাই ছোড়দার বন্ধু অসীমদাদের বাড়ীতে আছে। অসীমদা দিল্লীতে বদলী হয়ে যাচ্ছেন তাই উল্লুককে ইণ্টারেস্টেড কাউকে দিয়ে দিতে চাইছেন—"

বাড়ীতে কথাটা পাড়তেই সবাই যেন রে রে করে মারতে এল। "উল্লুক কি একটা পোষার মত জন্তু হোলো? এমন উদ্ভট সখও কখনও দেখিনি বাপু। লোকে কুকুর, বেড়াল, গরু, মোষ, ছাগল, পাখী কত কি পোষে-উল্লুক তো কাউকেই পুষতে দেখিনি—এক চিঁড়িয়াখানার লোকেরাই যা রাখে—"

পারমিতার মেজাজ গেল খিঁচড়ে। জোর গলায় বল্লে—"কেন পুষবেনা—মীরারাই তো পুষেছে—"

—"মীরাদের বাড়ীতে অত বড় লন রয়েছে, গাছপালা রয়েছে—সেখানে সে খেলে বেড়ায়—আমাদের এই বাড়ীতে ও তো হাঁফিয়ে মরে যাবে—"

যুক্তি অকাট্য। হোলো না উল্লুক পোষা। যাক গে—। বাড়ীর লোকেদের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলেও পারমিতা মনে মনে ভেবে দেখেছে—ওর নিজের কুকুর পোষার দিকেই ইনটারেস্ট বেশী। চমৎকার—একটা চামড়ার ষ্ট্র্যাপে বেঁধে বিকেলবেলা একটু করে হেঁটে আসা। সে কি আর হবে? যদিও নন্দিনীদের বাড়ীর সামনে যেরকম একটা পার্ক আছে—ওদের বাড়ীর ধারে কাছেও তা নেই। তাতে কি হয়েছে? মাঝে মাঝে ময়দানেও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে মেমসাহেবদের মত। অবশ্য বাবা যদি গাড়ীটা দেন। আত্মীয় বন্ধু সকলকেই ও বলে রেখেছে—একটা কুকুরের কথা।

পারমিতার দাদু মানে ওর মার বাবা প্রায়ই আসেন নাতনীর খবর নিতে। দীর্ঘদিন বিলেতে কাটানোর ফলে—পোষাকে আসাকে, চলনে বলনে তিনি

াক্কা সাহেব। খালি কথায় কথায় সাবেকী ঢংএ—ছড়া কাটার যা বাঙ্গালী-ানা আছে। তিনিও নাতনীর আবদার রাখতে প্রতিশ্রুতি দিলেন—একটি ারমেয় রত্ন উপহার দেবেন। থিয়েটারী ঢংয়ে হাত নেড়ে বল্লেন—

"চাঁদ মুখ কেন ভার ভার হেরি কন্যে ?
সাত সমুদ্র তের নদী ঢুঁড়ে তামাম দুনিয়া চসে
হাজির করবো পোষ্য তোমার জন্যে॥"

বললে কি হয়—কবে যে দেবেন তার কি কোনো ঠিক আছে ? তিমধ্যে বাবার মুহুরী যোগেশ বাবু এক বেড়ালের খবর আনলেন। বল্লেন--বেড়াল রাখতে চাও তো খুব ভালো বেড়াল এনে দিতে পারি। এ যে া বেড়াল নয়। দিশী কি কাবলি বেড়াল নয়—এ বেড়াল সায়েবরা পোষে—যমনি রূপ, তেমনি স্বভাব—এ হোলো শ্যাম দেশের বিড়াল। এক ইহুদি ায়েব বিলেত চলে যাচ্ছে—

"ওঃ শিয়ামিজ ক্যাট ?" সাহেবরা রাখে শুনে পারমিতা একটু যেন উৎসাহিত হোলো।

"দিতে পারবেন ?"

বেড়ালের চরিত্র সম্বন্ধে যোগেশ বাবুর সার্টিফিকেট নস্যাৎ করে—

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বাগড়া দিলেন—"না না—বেড়াল কি হবে ? চোরের াত যত। যতই খাওয়াও দাওয়াও—চুরি করবেই ওরা। আর তাছাড়া ড়ীতে বেড়াল আনা মানেই ডিপথিরিয়াকে পূজো করে নিয়ে আসা—না যোগেশ বাবু—ঐ বেড়াল টেড়াল আমদানি করবেন না—" হয়ে গেল ড়াল আনা। অবশ্য ঐ 'শিয়ামিজ ক্যাট' শুনেই পারমিতা যা একটু ৎসাহিত হয়েছিল। যাকগে—চোর পুষে কাজ নেই। ঐ কুকুরই ভালো -যে চোর তাড়াতে পারবে।

ইতিমধ্যে লাল মাছ—গিনিপিগ এসব পোষার পরামর্শও পেয়েছিল ারমিতা—কিন্তু ওর ঐ কুকুরেরই ঝোঁক।

অবশেষে নন্দিনী একদিন ফোন করল—"মিতা, জানিস তো—মাসখানেক ালো আমাদের কুকুর রানীটার তিনটে বাচ্চা হয়েছে। আমরা তার মধ্যে টা দিয়ে দোব—নিবি নাকি একটা ?"

হুররে,—এ আবার জিজ্ঞেস করবার মত একটা কথা নাকি? পারমিতার এতদিনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

তালের মাথায়—বাবার গাড়ীটাও পাওয়া গেল। বাড়ীর কাউকে কিছু না বলাই ভালো এখন। একেবারে সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।

চমৎকার একটা কুকুর ছানা নিয়ে পারমিতা বাড়ী এল। কুকুর না তো ঠিক যেন একটা পশমের বল,—পশম বললে ভুল বলা হয়—যেন সিল্কের তৈরী ওর গা'টা। কান দুটো যেন ছোট্ট ছোট্ট দুটো বাঁধাকপির পাতা, জুল জুলে দুটো চোখ, কুচকুচে কালো—একরত্তি। কি ভাবে খাওয়ালে দাওয়ালে চলবে—সব নন্দিনা বুঝিয়ে দিয়েছে।

থিয়েটার রোডে দাদুর বাড়াতে গিয়ে দাদুকে দেখিয়ে আনলেই হোতো একেবারে। কি নাম রাখবে মনে মনে ঠিক করতে লাগলো পারমিতা।

কিন্তু বাড়িতে পদার্পণ করতেই প্রলয় বাধলো। পিসীমা চিৎকার করে উঠলেন—"মেয়ের আক্কেল বিবেচনা কবে হবে জানি না। গুরুদেব বছরে একবার দয়া করে পায়ের ধুলো ত্থান—সে টুকুও ঘুচতে চললো। কোত্থেকে এক অনাছিষ্টি বাড়াতে এনে তুলেছে। গুরুদেব তো এখানে জলস্পর্শ করবেন না। আমার হয়েছে যত অধর্মের ভোগ। আর রবিকেও বলি—মেয়েকে কলেজে পড়িয়ে তো ধিঙ্গী করে তুলেছে—বিয়ের নাম গন্ধও নেই—তা মেয়ে উচ্ছন্নে যাবে না তো কি—"

রবি অর্থে পারমিতার বাবা। মা ফিসফিস করে বললেন—"কি দরকার? পিসীমা বিধবা মানুষ—ওর কি কোথায় ছুঁয়ে দেবে শেষকালে—যাও ফেরৎ দিয়ে এসো নন্দিনাকে—"

উঃ দাদুর মত সাহেবের এই গেঁয়ো মেয়ে যে কি করে হয় কে জানে। কিন্তু প্রাণ ধরে কি দেওয়া যায় এ জিনিষ? এত নিষ্ঠুর যে কি করে সবাই হয় কে জানে। কি দরকার গুরুদেবের বছর বছর আসার? যতদিন থাকেন হাড় মাস তো ভাজা ভাজা করে দেন। উঠতে বসতে প্রণাম করতে করতে কোমরের হাড় ভেঙে হায়। তোয়াজ তরিবৎ করতে করতে বাড়ীশুদ্ধ লোক হিমসিম খায়। পিসীমার নাকি পুণ্য হয়। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

নন্দিনাদের বাড়া গিয়ে খুব দুঃখিত হয়েই বল্লে—"কিছু মনে করিসনি রে নন্দিনী। আমার ভাগ্যে কুকুর পোষা নেই। বুঝলি—আমাদের বাড়ীর

মধ্যে এখনো এইটিন্থ সেঞ্চুরীর হাওয়া বইছে। জব চার্ণকের আমল—এখনো আমাদের বাড়ীতে শেষ হয়নি। হাতের কাছে গোটা কতক সতী পেলেই ওরা বেগুনপোড়ার মত দাহ করার জন্যে রেডি—"

বাড়ী এসে গুম হয়ে নিজের ঘরে বসে রইলো পারমিতা। শুনেছে ও বাবা মার একমাত্র সন্তান তাই খুব আদুরে। এই বুঝি আদরের নমুনা? দাদুর গলা পাচ্ছে পারমিতা চোখে সত্যিই জল এসে গেছে।

দাদু ঘরে ঢুকেই স্রাগ করে বললেন—'গুড মর্ণিং পারমিতা দেবী। আজ সন্ধ্যায় এ অধমের কুটিরে যদি পায়ের ধূলো দেন তো অধম ধন্য হবে। সামান্য ডিনারের আয়োজন করেছি—" অন্যদিন হলে দাদুর বাড়ীর ডিনারের কথায় পারমিতা আনন্দে লম্ফ ঝম্ফ সুরু করে—কিন্তু আজ চুপ।

—"হোলো কি?" দাদু ঝাঁকনি দিলেন পারমিতার কাঁধ ধরে, "কুকুর ছানার শোক?" যাত্রার নায়কের মত হাত নেড়ে সুর করে বললেন—

"পোষ্যই যদি নিতে হয় সখী
কি লাভ কুকুর কি মার্জ্জারে?
সবার উপরে মানুষ আছে,
খুঁজে বার করে বেঁধে ফেলো তারে॥"

"ঐ কথা রইলো—সকাল সকাল আসা চাই—"

*　　　*　　　*　　　*

দাদু মা'র সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন।

পৃথ্বীশকে বেশ ভালোই লাগলো পারমিতার। দাদু ঐ দিন পৃথ্বীশকেও ডিনারে ডেকেছিলেন। বেশ সুটেড বুটেড হয়ে হাজির হয়েছে পৃথ্বীশ। সবে বিলেত থেকে ফিরেছে—কস্ট এ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে। এখানে একটা মার্কিন কোম্পানীতে কাজও পেয়ে গেছে। বেশ সপ্রতিভ চেহারা। ভারতীয় উষ্ণতায় এখনো যেন খাপ খাওয়াতে পারছে না। মুখে বলছে—'এতদিন পরে দেশে ফিরে ভারি ভালো লাগছে'—অথচ ভঙ্গীতে একটা অসহিষ্ণু ভাব। রুমালের বদলে টিস্যু পেপারে ঘন ঘন ঘাম মুছছে। স্মোক করে না অথচ হুইস্কিকে আপত্তি নেই। আনকোরা বিলিতি এখনো।

পারমিতা চুপচাপই ছিল। দাদুর সঙ্গে অবশ্য অনেক কথা হোলো। ওদেশের আবহাওয়া, বাজার দর, টেন ডাউনিং ষ্ট্রীট, ওয়ার্ল্ড কাপ পর্য্যন্ত।

ভেতরে ভেতরে সম্বন্ধটা চলছিল। মেয়ে দেখানোর ভারটা দাদুই নিয়েছিলেন। বিয়েটা হতে খুব একটা কাউকেই বেগ পেতে হয়নি।

দাদু ভালোই পোষ্য জুটিয়ে দিলেন। ডাকলেই কাছে আসে—চাই কি—অফিস কেটে আসতেও রাজা। মুখের কথা খসালেই তা সঙ্গে সঙ্গে পালিত হয়। এমন কি অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায়ই ফ্লুরির পেস্ট্রী হাতে ফিরতে দেখা যায়। নন্দিনীর পোষ্য কি এতটা করতে পারে? দাদু তাই বলেন—"কিরে পোষ্য কি মনের মত হয়েছে?" তারপর তাঁর চিরাচরিত ঢং-এ কবিতা বলেন—

"পেস্ট্রী আনছে কারণ এখনো
গায়েতে বিলিতি গন্ধ
বছর ঘুরলে তেলেভাজা পাবি
লাগবে না তাও মন্দ।"

এখন পারমিতার কুকুর পোষার সখ আর নেই॥

ফুলটুসি

ইন্দিরা দেবী

ফুটফুটে মেয়েটা এসে পড়লো সংসারের মাঝে। মাসীর সঙ্গে দু'দিন বেড়াতে এসেছিল বিয়ে বাড়ীতে, কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ভাল মানুষটি মামা। মাসী তো তার কেউ নয়—তাদের পাশে বড় বাড়াতে থাকে. ওরা বড়লোক। শুধু মাসার সঙ্গে আসবে বলেই বায়না। মা শত কাজের মানুষ। বকুনী দিয়ে বলে: যবো যাবো বলে বায়না ধরেছিস কেন? মাসী যাচ্ছেন ওঁর আত্মীয় বাড়া বিয়েতে। তুই কোথায় যাবি? ওরকম বলতে নেই। ওঁরা বড মানুষ...।

—বড় মানুষ তা হয়েছে কি। না আমি যাবো—নাক টেনে মেয়েটি বলে। বকুনী খেয়েও থামে না। অবশেষে মাসা জানতে পেরে বললেন: তা কাদছিস কেন? চল আমি নিয়ে যাবো তোকে—দাও না গো সরলা মেয়েটাকে...।

মাসা ওকে ভালবাসে। চোখের জল মুছে ফুলটুসি উঠে দাঁড়ালো। মায়ের কাছে থেকে একটা সাবান কাচা ফ্রক কাগজে মুড়ে নিয়ে মাসার কাছে এলো। মাসী বললেন: ও, এসেছিস, আয়! জুতো নেই বুঝি? ওরে লতা, দেখতো তোদের পুরোনো জুতোটিতো আছে কিনা কিনা ওর পায়ের মত, জামাও একটা দেখ ওর মত।

ফুলটুসি বললে: এইতো আমার জামা আছে। আর জুতো আমি পরি না।

ধমকে উঠলেন মাসী: জুতো পরি না কি আবার কথা? আমার সঙ্গে গেলে পরতে হবেই। আর যা রাস্তার অবস্থা কতকি ছড়িয়ে আছে—ঠিক নেই। দে রে লতা, দেখে শুনে একটা পরিয়ে—।

ততক্ষণে লতাও বেছে বেছে একজোড়া পুরোনো জুতো বার করে এনেছে আর সেটা বেশ চমৎকারভাবে ওর পায়ে লেগে গেছে।

মাসী আবার বললেন : যা এইটুকু সাবাস নে আর এই ছোট চিরুনীটা। চান করে চুল আঁচড়ে—পরিষ্কার হয়ে নে, আর এই প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগটা নিয়ে সব গুছিয়ে রাখ—সঙ্গে নিবি।

পুরোনো প্লাষ্টিকের ব্যাগটায় টুকিটাকি পাওয়া জিনিসগুলো সব গুছিয়ে ফুলটুসি প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কখন মাসী তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা হবেন।

একেবারে স্বপ্নের রাজত্ব। এসব ফুলটুসি চিন্তাও করতে পারে না। বিশ্বসংসারে এত আছে? বিয়ে বাড়ীর সানাইএর সঙ্গে আলোয় ফুলে রঙীন কাপড়ের সঙ্গে বাড়ীটা সেজে উঠেছে, যেন হাসছে। কত লোকজন আসছে, গাড়ী থেকে নামছে। দামী দামী অলঙ্কার পোষাকে সেজে ঢুকছে, হাসি কথায় উচ্ছল হয়ে পড়ছে, তারপর টেবিলে কলাপাতায় সাজানো ভাল ভাল খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছে। যার বিয়ে তার সামনে জিনিসপত্রের স্তূপ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীর লোকেদেরও সময় নেই। মাঝে মাঝে ফুলটুসির ভয় করছে, এখানে এসে মাসীর মেয়রোও ওদের সঙ্গে মিশে ওকে ভুলে গেছে। সোফার উপর বসে গল্প করছে। বড়দের কাছ থেকে চেয়ে আনা তবক দেওয়া পান মুঠো মুঠো চিবোচ্ছে, বোতলের লাল সবুজ জলগুলো দেদার খাচ্ছে। ফেলছে, আর অকারণ সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কত ফুলের মালা ছিঁড়ছে, খেলছে, ফেলছে।

ফুলটুসি এক কোনে দাঁড়িয়ে দেখছে। মার কথা শুনে না এলেই হতো। এসব দেখে কেমন ভয় ভয় করে। লতাদি তো ওকে ভালবাসে। সেও যদি একটু কাছে ডেকে নিতো তাহলে ওর হয়তো এরকম হতোনা। সেতো এত বড় উৎসব কখনও দেখেনি। আনন্দ উৎসবের এত ঝলমল রূপ আছে। তার ছোট্ট জীবনে সে জানেই না।

ছোটবেলায় গ্রাম থেকে চলে এসেছে—সে কথা তার একটু একটু মনে পড়ে এখনও। সান বাঁধানো পুকুরটার সামনে তাদের খড়ের ছাউনীর একতলা বাড়ী, বড় উঠেনি। কতগুলো সারি সারি ঘর। চৌকী পাতা। মার আর কাকির ঘরে ঘেরা টোপ দেওয়া ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্স। বড় চৌকিটায় মা আর তারা শুতো—ঠিক সামনেই একটা বড় কাচ বাঁধানো ছবি। অনেক

লোকজন, তার মধ্যে খুব সেজে একজন পুরুষ, একজন মার মত মেয়ে কিন্তু কি সুন্দর চেহারা ওরা সিংহাসনে বসে আছে। ঘুম ভেঙেই মা সেই ছবির দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করতো। ঐ ছবিটা নাকি রামায়ণের গল্পের রামরাজা'র—পাশে বসে সীতা। এ গল্প সে অনেকবার শুনেছে। পাশের ছোট চৌকিটায় বাবা শুতো, কখন শোয়া কখন ওঠা সে কোনোদিন দেখতে পায়নি। তাদের বাড়ীটার চারদিকে গাছপালা। উঠোনের কোনে তুলসী মঞ্চ, ফুলের গাছ, লেবু গাছ, পেয়ারা গাছ—অজস্র গাছ আর দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা আম কাঠালের গাছগুলোও কত বড়। অশ্বত্থ বটের ছায়ায় ভাইবোনদের নিয়ে খেলা করার কথাও তার বেশ মনে হয়। বাবা কাকা নাকি ক্ষেতের কাজে চলে যায়। মা রান্নাঘরে রান্না করতো, কাকি যোগাড় করে দিতো। মায়ের রান্নার ফোড়নের গন্ধ এখনও যেন মাঝে মাঝে নাকে আসে। কোনের ঘরটায় সাদাচুল ঠাকুমা কেবলই খাবার চাইতো। ঝকঝকে মাজা কাঁশিতে করে মা ভাত তরকারী গুছিয়ে নিয়ে যত্ন করে খাইয়ে আসতো আর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই ঠাকুমা বলতে শুরু করতো তোরা আজ আমায় খেতে দিবিনি? মা চুপ করে থাকতো, কাকি বলতো এ ভীমরতি আর কতদিন যে থাকবে?

সবার খাওয়া হলে বাসনের বোঝা নিয়ে মা পুকুর ঘাটে যেতো, কাকির সঙ্গে। কত তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিতো বাসনগুলো, সোনার মত ঝকঝক করতো। বাবা কাকা বাড়ী ফিরবার সময় ছোট বড় কত মাছ হাতে করে আসতো বলতো: বাবুদের বিলে নেমেছিল—কত মাছ উঠেছে বাবুদের দিয়ে এইগুলো এসেছে বাড়ীর জন্য। কাকি বঁটি পেতে কুটতে বসতো—তারা ভাইবোন ভিড় করে তাই দেখতো।

সন্ধ্যা হলে পিদীম আর লণ্ঠণের আলো জ্বললেই ফুলটুসির চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসতো। মা বলতো: ঘুমিয়ে পড়িসনি, ভাইবোনদের নিয়ে একটু খেলা কর। ভাত ফুটেছে। ওবেলার মাছঝাল আছে তাই দিয়ে আর দুধ গুড় দিয়ে খেয়ে তারপর ঘুমুবি।

আগুনের উপর বড় মাটির হাঁড়িতে টগবগ করে ফোটা ভাত দেখতে পেতো, তবু কোনো কোনো দিন দাওয়ায় পাতা মাদুরে শুয়ে পড়েছে আবার কতদিন চোখ টেনে জল দিয়ে দিয়ে জেগে থেকেছে। ছোট থালা

করে মা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত দিয়েছে সামনে ধরে। কী ভাল লাগতো খেতে। তারপর চৌকিতে উঠে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়া।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘোরা, দীঘির জলে চান করা আয় প্রায় হাঁটুর ওপর কাপড়পরা গ্রামের মানুষদের কত ভালো লাগতো তা ফুলটুসি বেশ মনে করতে পারে।

তারপর কি যে হলো তাদের—খাবার দিবি না বলতে বলতে ঠাকুমা একদিন চুপ হয়ে গেল, ঘরটাও খালি হয়ে গেল। মা মুখ শুকিয়ে বাবাকে বলতো : চল বাচ্চাদের নিয়ে আমরা চলে যাই। এখানে থাকলে না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

তারপর একদিন শহরের একপাশের—অনেক লোকের থাকা এক জায়গার একটা ঘরে এসে আশ্রয় নিল। দশটা ঘরের লোকের জন্য একটা জলকল ও অন্যান্য ব্যবস্থা। ঘর থেকে বেরিয়ে এক পা ফেলবার উপায় নেই। একটু বাড়তি জায়গা—নেই মাপ ছাড়া। কদিনেই প্রাণ হাঁফিয়ে উঠলো।

তারপর একদিন যখন ঘরে কিছুই রইল না, মা কাজে বেরোলো—এই মাসীদের বাড়ী। মাসীদের উঠোনের এক পাশে ভাইবোন দু'জনকে নিয়ে ফুলটুসি বসে থাকতো। একটু খোলা আলো বাতাস পেয়ে বেঁচে যেতো যেন তারা। তবুও ভাইবোনেরা শান্ত লক্ষ্মী, দেখতেও সুন্দর—তাই সবাই ভালবাসে। মা যখন অনেক কাজ নিয়ে পেরে ওঠে না। তারপর বাড়ী গিয়ে রান্না চড়ালে খাওয়া হবে—একটু মাজা একটা কড়াই দিয়ে বলতো, এই জলের ধারে বসে আস্তে আস্তে এটা মেজে ফেলতো মা। এতবেলা হয়ে গেছে, এখন বাড়ী না গেলে তোরা খাবি কি?

এমনি করে মাকে সাহায্য করতে করতে ছোটমেয়ে হলেও ফুলটুসি করতে করতে শিখে গিয়েছিল কাজকরা ও বাসন মাজতে। মাসী বলতেন : কেন সরলা কচি মেয়েটাকে ওসব দাও আহা কি নরম ফরসা আঙ্গুলগুলো, বড় কষ্ট হয়। সরলা বলতো : কি করি বল, পেরে উঠছি না।

বড় ভদ্র মেয়ে সরলা। গ্রামে থাকলেও বর্দ্ধিষ্ণু ঘরেই এসে পড়েছিল। সুস্থ স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাত্রা ছিল। অকস্মাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। অভাবেই তাদের চলে আসতে হলো।

মাসী সব বুঝতেন। ছেলেমেয়েরা এত অভাবী অথচ কত সুন্দর। বাড়ীর ছোটরা কেউ কিছু খেলে ওরা উপস্থিত থাকলে হয় উঠে যায় নাহলে পিছন ফিরে হাতের কাজ করে। হ্যাংলাপনা নেই, চেয়ে খাওয়া নেই। লোভের প্রকাশ নেই। কোনো জিনিসে হাত দেওয়া নেই। মাসী প্রায় বলতেন। সরলার ছেলেমেয়েরা কি সুন্দর। ঐ জন্যই ওদের ভালবাসতো সকলে—।

চোখ দু'টো ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। ঘরের এক কোণে সোফার পিছনটায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লো। কতক্ষণ এমন ছিল মনে করতে পারে না। পরিবেশনের বালতি হাতে লতাদি'র যেন কে হয়—বলছে: ওমা, তোমরা দেখনি, খুকুটা এখানে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যে। হাতের বালতি নামিয়ে রেখে ফুলটুসিকে দু'হাতে তুলে নিয়ে একেবারে খাবারেব টেবিলের সামনে বসিয়ে দিয়ে বললে: এই খুকু। খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়গে যা।

ঘুম ছুটে গেছে ফুলটুসির—চারিদিকে লোকজন। খাচ্ছে, হাসছে কথা বলছে—পরিবেশনের লোকদের নিয়ে কত মজার মজার কথা বলছে—কেমন ভয় পেয়ে গেল সে। এদিক ওদিক কোথাও লতাদি বা মাসীদের কারুর চিহ্ন নেই।

—খা, আর মাছ নিবি? মাংস? বলেই সেই লোকটিই তার পাতে খানিকটা করে ঢেলে দিলেন। আবার বললেন:

—খেয়ে নে খুকু শীগগীর। তারপর ঘুমুগে যা।

ফুলটুসির নাকে খাবারের সুগন্ধ আসছে—কি করবে ভেবে না পেয়ে খেতে আরম্ভ করলো।

হাত ধুয়ে আবার কোথায় শোবে যখন ভাবছে—তখন লতা এসে বললে: কোথায় ছিলি? খেয়েছিস? ব্যস, আবার লতা অন্তর্ধান হলো।

দু'টো তিনটে দিন কোথা দিয়ে চলে গেল।

মাঝে মাঝে সবাই জিজ্ঞাসা করে এই সুন্দর মেয়েটা কার রে?

তারপর মাসী যেন ফিসফিসিয়ে কী বলে তাদের—আবার তারা তার দিকে তাকায়—এই চাহনিই ফুলটুসির খুব লজ্জার কারণ হয়।

উৎসব শেষে মাসীর সেজ বোন বললে: এই ফুলটুসি আমার বাড়ী যাবি? আমি বাড়ী যাচ্ছি—চল। ঘাড় নেড়ে ফুলটুসি বললে: না মায়ের কাছে যাবো যে। সেজমাসী বললে: চল না বেড়িয়ে আসবি, মার কাছে পরে যাস—লতাও তো যাচ্ছে।

ফুলটুসিরও যাওয়া হলো—মোটে তো দু'দিনের জন্য। আবার ফিরে এলো তাদের সেই ঘরটিতে যখন তখন তার কেমন যেন লাগছে। অত বড় বাড়ী লোকজন সব কিছুর প্রাচুর্য্যের মধ্যে ক'দিনে যেন তার সব বদলে গেছে। আসবার সময় সেজমাসী বলেছিল: মাকে বলে আমার কাছে এসে থাকিস, আমাকে জল দিবি। চুল আঁচড়ে দিবি—পারবি না? আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকবি স্কুল যাবি। মাঝে মাঝে মাকে দেখে আসবি।

হ্যাঁ না কিছুই বলেনি ফুলটুসি।

কিন্তু ফিরে এসে ওর কেবলি সেজমাসীর কথা গুলো মনে পড়ে। ইস্কুল যাওয়া? ঐ তো দল বেঁধে বই নিয়ে, জলের বোতল পিঠে ঝুলিয়ে এক এক রংএর জামা পরে সব মেয়েরা যায় হাসতে হাসতে। আবার ফিরে এসে তারা যখন খেলাধূলা করে তখন তাদের ইস্কুলের কত গলাই শোনা যায়। লেখাপড়া করা না কি খুব ভালো। কিন্তু তার ভাগ্যে কি হবে? মা বেচারী একা কাজ পারে না। এখন সে বেশ শিখেছে। তবু মা কিছুটা হালকা হতে পারে। কিন্তু... একটা বৃহত্তর জীবনের বীজ যেন উপ্ত হয়ে যায় মনে।

মাসীর বার বার বলায়—সরলা মেয়েকে সেজমাসীর কাছে পাঠালো। সেজমাসীও একদিন এসেছিলেন বললেন: ভালো লেগেছে তোমার মেয়েকে সরলা। দাও না আমার কাছে! আমার ফাই ফরমাস দেখবে—ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থাকবে। পড়বে খেলবে তারপর আবার আসবে তোমার কাছে। আর মাঝে মাঝে তো আসবেই।

মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার কথা ভেবে সরলা রাজী হলো।

সেই থেকে সেজমাসীর বাড়ীতে খুব ভালই রইল ফুলটুসি—এখন সে 'ফুল্লরা রায়'। মাসীর মেয়ে যখন লেখে শর্মিলা রায় তা দেখে সেও শিখলো। মাসী হেসে বললেন বেশ হয়েছে। সকলেরই মনের মত হয়েছে ফুলটুসি—সকলে ভালবাসে। মাসী বলেন : তুই লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ইস্কুলে চাকরী করবি—তাহলে মার আর কষ্ট করতে হবে না। বাবা তো কিছু পারলো না। ভাল করে মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে নে।

ইস্কুলে যাচ্ছে। বাড়ীতে সে ভালই আছে কিন্তু কোথায় যেন তার সঙ্গে শর্মিলা ভাইবোনদের একটু তফাৎ আছে সেটা মনে মনে বুঝতে পারে মাঝে মাঝে ফুলটুসি। নতুন কেউ বাড়ীতে এলে তার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে মাসী বলেন : ও আমার পুষ্যি। কিন্তু পরে চাপা কণ্ঠে কি যেন একটু বলাবলি হয়। ইস্কুলেও শুনেছে, ইভিংসের দিদি বলছেন ফুল্লরা খুব মেধাবী। একবার বললে আর বলতে হয় না। তবুও খুব বেশী নাকি পড়বার সময় পায় না। অনেক কাজ করতে হয়।

—কেন? পড়াশুনো করে তো কাজ—মা কেন দেখে না?

—না ওতো শর্মিলা রায়দের বাড়ীতে থাকে—বলে মুখ ফিরিয়ে নিচু সুরে কি যেন বলেন দিদিরা।

কান দু'টো লাল হয়ে ওঠে ফুলটুসির। পড়াশুনো, খেলাধূলায়, আঁকা, সেলাই সব তাতেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ঐ চাপাসুরের কথা শুনলেই আগে তার সহ্য করতো একন রাগ এসে যায়। কেন কি করেছে সে? পরিশ্রম দিয়ে সে ও বাড়ীতে আছে, মাসীরা সবাই খুব ভালবাসে কিন্তু তাই বলে ঐ চাপা সুরে কি কথা? কোন পরিচয়? মাকে কাজ করতে হয় বলে? মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ আক্রোশে সে দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে—তখন তার রাগ প্রকাশ পায়। 'বাড়ী চলে যাবো' ও শোনা যায়। মাসী স্নেহের সুরে বলেন : ক্ষ্যাপামী করিসনি ফুলটুসি। যা হাতের কাজ সেরে নিয়ে ইস্কুলের জন্য তৈরী হয়ে পড়।

এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে।

কিন্তু ফুলটুসি যে কি রকম উপকারী সে আরো বোঝা যায়—বাড়ীতে ঠিকে ঝি না এলে। ফুলটুসি বলে : কিছু ভেবো না মাসী। দেখো আমি মেজে দিচ্ছি।

অবলীলাক্রমে ডাঁই বাসন অল্পক্ষণের মধ্যে সোনারমত ঝকঝকে করে তোলে। তারপর হাত পা ধুয়ে ইস্কুল চলে যায়।
বাসনমাজা কাজটা যত সহজ তত সুন্দর করে করতে পারে এরজন্য তার মনে কিছুই হয় না। তারপর আবার সেজেগুজে জলের বোতল ঝুলিয়ে ইস্কুলে যায় আসে। টুকিটাকি কাজ সারে।

বর্ষাবাদলে ঝি কামাই, বুঝবার জানবার আগেই সেকাজ শেষ করে রাখে সে। মেশো একদিন বললেন : কি করো, তোমরা। শর্মিলার বয়সী একটি মেয়েকে দিয়ে পাহাড় পর্বত বাসন মাজাও?

মাসী বলেন : আমরা বলবার আগেই তো শেষ করে কি করবো?

বিরক্ত মুখে চলে যেতে যেতে মেসো বলেন : একটা বাচ্চা মেয়ে, পারো নাকি নিজের মেয়ে এর আধখানা কাজও দিতে। কিন্তু বাসন মাজার কাজটাকে সে বেশ বীরত্ব ব্যঞ্জক বলেই মনে করে। আত্মপ্রসাদ লাভ করে তার মত সোনার বর্ণ কেউ করতে পারে না—বিশেষ করে বাসন মাজার মোক্ষদা পর্যন্ত নয়।

অষ্টম শ্রেণীতে উঠে পড়লো ফুলটুসি যেন লাফ দিয়ে। এমনি করেই চলছিল—বেশ বড় হয়ে পড়েছে। দু'টো জামা না গায়ে দিলে খারাপ দেখায়। সুন্দর মেয়ে আরো সুন্দরী হয়ে উঠছে। সকলেই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকায়—।

কিন্তু তার যাবার পরোয়ানা এলো অন্যভাবে। এতদিন যেন সবাইকে ভুলেছিল সে, সুখ আর প্রাচুর্য্যের মধ্যে অর্ধাহারে থাকা ভাইবোনদের। মা'র শুকনো মুখ কিছু তো মনকে নাড়া দিতে পারতো না। মাঝে মাঝে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে ওকে দেখা করতে পাঠাতেন। তাকে দেখলে ভাইবোনরা ভীড় করে এসে দাঁড়াতো। সেজেগুজে রিবন বাঁধা, ঝকঝকে জুতো পরা দিদিকে নিজের ভাবতেও যেন তাদের আড়ষ্ট লাগে। মা সব

দেখে খুসী হয়ে ভাবে মেয়েটি সুখে আছে। যদি মানুষ হয়ে ওঠে। এদের তো দৈন্যের দশা।

মার মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবান্তর হয় ফুলটুসির দিদি সে ক্ষণিকের জন্য। একটু পরেই ফিরে আসতে চায়। এই ঘরে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ময়লা জামা পরা ভাইবোনরা বাস রাস্তা পর্যন্ত দিদির পিছু নেয়।

কিন্তু একদিন বিস্ফোরণ হলো।

শর্মিলার সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়তো ফুলটুসি। সেদিন যে পড়া দিতে পারলো না শর্মিলা। সে অনায়াসে তার উত্তর দিয়ে দিল। 'কি যে পড় তুমি শর্মিলা।' কিছুই পারো না, কি কর, সিনেমা দেখ কেবল—না হিন্দি গানের তালিম নাও। ওর কাছে বসে এক সঙ্গে পড়া করলেও তো পারো? যেটা না পারবে সেটা ও বলে দেবে' অনিমাদি বললেন।

অসহিষ্ণু হয়ে শর্মিলা বললে: ওর কাছে? ওতো আমাদের বাড়ীতে থাকে—ও তো—

—থাকলেই বা তোমাদের বাড়ী, মানুষকে কোথাও না কোথাও থাকতে হবেই—তাতে পড়াশুনার সঙ্গে কি আছে।

বাড়ী ফিরে শর্মিলা চীৎকার করতে লাগলো: ওমা, তোমার সখের ঝি ফুলটুসি—

—শর্মিলা। রেগে উঠলেন মাসী—বলছি খবরদার এই ধরণের কথা বলবে না।

ক্ষিপ্ত হয়ে শর্মিলা বললে: বলবো না কি। একশো বার বলবো, ওর মা তো মাসীর বাড়ী বাসন মাজে ওতো ঝি—

মেয়ের গালের উপর ঠাস করে চড় কসালেন মাসী—এইসব শিক্ষা দীক্ষা তোমার হায়ছে? কাল থেকে ইস্কুল বন্ধ অভব্য, অসভ্য কোথাকার।

তখনকার মত থামলেও সারা বাড়ীর চেহারা যেন পালটে গেল। সন্ধ্যাবেলা টুকিটুকি বললে: মা ফুলটুসিদি ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে বসে আছে—ও আজ সারাদিন খায়নি।

—ডাক ফুলটুসিকে।

ফুলটুসি এসে চুপ করে দাঁড়ালো।

—কি হয়েছে খাসনি কেন?

—মাসী! আমি বাড়ী যাবো! মার জন্যে মন কেমন করছে।

—সে কিরে? ইস্কুলে এত ভাল হয়েছিস—এখন কি যায়, পরীক্ষা দিয়ে যাস।

—না মাসী, মন কেমন করছে।

ফুলটুসি জেদ করে চলে গেলো। মাসী অনেক জিনিস দিচ্ছিলেন—কিছু নিলো না সে। কেবল নিজের কাপড় চোপড়। বইখাতা নিয়ে চলে গেল। মাসী বললেন: ক'দিন থেকে আবার আসিস ফুলটুসি।

একটু হাসলো সে।

ভাইবোনেরা ছুটে এলো 'দিদি এসেছে।'

মা বললে: এমন অসময়ে?

—তোমাকে ছুটি দিতে এলাম মা। আমি বড় হয়েছি এখন সব কাজ আমি করবো তুমি ঘরে বসে রান্না করবে।

অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালো।

ছোট একটা স্কুলে ফুলটুসি কাজ পেয়েছে।

কিন্তু সকালে বিকেলে জলের ধারে বসে বাসন মাজতে মাজতে ভাবে—এখনি তাকে তৈরী হতে হবে। ভাইবোনেরাও স্কুলে যাবে স্কুল থেকে আসবে।

রক্তশূন্য মায়ের শুকনো মুখটা মনে পড়ে যায়—'মা তুমি ঘর থেকে বেরোবে না বলে দিচ্ছি।' তারপর কাজে চলে যায়—কোন আসা পিছন দিকের চিন্তাকে দূরে ঠেলে রাখে।

জায়ে-জায়ে

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে স্নান করবার জন্যে নীচে নেমে বাথরুমের চৌবাচ্চার পানে তাকিয়েই শ্রীলতার সর্ব্ব শরীর রাগে জ্বলে উঠলো।

উচ্চকণ্ঠে সে নীচের ঝি খুকীর মাকে ডাকলে—খুকীর মা সাড়ে নটা বেজে গেল, চৌবাচ্চার জল খোলা হয়নি কেন?

খুকীর মা উঠানে বসে বাসন মাজছিল। শ্রীলতার ডাক শুনে শশব্যস্তে উঠে এসে বললে—সেকি মা? কোন ভোরে উঠে কল খুলে দিয়েছি, এতক্ষণ তো ভরে যাবার কথা।

শ্রীলতা বললে—ভোরে যদি কল খুলেছো তবে চৌবাচ্চায় জল নেই কেন?

এবার খুকীর মা আমতা আমতা কোরে বললে—দিদিমনিরা চান করতে এসেছিলেন। সেই সময় বোধহয় কল বন্ধ কোরে গেছেন...

শুনেই শ্রীলতার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। জায়ের মেয়ে দুটি বুঝি ওকে পাগল কোরে দেবে। ওদের শয়তানী বুদ্ধির কাছে শ্রীলতা এখনও শিশু। এই তো সেদিন শ্রীলতার নতুন শাড়ীটা যখন শুখতে দিয়েছিল ছাতে, সেই সময় ফালা ফালা কোরে ছিঁড়ে রাখলে ওরা। লতা ওদের সে কথা বলতে দুই বোনে সমান তালে এমন ঝগড়া কোরলে। ওদের মা শুদ্ধ এসে ঝগড়ায় যোগ দিতে শ্রীলতা চুপ কোরে গেল।

আজো বুঝলে ওকে জব্দ করবার জন্যে শিখা রেখা কল বন্ধ করে গেছে। কিন্তু জব্দ কি একা শ্রীলতা হবে? এখনও বাড়ীর কারুর নাওয়া হয়নি, ওপরে জল তোলা বাকী। অস্থির পায়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার কোরে লতা বললে—শয়তানী কোরে যে কল বন্ধ করেছিস, গুষ্টিশুদ্ধ সকলের যে চান বাকী আছে সে খেয়াল আছে? ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন বিচ্ছু মেয়ে জীবনে দেখিনি।

ওপর থেকে মিহিসুরে শিখা বললে—অদেখা জিনিষ দেখতে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা মাসী। ওদের মা লীলাবতী বসে পান সাজছিলেন। লতার চিৎকার কানে যেতে মুচকে হেসে বললেন—মেজ গিন্নির মেজাজ চড়া কেন?

রেখা হেসে বললে চৌবাচ্চায় জল নেই, মাসী তাই দারুণ ক্ষেপে গেছে।

লীলাবতী হাসতে গিয়েও থেমে গিয়ে বললেন—ওরে আমাদের জল তোলা হয়েছে তো?

নিশ্চিন্ত মনে শিখা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে—আমাদের জল কোন সকালে তোলা হয়ে যায়।

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চাকর গোবিন্দ এসে বললে—মা চৌবাচ্চায় জল নেই, জল তুলবো কি করে। বাবুর চানের জল তো এখুনি চাই।

—সর্ব্বনাশ। এখনও জল তোলা হয়নি?

লীলাবতী আঁৎকে ওঠেন সেই সঙ্গে শিখা রেখারও মুখ শুকিয়ে যায়।

গোবিন্দ বিরক্তভাবে বললে—কি কোরে জল তুলবো? সবে এক বালতি তুলেছি বাবু বললেন এখুনি শ্যামবাজারে এই চিঠিটা দিয়ে আয়। ওখান থেকে তো এই ফিরছি জল তুলতে গিয়ে দেখি জল নেই।

লীলাবতী মিনতি জানিয়ে বলেন—ও বাবা গোবিন্দ উনি যে এখুনি চান কোরতে যাবেন। তুই ওঁর নাইবার জলটা তুলে দে বাবা। তারপর ভারিকে ডেকে রাস্তা থেকে জল তুলিয়ে ভরিয়ে রাখিস।

গোবিন্দ ভারি মুখে আচ্ছা বলে চলে গেল।

শিখার বাবা সুরেশনাথ আহারান্তে মুখ ধুচ্ছেন, কানে এল গোবিন্দ বলছে লীলাবতীকে। মা জলতোলা হয়ে গেছে টাকা দিন।

শুনে তার আর মুখ ধোয়া হোল না। ঘটি হাতেই বাইরে এসে লীলাবতীকে বললেন, ভারিকে দিয়ে জল তোলান হল কেন? বাড়ীতে কি যজ্ঞি হচ্ছে?

সুরেশনাথের বিদ্রুপে লীলাবতী সঙ্কুচিতভাবে বললেন—চৌবাচ্চায় জল নেই…।

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে সুরেশনাথ বলে উঠলেন—চৌবাচ্চায় জল থাকে না

কেন? বাড়ীতে এত লোক থাকতে, কল খুলতে কি বাইরে থেকে লোক আনতে হবে? যতসব অকর্মার ধাড়ী জুটেছে।

ধমক খেয়ে লীলাবতী কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে অসহায়ভাবে শিখার পানে তাকালেন। শ্রীলতাকে জব্দ করবার জন্য শিখা রেখাই কল বন্ধ কোরে দিয়ে এখন লীলাবতী যে জব্দ হচ্ছেন।

শিখার পানে তাকাতে দুজনের চোখে কিসের যেন ইংগিত খেলে গেল। পরমুহূর্তে লীলাবতী বলে ওঠেন জল কেন নেই সেকথা ওঘরে জিজ্ঞাসা কোরলেই তো ভাল হয়।

লীলাবতীর কথায় সুরেশনাথের ভ্রু কুচকে যায়—মানে! লীলাবতী জয়ের আনন্দ চেপে রেখে ভারিমুখে বললেন আমি আর মানেটা কি বোলবো? আমার কথাতো বিশ্বাস হয় না তোমার। এখুনি হয়তো বলবে তোমার মায়ের পেটের ভাইয়ের নামে লাগিয়ে আমি তোমাদের দুজনের ভেতর বিবাদ বাধাচ্ছি।

যদিও দেওর এবং বোন জায়ের নামে স্বামীর কাছে খুটিনাটি বিষয়ও জানাতে তিনি দ্বিধা করেন না এবং সুরেশনাথও বেশ মনোযোগ দিয়েই প্রতিটি কথা শুনে থাকেন ও ভুলেও কোনোদিন বলেননি তুমি আমার ভায়ের নামে লাগিয়ে বিবাদ ঘটাচ্ছো। তবু সময়মত কথাটা বলে ব্যাপারটা বেশ জোরদার কোরে তুললেন লীলাবতী।

সুরেশনাথ ও আর কোন প্রশ্ন না কোরে গম্ভীর মুখে হুঁ বলে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। গোবিন্দকে ডেকে বলে দিলেন—সরকার এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি।

লীলাবতী ও শ্রীলতা দুজনে মায়ের পেটের বোন এবং সুরেশনাথ ও শশীনাথ দুজনে সহোদর ভাই। কালের কুটিল চক্রে আজ ওরা ভুলে গেছে একই মায়ের পেটের ভাই। এবং একই মায়ের গর্ভের বোন দুজনে। এখন কেবল এক লক্ষ্য কি করলে অপর পক্ষকে জব্দ করা যায়। কূট বুদ্ধিতে সুরেশনাথ ও লীলাবতী অপর পক্ষকে সর্ব্বদা হারিয়ে থাকেন। তাছাড়া লীলাবতীর কন্যা দুটি বড় হওয়ায় ওদের দল ভারি হয়ে অপর পক্ষকে জব্দ করতে বেগ পেতে হয় না।

শশীনাথ শ্রীলতার ছেলে মেয়ে দুটি এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেবার মত বড় হয়ে ওঠেনি।

উপস্থিত দুই ভায়ের ভেতর বাড়ী ভাগাভাগি নিয়ে ঘোরতর রকম মনোমালিন্য চলছে। সবই মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু সিঁড়ি নিয়ে চলছে বাদানুবাদ। এক পক্ষের ভাগে সিড়িটা পড়ছে অপর পক্ষ সেটা ছাড়তে নারাজ সেই নিয়ে মত বিরোধ। ওদের একজন আত্মীয় অবশ্য একটি সুপরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন—সিড়িটা বেশ চওড়া আছে—মাঝখানে পাতলা ইট কিংবা য়্যাজবেষ্টার দিয়ে পার্টিশন কোরে নাও তাহলে দুজনেরই সুবিধে হবে।

তাঁর সুপরামর্শ এরা দুভাই এবং দুই বোনেরই মনোপুত হয়েছে। সিঁড়ির বাঁকের যে চওড়া জায়গা আছে একজনের ভাগে সেটা বেশীটা পড়ছে। সেই ভাগটা কার সেই নিয়েই এখন গোলযোগ চলছে। এমন সময় জল নিয়ে এই বিরোধ।

বিকেলে সুরেশনাথ সবেমাত্র চা পান শেষ করে মুখে পান দিয়ে সিগারেট হাতে বসেছেন এমন সময় সরকার বিপিনবাবু হাতে হাত ঘসতে ঘসতে সঙ্কুচিত পায়ে কক্ষে প্রবেশ করলে।

—আজ্ঞে আমাকে ডেকেছেন?

ওকে দেখেই সুরেশনাথের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। ভুরু কুঁচকে বললেন—সেই সকালে ডেকেছি, এখন তোমার আসবার অবকাশ হোল? বড় যে পায়াভারি হয়েছে দেখি। মেজবাবু কি আজকাল মোটারকম দিচ্ছেন নাকি?

—আজ্ঞে ওকথা কেন বলছেন? আপনাদের দুজনেরই মাইনে খাই, আমার কাছে আপনারা দুজনেই সমান মনিব। ভাড়া আদায় করবার জন্যে খিদিরপুর গিয়েছিলুম এইমাত্র ওখান থেকে ফিরছি।

—ভাড়া আদায় হোল? সুরেশনাথ প্রশ্ন করেন।

সরকার মশাই পকেট থেকে ময়লা রুমাল বার কোরে গিঁঠ খুলতে খুলতে বললে—চৌধুরীর ভাড়া আদায় হয়েছে। শিবুরটা হোল না।

ব্যাটা সকাল থেকে বাড়ী নেই। এই আসে এই আসে করতে করতে দেরী হয়ে গেল। কাল আবার যাবো।

কথা বলতে বলতে রুমাল থেকে ময়লা দশটাকার নোট ৪ খানা ও কিছু খুচরো পয়সা বার কোরে টেবিলের ওপর রাখলে।

লোভাতুর নেত্রে টাকার দিকে তাকিয়ে সুরেশনাথ বললেন—তোমাকে ডেকেছি এই জন্যে যে রাত্রে যখন খাতায় হিসেব লিখবে শশীর নামে দু'টাকা খরচ লিখে রেখো।

শশীনাথ বারান্দায় ছিলেন সুরেশনাথের কথা কানে যেতে দরজার কাছে এসে সুরেশনাথকে প্রশ্ন করলেন—কেন ?

সুরেশনাথ অবহেলা ভরে বললেন—কেন আবার কি ?

শশীনাথ ভেতরে প্রবেশ করে বললেন—আমার নামে দুটাকা খরচ লেখানো হচ্ছে কেন ?

বিদ্রুপভরে সুরেশনাথ বলেন—তুমি কি আজকাল বাংলা ভাষাও ভুলে যাচ্ছো নাকি শশী ?

সুরেশনাথের কথায় শশীর মুখ রাগে আরক্ত হয়ে ওঠে, উঠলেও, শান্ত-ভাবে বললেন—কি বাবদ দুটাকা খরচ লেখানো হচ্ছে জানতে চাওয়াটা ভাষার ভুলের জন্য নয়, বরং সেটা বলতে না পারাটাই হয় ভাষার দারিদ্র্য।

জ্বলে উঠে সুরেশনাথ বললেন—অত বড় বড় কথা জানি না, কেন খরচ লেখানো হোল, কি বাবদ খরচ হোল, সেকথা তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই সঠিক উত্তর পাবে।

শশীনাথ বললেন—তুমি যখন খরচ লেখাচ্ছো তখন তোমারই তো বলতে পারা উচিত। এর জন্য আমার স্ত্রীকে ডাকবার প্রয়োজন কিসের ? সোজা কথায় জানতে চাইছি তুমিও সোজা ভাষায় উত্তর দাও, ব্যস মিটে গেল। এর ভেতর মেয়েদের আনা কেন ?

নরম কণ্ঠে সুরেশনাথ বললেন—যদি উত্তর না দিই—কি করবে তুমি ?

—করবার আর কি আছে ? উত্তর দেওয়া না দেওয়াটা তোমার ইচ্ছে।

টেবিলের ওপর এক চড় বসিয়ে সুরেশনাথ বললেন—একশো বার ইচ্ছে। তুমি কি উকিল—যে আমাকে জেরা কোরছো ?

শশীনাথ বললেন—উকিল না হলেও, সম্পত্তি যখন একত্রে রয়েছে এবং তার অর্দ্ধেকের অধিকারী আমি তখন আমি হিসেব নেবোই।

—কি এত বড় কথা! হিসেব আমি দেবো না, কি করতে পারিস তুই। যা পারিস করগে যা।

শশীনাথ ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে তাচ্ছিল্যভরে বললেন—বেশ দিও না? কিন্তু শুনে রাখো টাকাও আমি দেবো না।

সুরেশনাথ রাগে দাঁত কড়মড় কোরে বললেন—এত বড় স্পর্দ্ধা তোর; বড় ভায়ের মুখের ওপর কথা বলিস।

শশীনাথ বললেন—সম্পত্তি নিয়ে যেখানে ভাগাভাগি, নিজেদের স্বার্থ নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কোন প্রশ্ন আসে না।

—বটে! এত বড় কথা? বলেই সুরেশনাথ প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলেন শশীনাথের গালে।

অপমানিত শশীনাথ সুরেশনাথের হাত নিজের বলিষ্ঠ মুষ্টিতে চেপে ধরে গর্জ্জন কোরে উঠলেন—গায়ে হাত তুললে কেন? যে হাতে মারলে সেই হাত মুচড়ে ভেঙে দিতে পারি জানো তুমি?

বিপুলতায় সুরেশনাথ শশীনাথকে পরাস্ত করলেও শক্তিতে পারলেন না। তিনি অতঃপর কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠেন—ওগো শশী যে আমাকে মেরে ফেললে।

লীলাবতী সকন্যা ততক্ষণে রঙ্গমঞ্চের দর্শক ছিলেন। এবার ভূমিকায় অবতীর্ণা হলেন।

তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন—কে কোথায় আছো রক্ষা করো আমাদের গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাও। ওরে গোবিন্দ শিগ্‌গির পুলিশ ডাক। হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যাক।

লীলাবতীর চিৎকারে আশ-পাশের বাড়ী থেকে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন।

পাড়ার প্রধান ব্যক্তি শীতলবাবু সকলেরই দাদু।

তাকে সামনে দেখে সুরেশনাথ প্রায় কেঁদে বলে উঠেন—দেখুন দাদু; হাতটার কি অবস্থা করেছে।

শীতলবাবু বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা। বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন—কি হয়েছে হাতে?

লীলাবতী আর চুপ থাকতে না পেরে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বললেন—বড় ভাইকে মেরে একেবারে পিষে দিয়েছে দাদু। আপনারা এখনই এর একটা বিহিতি করুন।

শীতলবাবু সুরেশনাথের মেদবহুল দেহখানার পানে তাকিয়ে লীলাবতীর কথাটা কতখানি বিশ্বাস করলেন বলা শক্ত। শশীনাথকে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে শশী?

শশীনাথ এতক্ষণ হতবুদ্ধি প্রায় হয়েছিলেন। সম্বিৎ পেয়ে বললেন—এমন কিছু ব্যাপার নয় দাদু। একটা খরচের কথা জানতে চাওয়ায় সামান্য তর্কাতর্কি। তারপরই দাদা আমাকে চড় মারলেন গালে, তাই আমি ওঁর হাতটা চেপে ধরেছি শুধু। তাতেই এমন সব চিৎকার সুরু করলেন।

কথাটা অসমাপ্ত হলেও বুঝতে কারুর অসুবিধে হোল না। সুরেশনাথ মুখ ভেংচে বললে—কচি খোকা! শুধু হাত চেপে ধরেছেন! এই দেখুন দাদু, হাতটার অবস্থা। আমি কিন্তু সহজে ছাড়বো না, থানায় ডায়েরী করে আসছি—আপনাদের সকলকে সাক্ষী দিতে হবে।

সাক্ষী দেওয়ার কথায় শীতলবাবু বললেন—আহা সুরেশ, ওসব বাজে ঝামেলার কাজ কি! ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয়েছে, মিটিয়ে ফেলো। থানা পুলিশ আইন আদালত মিথ্যে ওসব কোরে লাভ কি? কেবল ঘরের টাকা খরচ বইতো নয়। তাছাড়া এসব কেসে ডায়েরী করা চলবে কিনা বলা শক্ত।

সুরেশনাথ গোঁ ভরে বলেন—না দাদু ও অনুরোধ কোরবেন না।

শীতলবাবু বললেন—আমার ভাই বয়েস হয়েছে। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কি বলতে কি বোলবো তার কিছু ঠিক নেই। শেষে কি তোমাকে ফ্যাসাদে ফেলবো? আমাকে আর ওসবের ভেতর টেনো না।

শীতলবাবুর সঙ্গে পাড়ার সকলেই প্রস্থান করার পর শ্রীলতা এসে বলল—কেমন হোল? ঘরের কেলেঙ্কারী পাড়ার লোকে জেনে গেল। তাতে বোধহয় মান বাড়লো, সেই সঙ্গে বাহাদুরীও।

লীলাবতী ঝঙ্কার দিয়ে বলেন—পাড়ার লোকের ঘরের কেলেঙ্কারী

জানতে বড় বাকী আছে কিনা। একজন যে ঘরে চড়াও হয়ে বড় ভাইকে মেরে গেল সেটা কারুর চোখে পোড়লো না? এখন যে বলতে এসেছিস তখন স্বামীকে সামলাতে আসতে পারিস নি?

—মারছিল? সত্যি নাকি?

অবজ্ঞা-ভরে বলে শ্রীলতা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শিখা বললে—ঠিক যেন থিয়েটারে অভিনয় করে গেল মাসী। সত্যিকার স্টেজে কোরলে অনেক হাততালি পেতো।

লীলাবতী বললে—এখন সময় পেয়েছে করে নিক মা। যখন এমনি হবে তখন থিয়েটার করার সখ মিটবে।

হাতদুটি একত্র কোরে হাতকড়া লাগাবার ইংগিত কোরলে লীলাবতী।

সুরেশনাথ পাঞ্জাবীটা টেনে মাথায় গলাতে গলাতে বললেন—সখ মেটাচ্ছি। অনধিকার প্রবেশ আর মারপিট এই দুটো বিষয়ে ডায়েরী করিয়ে আসি। তারপর কি হয় বসে বসে তাই দেখো। ওকে কোর্টঘর করিয়ে তবে আমার প্রাণে শান্তি হবে।

তিনি থানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।
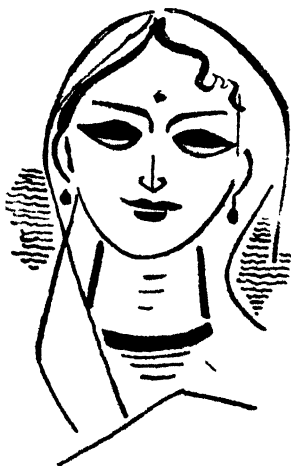
কেয়া কাঁদে

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যান্‌ভাসের উপর থেকে তুলিটা সরিয়ে জানলা দিয়ে একবার নীচের দিকে তাকাল কেয়া। লনের উপর দিয়ে তার দৃষ্টি গিয়ে থামল একেবারে গেটের কাছে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই! সেই ডাক্তার মহিলাকে একেবারে সঙ্গে কোরেই এসেছে বাবা। মুহূর্তের মধ্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল কেয়ার। মা মারা যাবার পর থেকে বাবার এই ডাক্তারনীটির প্রতি বেশী বেশী উৎসাহ আর বেশী বেশী মনোযোগটা কেয়ার সারা দেহমনে দিনরাত আগুন ধরিয়ে রাখে।

তবে একটা কথা অস্বীকার করতে পারি না—ঠোঁটের ফাঁকে রংএর তুলির পিছন দিকটা গুঁজে দিয়ে বেশ ধীর মাথায় চিন্তা করল কেয়া—অদ্ভুত গুণ আর যোগ্যতা ওই ডাক্তারনী মাসির—মা ত তাকে মাসিই বলতে শিখিয়েছিল—হ্যাঁ তাই আমি বলছি—নয়ত আমার ভারী বয়েই গেছে ওই উড়ে এসে জুড়ে বসা—বাবার সমস্ত মনপ্রাণকে দখল কোরে নেওয়া মহিলাকে আদর কোরে মাসি বলে ডাকতে।

বাবাটা যেন কি! দিনরাত বাইরে বাইরে ডাক্তার মাসিকে নিয়ে ত ঘুরছেই—আবার বাড়াতে সঙ্গে কোরে রোজ নিয়ে আসা চাই। কেয়া যে তার এই তরুণ বয়সে—মাত্র বারো বছর বয়সে মাকে হারাল, সেদিকে কোনই নজর নেই—কোনও দুশ্চিন্তা নেই। ওর বেশ মনে আছে মা যেদিন ওদের ছেড়ে চলে গেল—বাবা জোর করে চোখের জল চেপে রেখেছিল। কেয়া সত্যিই দেখেছিল বাবা জানলার ধারে গিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের কোরে চশ্‌মাটা খুলে প্রথমে চোখ দুটো পরে চশ্‌মার কাচ দুটো মুছে নিয়েছিল। তারপর—তারপর কেয়ার কান্নাভরা শরীরটাকে দু'হাতে বুকের

মধ্যে টেনে নিয়ে কত যে আদর করল, চুমো দিল—আর বলল—ছিঃ, মা, কেঁদনা—মা বড় কষ্ট পাচ্ছিল, ভগবানের রাজ্যে গিয়ে কত শান্তি পেলেন বল ত। সেখানে সব অসুখ সেরে যায়—সবাই ভাল হয়ে গিয়ে সুখে থাকে। তুমি এখন বড় হয়েছ—স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ছ—তোমার কি বাচ্চা মেয়েদের মত কান্না সাজে? বুঝতে শেখ মামনি। মা গেছে—আমি ত তোমার কাছে সব সময়ে থাকব এখন।

কেয়া জোর কোরে সেদিন নিজেকে সংযত কোরেছিল। শক্ত কোরে চোখের জল ধরে রেখেছিল। ওর যেন মনে হয়েছিল —বাবার কষ্ট ওর চেয়ে ঢের বেশী হচ্ছে—তবু বাবা কেমন নিজের বুকের কষ্ট চেপে রেখে সকলকে আপ্যায়ন করছে—কাজ করিয়ে নিচ্ছে সবাইকে দিয়ে। একটুও দিশেহারা হয়ে পড়েনি কেয়ার মত। কেয়া'ত দেখেছে বাবা কিভাবে দিন-রাত মায়ের মাথার ধারে বসে থাকত যতক্ষণ বাড়ীতে থাকত।

মাকেই বরং বলতে শুনত—কেয়া, মামনি, বাবাকে উঠিয়ে নিয়ে যাও। বেয়ারাকে বল স্নানের গরম জল দিতে। বাবুর্চিকে বল আবার খাবার দিতে। আর হ্যাঁ, শোন মামনি—সেই চিকেন রোষ্ট্‌টা কে করেছিল আজ—কালকে যে আমি বলে দিয়েছিলাম উপেনকে—তুমি একটু রান্নাঘরে গিয়ে খোঁজ নাও তো মা—

আঃ—থামো ত মালা, কি হচ্ছে এ-সব? আমার খাবার চিন্তা তোমাকে আর করতে হবে না—সবাই ঠিক ঠিক করবে। তুমি এখন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করো ত।

মা বাবার হাত দুটো ধরে কাতর কণ্ঠে বলত—ওগো দেখো, কেয়া বড় হচ্ছে—ওকে তুমি একলা রেখো না। ও আমার বড় অভিমানী মেয়ে। বুকটা ভেঙ্গে গেলেও ও মেয়ে মুখে কিচ্ছুটি বলবে না। অমন চাপা স্বভাবের মেয়েকে তুমি কাছে কাছে রেখো—আমার বড় ভয় হয়।

কেন, ভয় কিসের, বল ত;—বাবা জিজ্ঞেস করত।

উত্তরে মা বলেছে—তুমি জানো না—ওর মনে আঘাত লাগলে ও একটু প্রকাশ করবে না— একেবারে সহ্য করে করে শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আমারই স্বভাব পেয়েছে মেয়ে।

কেয়া বুঝতেই পারে না মা কেন অসময়ে তাদের ছেড়ে চলে গেল—মা যে ভারী মিষ্টি স্বভাবের—শান্ত স্বভাবের ছিল। কোনদিন কেয়াকে কিছু বলত না—অন্যায় কাজ করলেও না। কেয়া অবশ্য মোটেই অন্যায় কাজ করত না। বাড়ীর লোকজনদেরও মা কোনও দিন বকাবকি করত না। বাবা যে দিনের পর দিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে—রাতের পর রাত বাড়ীতেই ফেরেনি। রোজ রোজ মায়ের তৈরী কত যত্ন কোরে দেওয়া সাজানো খাবার-দাবার যেমন, তেমনি পড়ে থেকেছে—ব্যর্থ হয়েছে মার উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা। তাতেও মা বাবাকে কখনও প্রশ্ন করে বিরক্ত করেনি—অনুযোগ করেনি। নীরবে নিজের দুঃখ একলা সহ্য করেছে।

আর সেই জন্যই বাবার সঙ্গে কেয়ার সম্পর্কটা ছিল যেন একটু দূর-দূর—কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া। তিনদিন পরে বাড়ীতে ফিরে বাবা মায়ের দেওয়া খাবার মুখে তুলে দিতে দিতে প্রশ্ন করেছে—কেয়া কোথায়? তাকে যে দেখছি না?

মা কথার জবাব দেয়নি—"কেয়া, কেয়া" করে উঠেছে—উঠে এস মা মনি—তোমার বাবা এসেছে—তোমাকে ডাকছে—শুনে যাও।

দুর্জয় অভিমানে, কেন জানি না কেয়া তখন রংএর তুলি বুলিয়ে চলেছে কাগজ বা ক্যানভাসের উপর। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পাছে কোনও শব্দ বা আর্তনাদ বেরিয়ে পড়ে—তার জন্য জোর কোরে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে। উঠে যাওয়া দূরের কথা একচুলও নড়েনি নিজের জায়গা ছেড়ে। পাশের ঘরে বসে বসে শুনেছে বাবা বলেছে—মেয়েটা কেমন যেন একটা আন্‌ন্যাচার্‌ল্—এ্যবনর্ম্যাল, ধরণের হয়ে উঠছে। ওকে ভাবছি একজন ভাল ডাক্তার দেখাব—

চুপ করো ত—এতক্ষণে মা চীৎকারে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে—লজ্জা করল না ডাক্তার দেখাব বলতে? তোমার যে একটা সন্তান আছে—একটা সুন্দর সুস্থ ফুলের মত মেয়ে আছে—সে কথা কি তুমি জানো না মানো? কি সম্পর্ক রেখেছ তুমি বাড়ীর সঙ্গে। স্ত্রীকে ছেঁটে ফেলতে পারা যায় পুরনো জুতোর মত —কিন্তু নিজের মেয়ে? তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্কটাও কি তুমি এবার অস্বীকার করবে? ছিঃ ছিঃ তোমার যা ব্যবহার—আমার মতই সহ্য করছে তোমার ওই একরত্তি মেয়ে। তোমাকে ও এই আট বছর

বয়সেও ভাল কোরে চিনতেই পারল না। তুমি ডাকলে কেন ও এসে দাঁড়াবে? কেনই বা তোমাকে বাবা বলে মানবে? এ সংসারে টাকা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর তোমার কি দেখবার আছে জানবার আছে? আমাদের কপাল মন্দ তাই তোমার অবহেলার দান মুখে তুলে বেঁচে রয়েছি। তবে দেখো, ভগবান একদিন এই অভাগীর ডাক নিশ্চয় শুনবেন। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার একদিন তিনি নিশ্চয় করবেন।

আরও—আরও অনেক কথাই মাকে সেদিন বলতে শুনেছিল কেয়া। ও একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল পাশের ঘরে বসে বসে। যে মাকে জীবনে কখনও রাগতে দেখেনি—সেই মা'ই অনর্গল চেঁচামেচি কোরে বাড়ী মাথায় কোরেছিল। বাবা অবশ্য তারপর আর একটি কথাও বলেনি। কেয়ার ধারণা বাবা যেন মায়ের সমস্ত অভিযোগ অনুযোগ মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল। সেই একটা দিনই কেবল মাকে ক্ষিপ্ত হতে দেখেছিল। তারপর আরও তিনচার বছর পার হয়ে গিয়েছিল—মা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর তারপর থেকে ত ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মা শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল—বিছানার সঙ্গে দিনে দিনে একেবারে মিশে গিয়েছিল। ক'লকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত নামকরা ডাক্তাররা হার মেনে গিয়েছিল। শেষ কালে হঠাৎ একদিন এসেছিল—মায়ের ছোট বেলার বন্ধু—এই ডাক্তার মাসি। বাবার সঙ্গেই হঠাৎ ওদের বাড়ী এসে উপস্থিত হয়েছিল।—

দেখ, কাকে নিয়ে এলাম ধরে বাবার কথা শুনে মা শীর্ণ মাথাটি ঘুরিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর মা'র চোখের কোল বেয়ে জলের দুটি ধারা নেমে এল। বাবার হাসিমুখটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তবু বাবা একটু মলিন হেসে বলেছিল—মালা তোমার বন্ধু এখন যে মস্তবড় ডাক্তার—এতদিন বিদেশে ছিল। হঠাৎ নিউমার্কেটে দেখা হয়ে গেল। ধরে নিয়ে এলাম। আমি কিন্তু দেখেই ঠিক চিনেছি—সেই বিয়ের সময় মাত্র দুদিন দেখেছিলাম—এত বছর হয়ে গেল—ঠিক ধরতে পারিনি? বলুন ত?

মীরা মাসীও ম্লান হেসে মায়ের পাশে বসে পড়ে হাত দুটো ধরে নিজের রুমাল দিয়ে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিল। সজল চোখে আশ্বাস দিয়েছিল—কাঁদিস্ না মালা, আমি ঠিক তোকে সারিয়ে তুলব।

এতক্ষণে মা মাথা নেড়েছিল সজোরে। ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠেছিল—চাইনে। —আমি আর সারব না রে। তুই আমার এই মেয়েটাকে দেখিস্ ভাই।

নিশ্চয়—হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়ানো কেয়াকে কোলের কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন তিনি—বাঃ, কি সুন্দর মেয়েরে তোর—ঠিক তোর ছেলেবেলার জুড়ি।

সে সমস্ত কথা যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে কেয়ার। কোথায় গেল সেই দিনটির প্রতিশ্রুতিভরা আনন্দের কথাগুলো। ধীরে ধীরে মাকে সারিয়ে তোলার বদলে মীরা মাসী কেমন কোরে যেন মাকে এড়িয়ে চলেছিল। মায়ের ওষুধপত্র দেওয়া ও দেখাশোনার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা বাবার ঘরে বাবার বিছানায়—বাবার সঙ্গে শুয়ে বসে হালকা হাসি গল্পে সময় কাটাত। বাবার বাইরে যাওয়া কমে গেল—বাবা যেন মীরা মাসীর আঁচলের ছায়াকেই আশ্রয় কোরেছিল।

কেয়ার অবস্থার কিন্তু কোনই রদবদল হয়নি। কেয়া নিজেকে মায়ের কাছে কাছে রেখে দিত—পড়ার সময়টা বাদ দিয়ে বাকি সময়টা মায়ের বিছানার পাশে বসে তুলি বুলোত কাগজের গায়ে। মায়ের ছবি আঁকবার চেষ্টা করত। ওটাই ছিল ওর ছেলেবেলার একমাত্র সখ—ছবি আঁকার হাতটিও চমৎকার। মুখে ওর কথা ছিল না। মায়ের সঙ্গে দুটো চারটে কথা ছাড়া কেউই তার মুখ থেকে কিছু শুনতে পেত না। দৈবাৎ বাবা ডাকলে—নিজেকে একেবারে গুটিয়ে রাখত কেয়া। প্রথম প্রথম ডাক্তার মাসিকে বেশ ভালই লাগত। মনে হত মাসির ওষুধ খেয়ে মা ভাল না হলেও—মাসির সঙ্গে মিলে মিশে বাবাই বেশী ভাল হয়ে উঠেছে। বাবা ইদানীং মায়ের বিছানার ধারটি ছেড়ে নড়ত না। বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতেই থাকত। রাতে বাড়ীর বাইরে যাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। তাই মীরা মাসিকে কেয়ার খুব ভাল লাগত। বাবাকে যেন কি দিয়ে গুণ কোরে ছিল মীরা মাসি।

কিন্তু এখন?

এখন তেমনি বিষিয়ে গেছে সারা মন। সেই যে সেদিন বাবার ঘরে হঠাৎ দুপুর বেলা স্কেলটা আনবার জন্য ঢুকে পড়তেই কেয়ার বুকের মধ্যে যেন ঢিপ ঢিপ কোরে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো দৃশ্যটা দেখেই। ডাক্তার মাসিকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বাবা আদর করছেন ঠিক মা যেমন কোরে কেয়াকে চুমো দিয়ে ভরিয়ে দিতো ছোট্ট বেলাতে।

আশ্চর্য—ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে একটা কি কাণ্ড ঘটে গেল। তার অবচেতন মনের মধ্যে বাবার জন্য যে ঘৃণার ভাবটা চাপা ছিল—সেটাই সক্রিয় হয়ে উঠল সচেতন মনের উপরে এসে। ছুটে এসে নিজের ঘরে সমস্ত আঁকার সাজ সরঞ্জাম ছড়িয়ে দিল টান মেরে। ছড়িয়ে দিল রঙের বাক্স আর তুলির গোছা। তারপর মায়ের পাশে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। দু'তিন ঘণ্টা আর মুখই তুলল না। হাজার চেষ্টা কোরেও মা ওকে নড়তে পারল না একটুও। কথা বলানো ত দূরের কথা—মুখটা খুলে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেল না সেদিন।

মায়ের প্রাণ। কেমন কোরে জানিনা—ঠিকই বুঝেছিল ব্যাপারটা। সেই রাত্তির থেকেই শমন তার পরওয়না নিয়ে ধর্না দিল মায়ের কাছে—তার তিন দিন পরে মা আস্তে আস্তে চিরদিনের জন্য চোখ বুজল।

সদ্য মাতৃহারা কেয়াকে মাসি আদর কোরতে এলে কেয়া শক্ত কাঠ হয়ে রইল। বাবা কাছে এলে প্রথমে কান্নায় ভেঙে পড়ল—পরে সেই যে চোখ মুছল—আর কাঁদেনি কেয়া।

মা যে সত্যিই অনেক শান্তিই পেয়েছে—একথা কেয়ার—বাবা না বললেও —বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। যে আগুনে কেয়া জলছিল সেই আগুনেই ত বিছানাতে শুয়ে শুয়ে মা পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর মাস কয়েক কেটে গেছে। মায়ের উপদেশ অনুরোধ কিছুই বাবা মনে কোরে রাখেনি। বরং ডাক্তার মাসি এখন একেবারে 'মা' হয়েছে কেয়ার।

বাবা তিনমাসের মাথায় মীরা মাসীকে বিয়ে কোরে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী কোরে দিয়েছে। কেয়া যে কোনটিতে আশ্রয় নিয়েছিল—সেখানেই রয়ে গেছে—বাবা বা মাসী কেউই ওকে আর জ্বালাতন করেনি। কাছে টানবার চেষ্টাও করেনি আর।

কেয়া জানে মায়ের মত তারও অসুখ করবে—সেও মায়ের মতনই ধীরে ধীরে বিছানার সঙ্গে মিশে যাবে। জ্বলে জ্বলে অবশেষে ছাই হয়ে যাবে সেও সকলের চোখের আড়ালে। বাবা তার কোনও দিনই আর কাছের মানুষ হয়ে উঠবে না—একমাত্র মা-হারা মেয়েকে কোলে টেনে নেবে না। জীবনের তিক্ততা, ব্যর্থতা ও রিক্ততাকে এই বয়সে—মাত্র এই বারো বছর বয়সেই—কেয়া সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু এই শূন্যতা আর যে সহ্য হচ্ছে না তার। মায়ের মত তার ত ধৈর্য নেই—স্থৈর্য নেই। মা যে কয়েক বছর বেঁচেছিল—পাশে ছিল কেয়া—মায়ের নাড়ী-ছেঁড়া-ধন—জীবন সর্বস্ব। কিন্তু কেয়ার? তার কে আছে? কি আছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য? তার মৃত্যুশয্যায় পাশে কে বসে থাকবে বিনিদ্র চোখে। শূন্য শয্যায় শূন্য ঘরের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস পড়বে কেয়ার। না অত দেরি সইতে পারবে না সে। অতদিন সবুর করবার মত মনের জোর ত তার আর নেই।

গাড়ীটা গেটের মধ্যে প্রবেশ করল। কেয়া দেখল বাবা বাজারের ব্যাগটা হাতে করে হাসতে হাসতে তরুণ যুবকের মত চঞ্চল পায়ে নামল—পিছনে পিছনে কেয়ার মায়ের শৈশবের বন্ধু—রোগ শয্যার চিকিৎসক—বিদেশী চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তার মীরা ভৌমিক—কেয়ার জীবনের মঞ্চে যেন লৌহ যবনিকা।

বাবা ঘরে-মন বসাবার জন্য মনের মত সাথী পেয়ে গেছে—জেনে গেছে দুর্দিনের আশ্রয়—একাধারে ডাক্তার এবং সেবিকা—কিন্তু কেয়া? সে কি পেল? কেয়া হাত বাড়িয়ে মায়ের মৃত্যু শয্যার পাশ থেকে সবার অজ্ঞাতে

সরিয়ে রাখা ঘুমের ওষুধের শিশিটার মুখটা খুলে, একসঙ্গে সবগুলি বড়ি মুখের মধ্যে পুরে বেশ জোরে জোরে চিবিয়ে নিল তারপর ঢক্ ঢক্ করে বোতলের জলটুকু নিঃশেষ করে বিছানাতে গা এলিয়ে দিল।

এখনও খিল্ খিল্ হাসি আর ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে দোতলার সিঁড়িতে। না-ডাক্তার এ ঘরে ঢুকবে না—আসবে না কেয়ার বাবা। ওর এই ঝিমনো অর্ধচেতন অবস্থা দেখেও ওকে কেউই তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাবে না—এমার্জেন্সিতে নিয়ে গিয়ে কেউ ওর গলার মধ্যে রবারের নল চালিয়ে স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে তুলে ফেলবার চেষ্টা করবে না শেষটুকু।

কেয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রায় জুড়িয়ে যাবে খুব ধীরে ধীরে। শেষ হয়ে যাবে খুব নিঃশব্দে। পৃথিবীর যাত্রাপথের শেষ সীমানাটুকু পেরিয়ে কেয়া গিয়ে উঠবে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত ওই দিগন্তের পারে যেখানে ওর মা মণি দুটি ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে কেয়ার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে।

*　　*　　*　　*

"পাপের দ্বারা পাপের ক্ষয়, অন্যায়ের দ্বারা ন্যায় শাসন কখনো হইতে পারে না—তাহাতে পাপের ভার বৃদ্ধি পায় মাত্র।"

—স্বর্ণকুমারী দেবী

পূজা এসে গেছে

নীলিমা মুখোপাধ্যায়

সেদিন দুপুরে পাশের বাড়ীর বাসন্তীদি বেড়াতে এলেন।

আমি খেয়ে উঠে সবে দুটো পান সাজতে বসেছি, বাসন্তীদি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে থপ করে মাটীতেই বসে পড়লেন। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম—ওকি দিদি মাটীতে কেন? ফরসা কাপড় ময়লা হয়ে যাবে যে—এই নিন আসনে বসুন, কিম্বা চলুন শোবার ঘরে বিছানায় বসিগে দুজনে।

বাসন্তীদি তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট ওলটালেন—রাখ তোমার ফরসা কাপড়। আমি তো আজকালকার ছেলে মেয়ে নই যে আঁটো প্যান্ট আর চোস্ত চুড়িদার পরে কোচ সোফা না পেলে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। মাটীতে পা ছড়িয়ে বসার মত সুখ আছে?

আমি জর্দা মশলা দিয়ে মৌজ করে একটী পান সেজে বাসন্তীদির হাতে ধরিয়ে দিলুম—বললাম, আপনি খুব হাঁপিয়ে গেছেন। তবু তো আমার একতলা ফ্ল্যাট, সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়নি।

বাসন্তীদির মুখে পান ভর্ত্তি, সামলে বললেন, হাঁপাচ্ছি কি সাধে ভাই, পুজো যে এসে গেল! সকাল থেকে কি কম রপটানী যাচ্ছে।

আমি তো অবাক, বললুম, হ্যাঁ দিদি পুজো তো প্রত্যেক বছরই একবার করে আসে তাতে এত হাঁপানী কিসের?

বাসন্তীদি গালে হাত দিলেন—তুমি অবাক করলে অনিমা, কম হাঙ্গামা পোয়াতে হচ্ছে আমাকে? পর্বের পর পর্ব যাচ্ছে, প্রথম কেনাকাটা পর্ব। তারপর তৈরী করানো পর্ব তারপর ডেলিভারী নেওয়া পর্ব—বাবাঃ মোটা মানুষ ছুটোছুটী করে দমবন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছি। কর্ত্তাকে তো জান টাকা দিয়েই খালাস আর কিছুর মধ্যে নেই। বাসন্তীদি আর একটা পান মুখে পুরলেন।

তা সত্যি কথা, বাসন্তীদিরা বেশ বড়লোক। আমাদের মত চুনোপুঁটী নয় যে একখানা কাপড় কিনলুম আর পুজোর বাজার ফুরিয়ে গেল! আমি আর কি বলব চুপ করে রইলুম। বাসন্তীদিই আবার আরম্ভ করলেন—জান তো বড়মেয়ের সবে বিয়ে দিয়েছি। এই বছরই প্রথম পূজোর তত্ত্ব পাঠাতে হবে। বিয়ে হয়েছে আবার দক্ষিণ কলকাতার ফ্যাসানেবল পাড়ায়। মেয়ে বারবার করে সাবধান করছে, দেখো বাপু তোমাদের ওই সেকেলে ধ্যাবড়া চ্যাবড়া তাঁতের কাপড় চোপড় আমার ননদ বা শ্বাশুড়ীদের জন্য যেন পাঠিও না—তাহলে ভারী আমি লজ্জায় পড়ব। শ্বাশুড়ী, খুড়শ্বাশুড়ীকে টাঙ্গাইল অবশ্য দিতে পার। ননদ দুজনকে প্রিন্টেড শিফন কি জর্জেট যাই হোক দিও। তা তোমাদের আবার যা উত্তুরে পছন্দ ননদরা নাক সেঁটকাবে 'খন।

উত্তুরে পছন্দ কি দিদি? আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি!

এই যে আমারা উত্তর কলকাতার লোক তো—তাই আমাদের পছন্দ অপছন্দও নাকি উত্তুরে, দক্ষিণ দিকে চলে না। আমি মেয়েকে বললুম দরকার নেই বাবা, তুই একদিন সঙ্গে চল দেখেশুনে পছন্দ করে কিনবি। একদিন মেয়েকে নিয়ে গেলুম ভাই মার্কেটে। উঃ ঘুরতে ঘুরতে জান বেরিয়ে গেল। জামাইয়ের টেরিলিন সুটের কাপড়, মেয়ের নাইলন জর্জেট, ননদদের প্রিন্টেড শিফন, আমার মেজ মেয়ের প্রিন্টেড কোটা, ছোট মেয়ের আওরঙ্গাবাদী সব তো হল তারপর সেই সব শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচিং করা ব্লাউজ পীস কিনতে গিয়ে সে যে কি মহাভারত পর্ব সে আর তোমায় কি বলব—তাঁতের মাকুর মত একবার এদিক একবার সেদিক! শাড়ীর রঙের সঙ্গে ব্লাউজের কাপড় খোঁজা যে মেয়েব বিয়ের পাত্র খোঁজার চাইতেও ঝকমারীর কাজ তা ভাই আগে বুঝতে পারিনি। ঘণ্টাদুয়েক ঐরকম বনবন করে আমার তো জিব বেরিয়ে যাবার জোগাড়। বড় মেয়ে তখন আমাকে দোকানের ভেতর চেয়ারে বসিয়ে হাতে একটা ঠাণ্ডা সরবতের বোতল ধরিয়ে দিয়ে বল্লে 'তুমি এখানে বসে জিরোও মা আমি এবার আমার ননদদের জন্য লুঙ্গির পিস আর পাঞ্জাবীর কাপড় কিনে নিয়ে আসি—ওদের পুজোয় প্রেজেন্ট করব। আমি তো শুনে তাজ্জব হাত থেকে বোতল খসে পড়ে আর কি। হ্যাঁরে লুঙ্গি কিনবি কি!

পাঞ্জাবীর কাপড়। ওমা ওসব তো ছেলেরাই পরে বলে জানি! মেয়ে মানুষ লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরছে কস্মিনকালে শুনিনি তো। শুনে সেই এক হাট লোকের মধ্যে মেয়ে আমার খিলখিল করে হেসে গড়াগড়ি। তুমি মা এমন সেকেলে রয়ে গেলে! আজকাল লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরা দারুন ফ্যাসন, আমার শ্বশুর বাড়ীর পাড়ায় একবার গিয়ে দেখো না পাঞ্জাবী, চুড়িদার, প্যান্ট, সার্ট, কুর্ত্তা মেয়েরা কী না পরছে! ধুতিটাই শুধু চলে না।

আমি জিগেস করলুম—হ্যাঁরে তোর ননদরা লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরেই ঠাকুর দেখতে বেরুবে নাকি, মেয়ে বল্লে—বেরুতে দোষ কিছু নেই তবে আমরা পূজোর সময় কলকাতায় থাকলে তো! মার্কেটিংটা সারা হয়ে গেলেই আমরা সবাই রাণীক্ষেত, দেরাদুন, মুসৌরী কি নাইনীতাল যেখানে হয় বেড়াতে যাব। পূজোর সময় কলকাতা! বাবাঃ হরিবল।

বড়মেয়ের ওই কথা শুনে অবধি ভাই মেজ আর ছোট মেয়ে দুটোও বায়না ধরেছে মা চল আমরাও কোথাও বেরিয়ে পড়ি কলকাতায় আর থাকতে ভাল লাগছে না। কর্ত্তা বলেছিলেন দেশে চল না এবার। দেশে দুর্গাপূজা, কালীপূজা সবাই তো। হয় তা সে পাড়াগাঁয়ে ছেলে মেয়ে কেউ যেতে রাজী নয়।

একটানা বকে বকে মোটাসোটা বাসন্তীদি আবার হাঁপাচ্ছিলেন। আমি বললুম—দিদি, সত্যি আপনার বড্ড পরিশ্রম যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে একটু গড়িয়ে নিন, পাখাটা বাড়িয়ে দিই। এই নিন নরম বালিশটা। বাসন্তীদি খুব খুসী হলেন বললেন—তাই দাও ভাই অনিমা। তুমি আমায় নিজের বড়বোনের মত ভালবাস বলেই তোমার কাছে আসতে ভারী ভাল লাগে। বাড়ীতে এখন ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে বলে তোমার কাছে পালিয়ে এলুম।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—ধুন্ধুমার কাণ্ড আবার কিসের দিদি?

এই দেখ না আজ সকাল থেকে পোষাক তৈরীর হাঙ্গামায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। সেই অত কষ্টের কেনা ব্লাউজপিস আবার একদিন হুড়তে পুড়তে গিয়ে দোকানে তৈরী করতে দিয়ে এলুম। মেয়ে দুটোও হয়েছে তেমনি মা না হলে ওদের কোনও কাজ হবার নয়। কাল সেগুলো ডেলিভারী দেবার কথা ছিল। গেলুম আবার। তা বলে কিনা, দুঃখিত, আজ দিতে পারব না, কাল নেবেন।'

দোকান কোথায়? না সেই মার্কেটের কাছে। সেখানে রোজ যাওয়া যেন চাট্টিখানি কথা। এদিকে সকালে কর্ত্তা আপিসে যান গাড়ী পাওয়া যায় না, আর সন্ধ্যায় ভিড়ের চোটে পথে বেরোয় কার সাধ্য। কি করি! আজ সকালে কর্ত্তা স্নানের ঘরে ঢুকতেই ভাবলুম চট করে গাড়ীটা নিয়ে জামাগুলো নিয়ে আসি। চান সারতে ওর বেশ দেরী হয়। তাড়াহুড়ো করে তো কাজ সারলুম। ফিরে দেখি কর্ত্তা রেগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। তাঁর অফিসের দেরী হয়ে গেছে, চান করে খেয়ে নাকি আধঘন্টা বসে আছেন। চাকরকে ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়েছেন তা এ টাইমে কি ট্যাক্সি পাওয়া যায়। বুড়ো বয়সে তো মুখনাড়া খেয়ে মরলুম ভাই। আমি নাকি দিন দিন কচি খুকী হচ্ছি, বুদ্ধি বিবেচনা সব লোপ পাচ্ছে, জামা কাপড় জামা কাপড় করে ধেই ধেই নাচছি। এইসব যা মুখে এল বললেন। ওমা! তারপর আবার প্যাকেট খুলে মেয়েদের রাগ দেখে কে। দোকানে তো এখন অর্ডারের বন্যা—তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সব গোলমাল করে ফেলেছে। যে জামা হাতকাটা হবে তাকে হাতওলা করেছে, হাতওলা যার হবার কথা তার হাত করেনি, গলা যতটা বড় হবার তা হয়নি। মেজ মেয়ের শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচিং করা পিসগুলো ছোট মেয়ের গায়ের মাপে হয়েছে আর ছোটরগুলো মেজোর গায়ের মাপে। দুই বোন তো আমাকে যাচ্ছেতাই করলে বলে, জামা ডেলিভারী নেবার সময় চোখদুটো কি ব্যাগে পুরে রেখেছিলে? আচ্ছা বল তো ভাই তখন কি আমার এত দেখে নেবার সময় আছে? গাড়ী নিয়ে বাড়ী পৌঁছবার জন্য ছটফট করছি। তারপর মেয়েরা বলে ভাত খেয়ে এক্ষুণি ট্যাক্সি করে চল দোকানে, সব বদলাতে হবে। আমার ভাই বুক ধড়ফড় করছে, পালিয়ে এলুম তোমার কাছে।

বাসন্তীদি গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও পাশে একটু শোবার জোগাড় করতে করতে ভাবলুম—হায় মা দুর্গা! তুমি তো বছরে তিনটী দিনের জন্য এসেই আবার হুস করে গজে, দোলায়, নৌকো কি ঘোড়ায় যা হোক একটাতে চেপে বসবে। তার জন্য নিরীহ মানুষদের এত হায়রানী কেন মা?

কাঠচাঁপা

মায়া বসু

এই যে মিস চক্রবর্তী। টুলুকে পড়াতে এলেন বুঝি! এত তাড়াতাড়ি? শৈবালকে দ্রুতপদে গেটের দিকে আসতে দেখেই শান্তি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খুশীতে উজ্জ্বল চোখে মুখে অতি সাবধানে হালকা হাসির আভাস ফোটাল। যেটুকু হাসিতে সামনের উঁচু উঁচু দাঁত কটা বড় বেশী প্রকট হয়ে না পড়ে।

তাড়াতাড়ি না এলে যে শৈবালের দেখাই পাওয়া যায় না। তাই তো ছুটে ছুটে আসতে হয় এতটা পথ এত সকাল সকাল! ছাত্রীকে পড়ানোর নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই।

কিন্তু মুখে তো আর সেকথা বলা সম্ভব নয়। তাই হাসি মুখে শান্তি জবাব দিল, হ্যাঁ আজ একটু সকাল সকালই এলাম শৈবালবাবু। আমার ছাত্রীটি ছেলেমানুষ। সন্ধ্যে হলেই ওর ঘুম পায়। আপনি বুঝি প্রত্যেক দিন এমন সময়ে বেরিয়ে যান শৈবালবাবু? বেড়াতে?

শেষের কথাগুলো কানেই গেলনা। শান্তির প্রথম কথাটা শুনে শৈবাল উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল। ঘুম পায়? সন্ধ্যে হলেই টুলুর ঘুম পায়? তা বলেছেন কথাটা ঠিকই। পড়তে বসলেই ওর ঘুম পায়। কিন্তু যেই আপনি পড়ার ঘর ছেড়ে উঠে চলে যান, আপনার ছাত্রীটি কি করে জানেন?

দীর্ঘ দেহ সুদর্শন কান্তিমান তরুণের প্রাণপ্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ হাসির জোয়ারে যেন কেঁপে ওঠে শান্তি। ওর তৃষিত বিহ্বল বিমুগ্ধ দৃষ্টি পলকহীন স্থিরবদ্ধ হয়ে থাকে শৈবালের শরীরে, ওর সুন্দর মুখে, ওর নিভাঁজ নিখুঁত দামী সাহেবী পোষাক পরা স্মার্ট চেহারার দিকে। শৈবালের সঙ্গে কথা বলায়, ওর সান্নিধ্যে শান্তির প্রতিটি রোমকূপ যেন রোমাঞ্চিত কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

নিজের অজান্তেই শান্তি শৈবালের খুব কাছে এগিয়ে আসে। আবেশ ভরা মুগ্ধ দৃষ্টি ওর মুখের ওপর থেকে না সরিয়েই ও আবার প্রশ্ন করে। কোথায় যাচ্ছেন? বেড়াতে বুঝি? এমন সময়ে লেকে কি ময়দানে বেড়াতে আমার এত ভাল লাগে। মনে হয় সঙ্গি পেলে চলে যাই। একলা কি ভাল লাগে কোথাও যেতে?

শৈবালের শেষ কথাটা বুঝি ওর ও কান পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

শৈবাল কোন উত্তর দেবার আগেই যাকে নিয়ে কথা, সেই ছোট্ট মেয়েটা ঝলমলে স্কার্টে ঢেউ তুলে লাল রিবন বাঁধা গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়া চুল উড়িয়ে ওদের বাড়ির সামনের ফুল বাগানের একটা রঙিন প্রজাপতির মতই পাখামেলে যেন উড়ে এলো ওদের সামনে।

শান্তির হাত ধরে টানতে টানতে ভুরু কুঁচকে, ঘাড় বেঁকিয়ে ও দাদার মুখের দিকে তাকাল; তুমি নিশ্চয় দিদিমনির কাছে আমার নামে নিন্দে করছো দাদা। ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ! আমি বাবাকে বলে দেব।

'নিন্দে করছি? আমি? আমাদের বাড়ির মহারাণী শ্রীমতী টুলুরাণীর নামে নিন্দে করব, এত বড় বুকের পাটা আমার আছে? আচ্ছা মিস চক্রবর্তী, ভাল করে তাকিয়ে দেখুনতো, আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে?

আদরের ছোট্ট বোনটিকে আরো চটিয়ে দেবার জন্যে শৈবাল বাউ করার ভঙ্গিতে ওর শাম্পুকরা রুক্ষচুল ভর্তি মাথাটাকে শান্তির বুকের কাছাকাছি নুইয়ে ধরল।

তারপরই সোজা হয়ে টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর একচোট হেসে খোলা গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

টুলুর উপস্থিতি ভুলে গিয়ে মোহগ্রস্তের মত শান্তি সেই দিকে তাকিয়ে রইল। কি অপূর্ব গন্ধ শৈবালের মাথার চুলে, ওর সর্বাঙ্গে? ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই সেই উত্তেজক গন্ধে তিরিশ বছর পার হয়ে যাওয়া কুমারী শান্তির তৃষিত দেহ মন সেই গন্ধ স্বাদের জন্যে উন্মুখ—মাতাল হয়ে ওঠে।

আর শৈবালের ওই হাসিটা?

ধু-ধু রুক্ষ শান্তির দেহমনের অনন্ত মরুভূমিতে এ যেন এক উচ্ছ্বসিত শীতল ধারা বর্ষণ।

দিদিমণি, ও দিদিমাণ, ঘরে চলুন।

আবার টুলু শান্তির হাত ধরে টানতেই ওর চমক ভাঙল। শ্রীহীন মুখখানা বিরক্তিতে আরো কুৎসিত হয়ে উঠল। ভাঙা গালের ওপরকার কালো আঁচিলটা নড়ে উঠল। রুক্ষ গলায় ধমক দিয়ে উঠল ও। ইংরেজি স্কুলে পড়ছো টুলু, এদিকে এতটুকু ম্যানার্স শেখনি? দুজনে কথা বলবার সময়ে হুট্ করে মাঝখানে এসে আবোল তাবোল কথা বলে তাদের বিরক্ত করতে নেই, এটুকু তুমি জান না টুলু? ভারী অন্যায়।

রমনীর, যুবতী রমনীর রমনীয় কমনীয় ললিত লাবণ্যের উদ্দাম উত্তাল যৌবনের এক বিন্দু কণাও বুঝি খুঁজে পাওয়া যায় না শান্তির নারী শরীরে। বিধাতার কৃপণ মুঠি থেকে এতটুকু উত্তেজক, আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ঝরে পড়েনি ওর জন্য।

অথচ শান্তির গায়ের রং কি খুব কালো?

না, তাতো নয়। বরং ফর্সা বলাই চলে। শরীরের গড়ণটা রুক্ষ রুক্ষ কাঠ কাঠ। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কেমন একটা কর্কশ কঠিন পুরুষালী ভাব। গালের ওপরকার কালো একটা আঁচিল ওর সমস্ত মুখখানাকে কুৎসিত করে তুলেছে। সরু সরু লম্বা লম্বা হাত পা, প্রায় সমতল বক্ষ, দুচোখের ক্ষুধিত জ্বলজ্বলে দৃষ্টি সব মিলিয়েই শান্তি কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ধরণের। বছর দশেক ধরে ছেলে মেয়ে পড়িয়ে আর ইস্কুল মাষ্টারী করে করে ও যেন শুকিয়ে একেবারে কাঠের মতই হয়ে গেছে।

ঠিক যেন ওদের বাড়ির রূপ রস বর্ণ গন্ধহীন নিঃশেষ যৌবন বন্ধ্যা কাঠ চাঁপা গাছটার মত।

নিজের হাতে শান্তি বহুকাল আগে ছোট্ট চারা গাছটাকে কোথা থেকে এনে পুঁতে দিয়েছিল, কলতলার পাঁচীলের কাছে। ছাই ফেলা জঞ্জাল ফেলা উঠোনের কোণের বাড়তি এক টুকুরো অবহেলায় পড়ে থাকা মাটিতে। দিনের পর দিন ও জল ঢেলেছে। আস্তে আস্তে চারা গাছটা ত্রিভঙ্গ মুরারীর মত এঁকে বেঁকে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে বেড়ে উঠেছে। পাঁচীলে হেলান দিয়ে উদাসীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বছরের পর বছর।

বড় হল, কিন্তু গাছটা পুরোপুরি গাছ হয়ে উঠল না।

কে জানে কেন বেঁচে থেকেও বিশীর্ণ বিষণ্ণ প্রাণহীন লালিত্যহীন হয়ে

রইল। বহুদিন অসুস্থ শয্যাশায়ী রুগীর মত নির্জীব নিরানন্দ। কালসিটে পড়া পাতাগুলো পর্যন্ত সবুজ হয়ে উঠল না কোনদিন। সূর্যের আলোয় পান্নার রং ঝিলিক হেনে উঠল না ওর শাখা প্রশাখায় বর্ষার অজস্র বর্ষণে, বসন্তের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে একটি বারের জন্যেও কাঠচাঁপা গাছটা সঞ্জরিত পুষ্পিত পল্লবিত হয়ে উঠল না।

গাছটা যেন কৃপণ বিধাতার এক অসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে কোনমতে পৃথিবীতে বেঁচে রইল। শান্তির মতনই।

বাড়ির প্রত্যেকটা লোক আশ্চর্য হয়ে যায়। শান্তির বিধবা মা, দাদা বউদি, এমনকি শান্তির বাচ্চা ভাইপো ভাইঝি দুটোও।

এমন আঁটকুড়ো বাঁজা অফলা গাছ সাতজন্মে কি কেউ চোখে দেখেছে?

কী হবে এমন একটা বাজে গাছ বাড়িতে রেখে? যে গাছে কখনো কোন কালে একটা কুড়ি ধরে না? ফুল ফোটে না?

শুধু কি তাই? সাতরাজ্য জুড়ে বসে আছে না গাছটা?

আগে আগে পূবের রোদ্দুরটা শীত ভোর উঠোন ময় আসত। থাকত সমস্তটা দিন। হিংসুটে গাছটা তার ডাল পালা মেলে যেন দুহাত দিয়ে আটকে রেখেছে সেই রোদ আসার পথটা। সমস্তটা দিন যত রাজ্যের পাখপাখালির আড্ডা। উঠোনময় খড় কুটো শুকনো পাতা নোংরা ছড়িয়ে কাজ আর কাজের চেয়ে বিরক্তি বাড়াচ্ছে বাড়ির লোকেদের।

দু চক্ষে কেউ দেখতে পারে না বাঁজা গাছটাকে। কিন্তু আপদটাকে কেটে ফেলবারও জো নেই শান্তির জ্বালায়। গাছটা যেন শান্তির প্রাণ।

শান্তির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, দু ছেলে মেয়ের মা শান্তির বউদি সুধারই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী রাগ ওই কাঠচাঁপা গাছটার ওপর।

কেটে ফেললেই তো ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। খোলা মেলা হয় একতলার এই নড়ে চড়ে বসববার দাঁড়াবার জায়গাটা। উঠোনে, ঘর গুলোয় রোদ আসে। ডালের বড়িগুলো চোখের সামনে নজরে থাকে, খটখটে শুকনো হয়। ভিজে কাপড় জামাগুলোকে টেনে টেনে ছাতে নিয়ে গিয়ে আর কষ্ট করে শুকোতে দিতে, তুলে আনতে ছুটে ছুটে যেতে হয় না। একটা তার টাঙ্গিয়ে নিলেই হয় উঠোনে।

কিন্তু ননদের জ্বালায় তা হবার উপায় নেই। নিজেও যেমন অনড় অটল

হয়ে সংসারের ঘাড়ে চেপে বসে রয়েছে, গাছটাও ঠিক তেমনই হয়েছে সাতজন্মেও বোধ হয় এ বাড়ি থেকে আপদ দুটো বিদেয় হয়ে সুধাকে স্বস্তি দেবে না।

কিন্তু এতগুলো অসুবিধে সত্ত্বেও বাড়ির প্রত্যেকটি লোক গাছটাকে কেটে ফেলার পক্ষে হলেও শান্তির ভয়ে কেউ ওর গায়ে হাত দিতে সাহস পায় না। কেননা মাস গেলে এ সংসারে অনেকগুলো টাকাই আসে শান্তির হাত দিয়ে। তাছাড়া আবার একটা নতুন টিউশনিও ধরেছে ও। ইংরিজি স্কুলে পড়া বড় লোকের আদুরে মেয়ে টুলুকে বাংলা শেখানোর চাকরি। আর এই মস্ত বড় কারণেই সব জায়গা থেকে অপছন্দ করে যাওয়া বুড়ো বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হওয়া শান্তির মতামত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা সুধা অথবা এ বাড়ির অন্য কারু নেই।

পাশাপাশি হলদে রংয়ের বাড়িটার সবচেয়ে শিক্ষিত সুদর্শন রোজগেরে অবিবাহিত ছেলে অতুলের ঘরটা একে বারে রাস্তার ওপরে। অনেক সময় ওর ঘরের সদর দরজাটা খোলাই থাকে।

সময়ে অসময়ে কখনো কখনো দরজা বন্ধ থাকলে পারতপক্ষে রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করেনা অতুল।

এই পথেই শান্তির আসা যাওয়া। দুতিন দিন অতুলের সঙ্গে দেখা না হলেই ও ছট্‌ফট্ করে। ডিঙ্গি মেরে জানলার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে। কোন কোন দিন পথে তেমন লোকজন না থাকলে দুদশ মিনিট অপেক্ষাও করে অতুলের জন্যে।

অতুল ঘরে ঢুকতেই ও মুখ টিপে টিপে হাসে। দুচোখের গভীর দৃষ্টিতে এক দুর্বোধ্য রহস্যময় ঈঙ্গিত আনতে চেষ্টা করে।

কিন্তু তাতেই সব গোলমাল হয়ে যায়। ছোট ছোট চোখ দুটো কুঁচকে গিয়ে আরো ছোট হয়ে যায়। উঁচু উঁচু সামনের দাঁত কটা ঠোঁটের সমস্ত বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে ঠেলে বেরিয়ে আসে। কসা মুখের সেই কালো আঁচিলটা নড়তে থাকে একটা কালো পোকার মত।

বোঝেনা, ওর স্নো পাউডার মাখা মুখখানা কী কুৎসিতই না দেখায় তখন। লাবণ্য লালিত্যহীন শ্রীহীন—পীড়াদায়ক।

'অফিস থেকে ফিরলে বুঝি অতুলদা ?'

বয়সে বড় হয়েও কেন যে ওকে অতুলদা বলে শান্তি একথা কোনমতেই বুঝতে পারেনা অতুল। কিন্তু তাই নিয়ে ওকে কিছু বলেও না। রোজকার মত ও তাই ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে হাসিমুখে জবাব দেয়, এই মাত্র ফিরলাম শান্তি দি। আপনি বুঝি সেই ছাত্রীটিকে পড়াতে যাচ্ছেন? যাই বলুন, আপনার কপাল ভাল। চট করে মোটা মাইনের অমন ভাল টিউশনিটা পেয়ে গেলেন।

আমার কপাল ভাল—একথা আর কেমন করে বলি অতুলদা? টিউশনি-টাতো সত্যি খুব ভাল। মোটা মাইনে, খাটুনিও কম। তবে এখন টিকে থাকতে পারলে হয়।

হাসি মুছে গিয়ে শান্তির মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। গলাটা কেমন যেন ধরা ধরা রহস্যময় বলে মনে হয়।

অতুল বিস্মিত হয়। কেন বলুনতো? ওরা কিছু বলেছে আপনাকে? মানে আপনাকে ছাড়িয়ে দেবার কোন কথা?

উঁহু। শান্তি আরো গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়ে। ওসব কিছু নয় অতুল দা। সে অন্য ব্যাপার।'

'অন্য ব্যাপার।' অন্য ব্যাপার মানে ?'

বোকার মত অতুলের এই প্রশ্নে শান্তি খুব খুশী হয়ে মুচকে হাসে। বলতে ইচ্ছে নেই, তবু যেন অতুলের সাধ্য সাধনায় অত্যন্ত গোপনীয় কথায় বলছে, এমন ভাবে গলা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ওদের বাড়ির আর সবাই ভাল। তবে কি জানো, ছাত্রীর বড়দা শৈবালবাবু, তার কথাবার্তা, ব্যবহারটা যেন কেমন কেমন। বড্ড গায়ে পড়া। বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলেরা যেমন হয়, তেমন আর কি। পয়সা আছে অগাধ। তারপর সুন্দর, দুচারটে কথাটথা বলি বলে মনে করেছে আমি বুঝি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। কোনদিন যদি যেতে একটু দেরী হয় আমার; গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করবে। আমাকে দেখে কত কথা। কেন এত দেরী হল? অসুবিধা হলে বলুন আমি নিজেই আপনাকে ড্রাইভ করে নিয়ে আসব...চলুন না একটু

বেড়িয়ে আসি, সিনেমা যাই…এই সমস্ত হাজারটা আজে বাজে কথা বলবে। আমি এক একদিন রাগ করে বলি, আপনি অমন করলে আমি আর টুলুকে পড়াতে আসব না। কাজ ছেড়ে দেব।'

বোকারও বেহদ্দ বোকা অতুল বেশ উৎসাহ ভরে বলে ওঠে। 'তা আপনিই বা তাতে রাগ করেন কেন? এতটা পথ হেঁটে যাবার চেয়ে যদি ভদ্রলোক আপনাকে গাড়ি করে নিয়েই যান, সেতো খুবই ভাল কথা।

অতি সাবধানে শান্তি আবার মুখটিপে হাসে। বিশ্বাসঘাতক দাঁত কটাকে সাবধানে সামলে ও জবাব দেয়, 'বড়লোকের মদ খাওয়া বখে যাওয়া ছেলের সঙ্গে গাড়ি চড়ে বেড়ালে কি আমার মান সম্মান বাড়বে অতুলদা? কতবড় বংশের মেয়ে আমি, তোমরা, এ পাড়ার মানুষেরা সবাই সেটা জানো। ভাঙবে তো মচকাব না। তেমন খারাপ প্রবৃত্তি হবার আগে গলায় দেবার মত যেন একগাছা দড়ি আমার জোটে। তোমরা পুরুষ মানুষ, সাতখুন মাপ। যুবতী মেয়েদের অনেক জ্বালা। আমার যন্ত্রণা তুমি বুঝতে পারবেনা অতুলদা। খারাপ হবার হলে—'

কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যায়। শান্তি আর দাঁড়ায় না। কথা শেষ না করেই জানলা ছেড়ে চটির শব্দ তুলে বড় রাস্তার দিকে চলে যায়, বেশ দ্রুত গতিতেই।

'ওর সঙ্গে এতক্ষণ কী সব বক্‌বক্ করছিলে দাদা?' ঘরে ঢোকে অতুলের সুন্দরী অল্পবয়সী সদ্যবিবাহিতা বোন সীমা। শাসনের দৃষ্টিতে ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকায় দাদার দিকে, চলে যাওয়া শান্তির দিকে।

'ইচ্ছে করে কি আর বক্‌বক্ করি? দুটোকথা বলতে এলে কি মানুষকে তাড়িয়ে দেয়া যায়? না চুপ করে থাকা যায়? না ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা যায়। হাজার হোক ভদ্রমহিলাতো বটে।'

'ভদ্র মহিলা! ভদ্রমহিলা না ছাই!' পরম অবজ্ঞায় ঠোঁট ওলটায় সীমা। 'বয়সের গাছ পাথর নেই, বিয়ে থা হোল না, একবার এখানে একবার ওখানে যত্ত আইবুড়ো ছেলেদের সঙ্গে আজে বাজে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলা। ওইতো শাকচুন্নীর মন চেহারা। ওকে দেখে শৈবালবাবু মূর্চ্ছো গেলেন আর কি! এত মিথ্যে কথা বলতে পারে শান্তিদি আশ্চর্য! সব কথা শুনেছি দাদা আড়াল থেকে। তুমি বাপু আর হেসোনা। চট্ করে এবার

বিয়েটা করে ফেলো দেখি। ওর বড় নজর তোমার দিকে। বুঝিতো সব।'

সীমার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে অতুল প্রাণ খুলে হেসে ওঠে। 'বিয়ে হতে না হতেই তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস সীমা।'

*   *   *   *

পড়ানো তো শুধু বাংলা।

তাও আবার নীচু ক্লাসের। সে আর কতটুকু, কতক্ষণই বা লাগে?

একটুখানি পড়তে না পড়তেই ছটফট করে ওঠে এ বাড়ির আদরের মেয়ে টুলু। একবার ওঠে একবার বসে। এক একবার জল খেতে ছুটে চলে যায় বাড়ির মধ্যে। মায়ের কাছে। কখনো বাবার কাছে।

ঘণ্টা খানেকের বেশী পড়ানোর কথাও নয়। তবু উঠতে ইচ্ছে হয় না শান্তির। যতক্ষণ পারা যায় বসে থাকে। টুলুকে আটকে রাখার জন্যে যত রাজ্যের রূপকথার গল্প বলে। ছেলে ভোলানো ছড়া বলে। না হলে, টুলু চলে গেলে একলা বসে থাকা যায় না। ভাল দেখায় না। গল্প শুনতে টুলু খুব ভালবাসে। সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মত।

মুখে গল্প বলে বটে, কিন্তু সমস্ত মন প্রাণ আর কানদুটো উৎকর্ণ হয়ে পড়ে থাকে গেটের কাছে। শৈবালের ফেরার শব্দ পেলেই ও উঠে পড়ে। গল্প শেষ না করেই। পরের দিনের জন্যে বাদবাকী অংশটা মুলতুবী রেখেই।

পড়ার ঘরে শৈবাল ঢুকবে না। ভাল করেই শান্তি জানে একথা তাই বাধ্য হয়ে ওকেই এগিয়ে যেতে হয় গেটের দিকে।

'আপনি এখনো বাড়ি যাননি মিস্ চক্রবর্তী? টুলু আজও গল্প শুনছিল বুঝি? বেশ কাজ হয়েছে তো আপনার? রোজ রোজ বলার মত এত গল্প পান কোথা থেকে, বলুন তো?

আপ্যায়িত শান্তি গদগদ হয়ে ওঠে। 'বাচ্চাদের আমি ভীষণ ভালবাসি শৈবালবাবু। টুলু আমার গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। গল্প বলতেও আমি ভালবাসি ছোট্দের। বাড়িতে আমার ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝি দুটোতো পিসি গল্প বল—গল্প বল বলে আমাকে পাগল করে দেয়।'

এত বড় মিথ্যাকথাটা বলতে এতটুকুও মুখে আটকায় না শান্তির। মনেও পড়ে না কবে সে আদর করে কাছে ডেকে ওদের রূপকথার গল্প শুনিয়েছে।

শৈবাল কিন্তু শান্তির কথায় খুশী হয়েছে বলে মনে হয় না। স্পষ্টই ওর মুখের ওপর বলে ওঠে, 'তাবলে রাত হয়ে যাচ্ছে, এটাও তো একটু খেয়াল করবেন।'

সময় সম্বন্ধে এতক্ষণে যেন সচেতন হয় শান্তি। ও মা, তাই তো! কটা বাজে শৈবাল বাবু?'

দামী হাত ঘড়িটায় এক নজর চোখ বুলিয়ে শৈবাল বলে। 'সাড়ে আটটা বেজে গেছে। নটা বাজতে আর বেশী দেরী নেই।'

'ন—টা! ওরে বাব্‌বা।' শান্তি প্রায় সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। জানেন শৈবালবাবু, আমাদের পাড়াটা আটটা বাজতে না বাজতে একেবারে নিশুতি হয়ে যায়। আর তখন যত সব বখাটে মাস্তান ছোকরাগুলো রকে বসে বসে আড্ডা মারে বদমায়েসি করে। কোন মেয়েকে একলা যেতে দেখলেই শীষ দেবে সিনেমার গান গাইবে—মুখ খারাপ করে যা-তা কথা বলবে। এত ভয় করে আমার। চলুন না একটু আমার সঙ্গে। খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসবেন।

'আমি আপনার সঙ্গে যাব। এগিয়ে দিতে।' বিস্মিত শৈবাল শান্তির উদ্ভট কথাটার অর্থ যেন একেবারেই বুঝতে পারে না। 'কেন দারোয়ানটা কি করতে আছে। আপনি না হয় এখানেই একটু দাঁড়ান, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি, ও আপনাকে এগিয়ে দেবেখ'ন। আর একটা কথা। কাল থেকে কষ্ট করে আপনাকে আর এতক্ষণ অবধি পড়াতে হবেনা। আপনার পাড়ার মস্তানরা রকে বসে আড্ডা মারবার আগেই আপনি চলে যাবেন।'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না শৈবাল। ফিরেও তাকায় না শান্তির দিকে। দৃঢ় পদে জুতোর শব্দ তুলে ও বাড়ির দিকে চলতে সুরু করে।

দিনের আলো নয়, রাত্রের অন্ধকার। তাই অপমানিত লাঞ্ছিত মুখের রক্তহীন বিবর্ণতা ঢাকবার দরকার হয় না। দরকার হয় শুধু প্রায় উপচে পড়া চোখের জলটা চট করে মুছে ফেলবার। আর দরকার হয় রুদ্ধ গলাটা পরিষ্কার

রাখবার। যেন এতটুকুও না কাঁপে। যেন এতবড় অপমানের এতটুকু আভাস না থাকে শান্তির কথাগুলোর মধ্যে।

'সত্যি সত্যি আপনি দারোয়ানকে ডাকতে যাচ্ছেন নাকি শৈবালবাবু? আমি ঠাট্টা করছিলাম, তাও বুঝতে পারলেন না? নাঃ আপনি ভারী ভাল মানুষ দেখছি। একা একা আসা যাওয়া করাই আমার চিরদিনের অভ্যেস। একটা পুরুষকে বগলদাবা করে নিয়ে পথ চলা—ভারী বিশ্রী লাগে আমার। দাদার বন্ধু অতুলদা কম রাগ করে সেজন্যে? রোজ বলে, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব শান্তি, কেন তুমি একলা বাড়ি ফিরবে রাত্তির বেলা? আমিই রাজী হই না ওর কথায়, ভালই লাগে না আমার—।'

কথাটা শেষ না করেই হন হন করে চলতে সুরু করে শান্তি।

কিন্তু তবু, শান্তির মত মেয়েকেও এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। যত সব বখাটে রকবাজ ছেলেদের আড্ডা না থাকুক, লাহাবাবুদের মোটর গ্যারেজটা এ পথে চলতে গেলে চোখে না পড়েই পারে না। লরী ট্যাকসি প্রাইভেট কার সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। যান্ত্রিক গোলযোগে অনড় অচল প্রায় সব কটাই। মেকানিকদের হাতের যাদুতে ওরা প্রাণ পায়। নড়ে চড়ে কথা কয়ে ওঠে। আবার দৌড় ঝাঁপ সুরু করে।

যেদিন এ পথ দিয়ে যায় শান্তি, ইচ্ছে করেই সেণ্টমাখানো রুমালখানা নাকের ওপর চাপা দেয়। শুধু ধোঁয়া ধুলো মবিল অয়েল অথবা পেট্রোলের গন্ধের জন্যেই নয়। খাকী প্যাণ্ট পরা সর্বাঙ্গে কালিমাখা ভূতের মত চেহারা কানাই মিস্ত্রিকে দেখলে সত্যি সত্যি শান্তির মত মেয়েরও গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

পারত পক্ষে ও এপথ মাড়ায় না। কানাই মিস্ত্রি আর তার কটা সাকরেদ বন্ধু ওকে দেখলেই চোখ টেপাটেপি করে। নিজেদের মধ্যে ইসারা ইঙ্গিত করে। ওকে লক্ষ্য করে পরিহাসের তীর ছোঁড়ে।

শান্তি ওদের দিকে না তাকিয়েও সেটা বুঝতে পারে। ওদের রসিকতা-গুলো ইচ্ছে না থাকলেও কানে পৌঁছয়।

'বুড়ী মেম চলছে রে, ভাখ্ ভাখ্—'

'রাস্তাটা একেবারে আলো হয়ে গেছে—'

'বুড়ী মেম হবে কেন? পূর্ণিমার চাঁদ—'

'মেমের আর সাহেব জুটল না—'

'সাহেব দিয়ে কি হবে? আমাদের কানাইদাই তো আছে—

শান্তির ইচ্ছে হয় পায়ের চটি খুলে ছোটজাতের গাড়ির মিস্ত্রি কানাইটাকে চটাপট কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়। কিন্তু পারে না। হাজার হোক এককালে দাদার সঙ্গে পড়তো। শান্তিদের বাড়ি আসত যেত। শান্তিকে এটা ওটা উপহার দিত। দাদার সঙ্গে ওর খুবই ভাব ছিল। কিন্তু চাকরি বাকরি না জোটায় মোটর মেরামতের কারখানায় কাজ নেওয়ার পর থেকে শান্তির দাদা ওর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। মনের রাগ মনে চেপে ও চোখ কান বুজে গ্যারেজের রাস্তাটা পার হয়ে যায়। কানাইসাহার চেহারাটা শক্তসমর্থ, লম্বা চওড়া, এককথায় মন্দ নয়। কিন্তু কালিঝুলি মেখে এমন ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে যে রাত্রে ওকে দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়।

*　　　　*　　　　*

আজ বোধ হয় একটু তাড়াতাড়িই কারখানার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। অথবা ছুটি আছে। সাড়াশব্দ নেই। লোকজনও নেই। শান্তি একটু বিস্মিত হল। এমন বড় একটা হয় না। কানাই ঠিক থাকেই এখানে। ও হেড মিস্ত্রি। অনেক টাকা মাইনে পায়। কাজও নাকি ভালই করে ও। শান্তি ওকে ঘেন্না করে অপছন্দ করে, তবু মাঝে মাঝে সোজা সদর রাস্তা ছেড়ে কেন যে এই বাঁকা পথটা বেছে নেয়, একথা বুঝি ও নিজেই ভেবে পায় না। অথবা ভাবতে চিন্তা করতে চায় না।

মাঝে মাঝে কানাইমিস্ত্রির স্পর্ধার সীমাটা দেখতেও ওর বুঝি খুব ভাল লাগে। ভাল লাগে ওর উদ্ভট প্রলাপগুলি।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল। ঠিকই আছে। যাবে আর কোন চুলোয়। ঘর আছে না ঘরণী আছে। ওই তো চাকা বদলাচ্ছে না কি সব কাজ করছে গাড়ির।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে ডাক এলো, শুনছেন?

'আমায় ডাকছেন।' ভ্রূকুঞ্চিত করল শান্তি। অজস্র বিরক্তির রেখা ফোটালো চোখে মুখে। মনে পড়ল, আগে যখন কানাই ওদের বাড়ি যেত,

শান্তি যখন ছোট ছিল, তখন শান্তি ওকে কানাইদা, আপনি বলে সমীহ করে কথা বলতো। আর এখন কানাই ওকে সমীহ-ভরে আপনি বলে কথা বলে।

গ্যারেজে আর কেউ ছিল না। স্টেপ্নি থেকে টিউব বার করে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কানাই ফুটোগুলো দেখছিল। শান্তিকে দাঁড়াতে দেখে চোখ ফেরালো। হাসল না। বেশ গুরু গম্ভীর ভাবেই বলল, 'একটু দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। অন্য দিন ওরা থাকে কথা বলার সুযোগ হয় না—আজ দেখা হয়ে ভালই হল। কথাটা মুখোমুখি হয়ে যাবে।'

'কথা! আমার সঙ্গে? কিন্তু আমার তো দাঁড়াবার সময় নেই। রাত হয়ে গেছে।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা কটা বলে সমস্ত শরীরে অবজ্ঞা ফোটাতে চাইল শান্তি। যেন ওকে বুঝিয়ে দিতে চাইল, আমার মত একজন অভিজাত বংশীয়া, শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার মত একটা গাড়ি মেরামত মিস্ত্রির এমন কি কথা থাকতে পারে, যা এত রাত্রে নির্জন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে?

'এক মিনিট দাঁড়ালে কোন ক্ষতি হবে না আপনার।' কানাই ওর তাচ্ছিল্য অবজ্ঞায় ভ্রূক্ষেপও করল না। নিজের কাজই সারতে লাগল একমনে। স্টেপনির ফুটোগুলো জুড়ে টিউবটাকে তার মধ্যে ভরে পাম্প করতে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের জানাশোনা। আপনার দাদা এখন আমাকে চিনতে না পারলেও, একদিন বন্ধু বলেই ভাবতো। কথাটা বলব বলব ভাবছি অনেকদিন ধরে। কিন্তু আপনার যা মেজাজ, সাহসে কুলোয়নি। আজ ধারে কাছে কেউ নেই তাই নির্ভয়ে বলছি। অবশ্য আপনারা কুলীন বামুন, আর আমি সাহা, নীচু জাতের কায়স্থ। তায় মিস্ত্রিক্লাসের লোক; একেবারে যাকে বলে লোয়ার ক্লাস ... আপনিতো সবই জানেন। যদি আপনার অমত না থাকে, তবে ...।

'কি ...কি বলতে চান আপনি, অ্যাঁ? রাগে, অপমানে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে উঠল শান্তির। 'আপনার আস্পর্ধার সীমা পরিসীমা নেই যে দেখছি। শুধু জাতে নয়, আপনি স্বভাবেও ছোট লোক। ছোট লোকের বেহদ্দ। কার সঙ্গে বলছেন, মনে রাখবেন।'

কানাই কিন্তু শান্তির রাগকে এতটুকুও গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। আহা-হা। অমন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন কেন? আমাকে একেবারে

ছোট লোকের বেহদ্দই বা ভাবছেন কেন ? আপনার দাদার সঙ্গেই তো এক কালে স্কুলে কলেজে পড়েছি। জিজ্ঞাসা করে দেখবেন আপনার দাদাকে, আমি একেবারে খারাপ ছেলে নই, বুঝলেন ? আপনাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে এসেছি। একটা মায়া পড়ে গেছে। সত্যি আপনাকে দেখলে ভারী কষ্ট হয় এখন আমার। বয়সও তো কম হয়নি। পাড়ায় আপনার বয়সী সবকটা মেয়ের কবে বিয়েথা হয়ে ছেলেপুলে হয়ে সংসার ধর্ম করছে তারা এখন। শুধু আপনারই বিয়ে হলনা এখন পর্যন্ত। হবে বলে মনেও হয় না আর। আর আমার ? দেখে শুনে দু-দুটো বিয়ে করেছিলাম কিন্তু পোড়া কপালে একটাও টেঁকসই হল না। কথায় বলে না, ভাগ্যবানের বৌ মরে, আমারও তাই হয়েছে আর কি। এমন সুপাত্রের হাতে আর কি কেউ সাধকরে মেয়ে দেবে! তাই বলছিলাম, আপনি যদি রাজী থাকেন।

'বেশতো, খুব ভাল কথা।' গলায় বিষ ঝরালো শান্তি। 'এতই যদি আবার বিয়ের সখ, আমার দাদার কাছে গিয়েই বিয়ের কথাটা পাড়ুন না। সাহস থাকে তো কাল সকালেই চলে যান। তবে তারপর আপনার কী অবস্থা যে হবে, আস্ত হাত পা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা, তা অবিশ্যি আমি বলতে পারব না।'

জক্ ফিট করে ফাটা টায়ারটা সরিয়ে স্টেপনিটা যথা স্থানে ফিট করতে করতেই কানাই ব্যঙ্গভরে শান্তির কথার জবাব দিল, সে আর আমি জানি না ? ভাল করেই জানি। প্রথম পক্ষের বৌটা মারা যাবার পর আপনার দাদার কাছে আমিই তো লোক পাঠিয়ে প্রস্তাবটা করিয়েছিলাম। আজকাল আবার কেউ জাত টাত মানে নাকি ? তা আপনার দাদা নাকি তাকে মারতে উঠেছিল, বিয়ের কথা শুনে। নীচু জাতে বোনকে বিয়ে দেবার জন্যে নয় বুঝলেন ? আমি জানি আপনার দাদা বৌদি সাত জন্মেও সম্বন্ধ করে পাত্র খুজে এনে আপনার বিয়ে দেবে না। কোন দুঃখে দেবে বলুন ? আপনি হাতছাড়া, বাড়ি ছাড়া হলে আপনার রোজগারের টাকাগুলোও তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। সোজা ক্ষতি ? আপনার দাদার পায়ে ধরতে আবার আমি যাব কোন দুঃখে ? আপনি নিজে তো আর কচি খুকিটি নন। যথেষ্ট বয়স হয়েছে আপনার। সুতরাং আপনার মত হলেই দুজনে রেজেস্ট্রী করব।'

'সাতজন্ম যদি আমার বিয়ে নাও হয়, তবু জাত জন্ম খুইয়ে কুলীন বামুন মেয়ে হয়ে একটা মোটর গাড়ির মিস্ত্রি, নীচু জাতের ছোট লোককে বিয়ে করব না। কথায় বলে না; বামুন হয়ে চাঁদ ধরার সখ! দাঁড় কাকের আবার ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে ময়ূর হবার সাধ।'

গণগণে জ্বলন্ত চোখের আগুনে, তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্রূপে কানাইকে ঝলাস দিয়ে শান্তি সবেগে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

'দাঁড় কাকের উপমাটা কিন্তু আপনার আমার ক্ষেত্রে একেবারেই ঠিক হল না। চেহারাটা আমার সবাই ভালই বলে, দাঁড়কাকের মত, এমন কথা শত্রুও বলে না। আর আমি গরীব মিস্ত্রি, একথা ভুলে বড় লোকের দলে কোন দিনও মিশতে যাই না। কিন্তু শান্তি দেবী চক্রবর্তী? আপনি নিজে কী করে বেড়াচ্ছেন সেটা ভেবে দেখবেন একবার? ময়ূর পুচ্ছের কথাটা বিশেষ করে আপনারই মনে রাখা দরকার, বুঝলেন?'

বরফের মত শীতল গলায়, চাবুকের মত শান্তির মুখের ওপর কথাকটা ছুঁড়ে মারল কানাই।

তীক্ষ্ণ মুখ তীরের মতই কানাইয়ের অতি বড় সত্য কথাগুলো হৃদয়ের গভীরে বিঁধে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত করে তুলল শান্তিকে। অপ্রত্যাশিত অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, কষাহত পশুর মতই কাঁপতে কাঁপতে একরকম ছুটতে ছুটতেই সেখান থেকে চলে গেল শান্তি। দ্বিতীয় কথা না বলে, পিছন ফিরে না তাকিয়ে।

ঠিক হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে তার। সোজা সদর রাস্তা ছেড়ে বাঁকা পথে চলার ভুলের শাস্তি এটা।

কেন এই পথ দিয়ে ফেরার সখ হয় শান্তির মাঝে মাঝে?
চলার পথের অভাব আছে নাকি কলকাতা সহরে?
বেশ কিছু দিন কেটে গেল তারপর।
সেদিন অতুলের ঘরে উঁকি মারতেই হাসি মুখে সীমা চেঁচিয়ে উঠল,

যে শান্তি দি, শোন শোন সুখবর আছে। দাদা তোমাকে লজ্জায়
নি। দাদার বিয়ে যে গো।'
'তাই বুঝি?' প্রাণ পণে ছাই হয়ে যাওয়া 'মুখ খানায় হাসি ফোটাতে
চেষ্টা করে শান্তি। 'এই মাসেই?'
'হ্যাঁ শান্তি দি এই মাসেই। দাদার সঙ্গে ভাব ছিল মেয়েটার। খুব
র দেখতে। এম, এ পাস, বড় লোকের মেয়ে। এসো না, ফোটোটা
খ যাও।'
'না ভাই সীমা, এখন আমার এতটুকুও সময় নেই। পরে এক সময়
বখ'ন। আর বৌ এলেতো দেখতেই পাব।'
'এবার তুমিও একটা বিয়ে কর শান্তিদি। বুড়ো হয়ে গেলে যে।
আর ঘর সংসার করবে।'
সীমার আন্তরিকতা পূর্ণ কথাটা শুনেও যেন শুনতে পায় না শান্তি। যে
র উত্তর দেওয়া যায় না, সে ব্যথা কানে না শোনার ভান করাই ভাল।
বুকের ভেতরটায় অস্বাভাবিক ভাবে ধক্ ধক্ করতে থাকে। গায়ে ধাক্কা
র বল হাতে নিয়ে ছুটে যাওয়া বাচ্চা ছেলেটার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে
ায়। ইচ্ছে করে ওর সুন্দর নরম গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে ওর
তর বলটা কেড়ে নেয়। ইচ্ছে করে, তার পায়ের কাছে আরামে শুয়ে
নেড়ী কুকুরটা গোটা দুই বাচ্চা পরমানন্দে যার পেটের কাছে কুন্তলি
শুয়ে দুধ খাচ্ছে, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে গুঁজে খেলা করছে, ঢিল মেরে
র ওই সুখ ভেঙ্গে, মাথা ভেঙ্গে রক্তাক্ত করে দেয়। আরো একটা প্রচণ্ড
য় ওর হাতটা নিস পিস্ করে। ওই যে সালঙ্কারা সুন্দরী অল্প বয়সী
টা পরম অহঙ্কারে একমাথা জলজলে সিঁদুর নিয়ে পরিতৃপ্ত সুখী মুখে
ক উপদেশ দিচ্ছে তার তার সি থির সি দুরটা ঘষে ঘষে মুছে সাদা করে
।
শত্রু। পৃথিবীর সবাই ওর শত্রু।

বিয়েটা করে ফেল শান্তি দি!
বিয়ে যেন গাছের ফল। শান্তির হাতের কাছে নাগালের মধ্যেই আছে।

ইচ্ছে করে যেন সেই ফলটা শান্তি পাড়ছেনা—খাচ্ছে না। একটা নিষিদ্ধ ফলের মত দূর থেকে তাকে এড়িয়ে চলছে শান্তি!

পরশু রাত্রেই দাদার শাশুড়ী বড় শালীরা সব বেড়াতে এসেছিল। নানা কথায় শান্তির বিয়ের কথাও উঠেছিল। এক কথায় থামিয়ে দিয়েছিল দাদা। চেষ্টা তো করা হয়েছিল যথেষ্ট। কই আর হল। ওই তো চেহারার ছিরি। কে ওকে পছন্দ করবে। এখন বয়স হয়ে গেছে। এত বয়সে ওই চেহারায় কে আর ওকে পছন্দ করে বিয়ে করতে আসবে? তার চেয়ে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, স্বাধীন ভাবে রোজগার করছে। বেশ আছে ও। বিয়ের কথা—একে বারেই অবান্তর এখন, আগেকার দিন এখন আর নেই যে ধরে বেঁধে যা হোক একটা বিয়ে দিতেই হবে। এখন কত মেয়ে লেখাপড়া শিখে দিব্যি চাকরি বাকরি করছে। স্বাধীন স্বাবলম্বিনী। তারা কি মন্দ আছে। শান্তির দাদা শান্তিকে কোন কালেই অযত্ন অনাদর করবে না মাথায় করে রাখবে।

হাজার হোক, মায়ের পেটের বোন তো বটে!

শৈবালের সঙ্গে আজকাল আর দেখা হয় না শান্তির। ইচ্ছে করেই যেন শৈবাল এড়িয়ে চলে শান্তিকে।

তবু হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। শান্তি লজ্জিত ভাবে মুখ নীচু করে বলল, 'খুব বেঁচে গেছি শৈবাল বাবু।'

'কেন? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল নাকি আপনার। শুনিনি তো? শৈবাল প্রশ্নটা না করে পারল না।

'প্রায় সেই রকম।' শান্তি সাবধানে দাঁত সামলে সলজ্জভঙ্গিতে হাসল। আমাদের পাশের বাড়ির অতুল রায়, তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। কী যে পাগলামি ভদ্রলোকের। আমাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে সে বিয়ে করবে না। হাতে পায়ে ধরাধরি। কী আর করি, রাজী হলাম। হঠাৎ ভেতর থেকে খবর পাওয়া গেল ভদ্রলোকের স্বভাব-চরিত্র নাকি একেবারে জঘন্য।

'তাই বুঝি? বাইরের চেহারা দেখে মানুষ চেনা বড় কঠিন।'

'আর বলেন কেন। বাড়িতে এই নিয়ে অশান্তি ঝগড়া চলছে। মা দাদা বৌদি সবাই বলছেন, অমন চাকরি, অমন সুন্দর চেহারা, একটু যদি দোষ থাকে, কী হয়েছে। পুরুষ মানুষের এতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। এমন কত থাকে। বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যায়। আমি কিন্তু সাফ্ জবাব দিয়ে দিয়েছি। না। অমন লোককে বিয়ে করব না।'

শৈবাল বিস্মিতের মত বলল, 'সে কি? অমন ভাল পাত্র রিফিউজ করলেন এটা কিন্তু আপনার উচিত হল না।

'কী যে বলেন আপনি তার ঠিক নেই। লেখাপড়া শিখেছি। শিক্ষাদীক্ষা রুচি প্রবৃত্তি বলে একটা কথা আছে। তায় কুলীন বামুনের মেয়ে। কেমন করে একটা চরিত্রহীন লম্পটকে বিয়ে করি বলুন তো? হলেই বা বড়লোকের ছেলে? গাড়ি বাড়ীওলা মোটা মাইনের চাকুরে?

'তা বটে—তা বটে—'

একটা ছুতো করে শৈবাল পালিয়ে যায় ওর সামনে থেকে। শান্তির সঙ্গে বাজে বক্‌বক্ করে নষ্ট করার মত সময় তার হাতে কখনই থাকে না।

ক'দিন বাদে আবার শৈবালকে দেখতে পেল শান্তি। রবিবারের সন্ধ্যা-বেলায় গোটাকতক ফলপাকড় এটাওটা টুকিটাকি জিনিষ কিনে মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসবার মুখেই।

নিজেই ড্রাইভ করছিল শৈবাল। কিন্তু ওর পাশে বসে ও কে? সলিলা না?

অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবে অমন চেহারা সচরাচর নজরে পড়ে না। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে মেয়েটা। ছোট ছিল, এখন বেশ বড় হয়েছে। ওরই বড় বোন প্রমীলার সঙ্গে এককালে কী বন্ধুত্বই না ছিল শান্তির? বছর দশেক আগেই তার বিয়ে হয়ে গেছে। আসা যাওয়া খোঁজ খবর নেওয়া সব ঘুচে গেছে সেই সঙ্গে।

খুব কাছাকাছি বসেছিল ওরা দুজনে। কথা বলছিল। হাসছিল। দুজনের দৃষ্টি গভীর। চোখ মুখের ভাবভাষা আরো সুগভীর।

গাড়ি থামিয়ে শৈবাল দরজাটা খুলে ধরল। সলিলা নামল। শৈবাল সতৃষ্ণ সপ্রেম দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল। সলিলা লজ্জা-রক্ত মুখে চকিতে চাহনিতে সায় দিল ওর কথায়।

তারপরই গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে গেল শৈবাল।

সমস্ত জাগতিক অনুভূতি হারিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে ওদের প্রেমলীলা দেখছিল শান্তি। শৈবাল চলে যেতে ওর চেতনা ফিরল। সলিলা রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসতেই ও চেঁচিয়ে ডাক দিল, 'সলিলা—এই সলিলা ?'

'ওমা শান্তিদি! তুমি? খুব রোগা আর কালো হয়ে গেছ কিন্তু তুমি। অসুখ বিসুখ করছিল বুঝি? দিদি তো সেই সাহেবগঞ্জেই আছে। দুটো ছেলে হয়েছে দিদির।'

ওমা, তাই বুঝি? খুব গিন্নি হয়ে গেছে তাহলে তো প্রমীলা? কতদিন ওকে দেখিনি। কবে আসবে ও এখানে?'

শিগ্‌গিরই আসবে...মানে আমার বিয়েতে...' সলিলার সুন্দর মুখখানা সুখে লজ্জায় আরো সুন্দর হয়ে উঠল।

'তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ। অনেক দিনই ঠিক হয়ে আছে। আপনি বুঝি এখনো সেই নারী-শিক্ষালয়েই পড়ান শান্তিদি?

'এখনো তো পড়াচ্ছি ভাই। কিন্তু আর বেশি দিন বোধ হয় পড়ানো চলবে না।'

সলিলা কৌতূহল ভরে প্রশ্ন করল, 'আপনার বিয়ে হবে, তাই বুঝি শান্তিদি? বিয়ের পর পড়ানোর অসুবিধে বলে?'

'ঠিক ধরছো সলিলা।' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে শান্তি ওর কথায় সায় দিল। বিয়ের পর আমাকে আর স্কুলে কাজ করতে দেবে না। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা খুব বড় লোক কিন না।'

'ওমা তাই বুঝি? খুব ভাল হবে শান্তিদি। দিদিকে আমি তোমার বিয়ের কথা লিখব। দিদিও খুব খুশী হবে।' আন্তরিক আনন্দে ঝলমল করে উঠল সলিলা।

'না—না ও কাজটি করনা সলিলা' দিদিকে এখন আমার বিয়ের কথাটথা একদম লিখ না।' চোখে মুখে গভীর রহস্যের অন্ধকার টেনে এনে যেন কোন গোপনীয় কথা বলছে, এমনভাবে চাপা গলায় ফিসফিস করল শান্তি, পুরুষ

মানুষকে বিশ্বাস নেই। যতক্ষণ বিয়ে না হয়, ততক্ষণ বাইরের কোন লোকের কাছে আমি কিছু বলতে চাই না। তুমি আমার বন্ধুর বোন, নিজের ছোট বোনের মত, তাই তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। আমরা দুজনে অনেকদূর অবধি এগিয়ে গেছি। লজ্জার কথা তোমাকে কি আর বলব সলিলা—বিয়ে না করে আর আমাদের উপায় নেই। কিন্তু আজ কাল করেও আমাকে খালি ঘোরাচ্ছে। কে জানে শেষ পর্যন্ত কি করবে? বড় লোকের খেয়াল তো। তাই বলছি, কেলেঙ্কারির কথাটা এখন আর পাঁচ কান কর না।'

শান্তির কথায় বিব্রত সঙ্কুচিত সলিলা তাড়াতাড়ি এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বলে উঠল; 'না না—নিশ্চয় বিয়ে করবে। না করে উপায় যখন নেই—তখন যাবে কোথায়?'

কেমন একটা হিংস্র জ্বালাভরা দৃষ্টিতে সলিলার সর্বাঙ্গে চোখ বুলোয় শান্তি। উচ্ছ্বসিত যৌবনা অপরূপ রূপসীর দিকে। রজনী গন্ধার মত ওর সুন্দর চেহারার দিকে। ওর লালণ্যভরা মুখের দিকে। ওর উদ্ধত-দর্পিত বুকের দিকে।

তারপরই ফস্ করে বলে ওঠে, কি জানি ভাই, পুরুষের মন তো? ওর বাবা মাও এখনো কিছু জানেন না। যতবড় বংশের মেয়ে হই না কেন, দেখতে তো আর তেমন সুন্দর নই, তাই একটু মুসকিল হয়েছে। ওর ছোট বোন টুলুকে আমি পড়াই কিনা, তাই থেকেই দুজনের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। শৈবাল বলেছে, এখন বাড়িতে কিছু জানাবে না। রেজেষ্ট্রি করে বিয়েটা সেরে ফেলে তারপর ওঁদের বুঝিয়ে বললেই হবে। এক ছেলে তো, নিশ্চয় তাঁরা—

'কে টুলু? শৈবাল ব্যানার্জীর বোন? তাকেই তুমি পড়াও শান্তিদি? শৈবাল বাবুর সঙ্গে তোমার...

মুখের কথা শেষ হয় না। থর থর করে কাঁপতে থাকে সলিলার চোখের পাতা। রক্তাভ ঠোঁট দুটি। ওর আরক্ত উজ্জ্বল টাট্‌কা গোলাপ ফুলের মত মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

এতটুকু দয়ামায়া হয় না কিন্তু শান্তির।

নিষ্ঠুর উল্লাসে আনন্দে ওর মুখখানা কেমন বিকৃত দেখায়। ফর্সা মুখের ওপর সেই কালো আঁচিলটা একটা পোকার মত কিলবিল করে ওঠে। দাঁত কটিও আর ঠোঁটের চাপে চাপা থাকে না, বেরিয়ে আসে মাড়িসুদ্ধ।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে দু'চোখ কপালে তুলে ও বলে ওঠে, 'চেনো নাকি তুমি সতীশ ব্যানার্জীর ছেলে শৈবাল ব্যানার্জীকে। টুলু তো ওরই ছোট বোন।'

'না—না—না—আমি কাউকে চিনি না—টুলুকেও না তার দাদাকেও না। আমি এখন যাচ্ছি শান্তিদি—আমার শরীরটা ভাল নেই—' কোনমতে কথা-কটা বলে এক রকম ছুটতে ছুটতেই শান্তির সামনে থেকে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় সলিলা ; উপচে পড়া চোখের জল সামলাতে সামলাতে।

আরো দুটো দিন কেটে গেল তারপর।

টুলুদের বাড়ি ঢোকবার মুখেই বাধা পেল শান্তি। শৈবাল ব্যানার্জী দাঁড়িয়ে আছে দুটো গেটের ওপর দুহাত রেখে। তারই প্রতীক্ষায়।

রুক্ষ চুল আরো রুক্ষ, হাওয়ায় আরো বিশৃঙ্খল। পরণের পোষাকপরিচ্ছদ আজ অন্যদিনের মত নিভাঁজ নিখুত টিপটপ্ নয়। মুখের প্রত্যেকটি পেশী কর্কশ কঠিন। আরক্ত চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ প্রখর।

গেটের কাছাকাছি আসতেই শৈবাল হুকুমের স্বরে বলল, 'দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

হাসি হাসি মুখে প্রত্যাশা-ভরা তৃষিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল শান্তি। উত্তেজনায় উন্মাদনায় ওর বুকের মধ্যে দুর দুর করে উঠল। অকারণেই বুকের ওপর সাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে নিল ভাল করে।

'শুনুন, আপনি আর কোনদিনও এবাড়ি ঢুকবেন না। এত নীচ এত হীন এতবড় মিথ্যাবাদী আপনি? ছিঃ! একজন মেয়েমানুষ হয়ে কেমন করে আপনি সলিলার কাছে অতবড় মিথ্যা কথাটা বলতে পারলেন? কেমন করে তার কাছে আমার নামটা উচ্চারণ করলেন? আপনার লজ্জা হল না? এতবড় নির্লজ্জ বেহায়া বেইমান আপনি?'

ক্রোধে ক্ষোভে বজ্রগর্জনের মতই গমগম করে উঠল শৈবালের কণ্ঠস্বর।

শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে ফ্যাঁসফ্যাসে গলায় একটু হাসবার চেষ্টা করল শান্তি। 'ওঃ! সেই কথা? সলিলার যেমন কাণ্ড ঠাট্টাও বোঝে না। এসব কথা আবার মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষের কাছে বলতে পারে নাকি? তা ওর মত ঝানু মেয়ে সব পারে। জানতে তো আর কিছু বাকী নেই আমার। ওর দিদি প্রমীলা আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। তখন থেকেই সলিলাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। বাইরে থেকে ওর চেহারাটা দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ও কী যে সাংঘাতিক—'

'চুপ! চুপ করুন আপনি।' হিংস্র ক্রোধে ফেটে পড়ল শৈবাল। 'আমার ভাবী স্ত্রী সম্বন্ধে আপনার মত ছোট লোকের মুখ থেকে একটা কথাও শুনতে রাজী নই আমি। টুলু আপনার কাছে আর পড়বে না। আপনার পাওনা টাকা হিসেব করে, এম, ও, করে ঠিক সময়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

শান্তির মুখের ওপরেই খটাং করে গেটটা বন্ধ করে দিয়ে লম্বালম্বা পা ফেলে শৈবাল চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

আর শান্তি!

সেইখানে, সেই গেটের বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অপমানিত লাঞ্ছিত শান্তির অবচেতন বিকৃত মনের দুটো চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরে পড়তে লাগল।

বাইরে থেকে দেখলে যেটাকে ভুল করে লোনা জল বলেই মনে হতে পারে।

ফাল্গুন চোত। ষষ্ঠ ঋতুর বসন্তের দিনগুলো শেষ হয়ে এলো। এবার পৃথিবীর বদলের পালা। প্রথম ঋতুর দুঃসহ আবির্ভাবের ইসারা এর মধ্যেই সবাই জানতে পেরে গেছে।

'কাঠচাঁপা গাছটা এবার মরবে ঠাকুরঝি। দিন দিন কিরকম শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ? এখনিতো ওদের ফুলফোটাবার সময়। ফাগুন

থেকে ভাদ্দোর পর্যন্ত। সময়েই যদি ফুল না ফুটল। তবে অসময়ে তো ফুটবেই না। গাছটা বাঁজা। মরণদশা তোমার চাঁপা গাছের। কি করতে যে জিইয়ে রেখেছ ওটাকে, তুমিই জান।'

সুধার কথায় শান্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওর নিজের হাতে পোঁতা কাঠচাঁপা গাছটার দিকে। সর্বাঙ্গে জরার লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। পাতাগুলো শুকনো শুকনো কালচে কালচে। কাণ্ডময় শ্যাওলার মত ছেপে ধরেছে। ষষ্ঠ ঋতুর অবারিত দাক্ষিণ্যেও কিন্তু তার শাখাপ্রশাখায় একটা কুঁড়িও ধরেনি। নব কিশলয় সঞ্চারের কোন চিহ্নই ওর কোথাও নেই। একটা মৌমাছি—ভ্রমর কি প্রজাপতিও পথ ভুলে ওর কাছে আসে না। আগে তবু পাখিরা উড়ে উড়ে আসত। কিচিরমিচির করে ওর শাখায় বসে ওড়াউড়ি করতো, পাতা খসাতো নোংরা করত—তবু আসতো। কিন্তু শান্তির কাঠচাঁপার যে ফুল ফোটানোর পাতা ধরানোর ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে, একথা কেমন করে যেন ওরাও টের পেয়ে আর এমুখো হয়না। ওরাও আর ওই পত্রপুষ্পবিহীন জীর্ণ শীর্ণ নিরাভরণ গাছটাকে এড়িয়ে চলে।

ওটা কাঠচাঁপা, না শান্তি নিজেই?

সুধা আবার বলে, 'আর কেন? এইবার তোমার ওই কাঠ কাঠ গাছটাকে কেটে ফেল ঠাকুরঝি। পাঁচীলটায় ফাটল ধরবে যে। একটা ফুল ফোটানোর মুরোদ নেই, অমন গাছ থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

কঠিনকণ্ঠে শান্তি জবাব দেয়। 'গাছটা তোমাদের বাড়িতে বড় বেশী জায়গা জুড়ে বসে আছে, না বৌদি?'

মুখে উত্তর দিতে না পেরে মনে মনে গর্জায় সুধা। 'মরণ আর কি। কী কথার কি জবাব! হবেনা, আঁতে ঘা লেগেছে যে। যেমন গাছটা তেমনই সে নিজে।'

কিন্তু হঠাৎ একদিন এবাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকে অবাক করে দিল কাঠচাঁপা গাছটা।

সংসারে অঘটনও ঘটে। অসম্ভবও সম্ভব হয় বই কি।

ঝুপ ঝুপ করে কদিন বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এতগুলো বছর পার করে দিয়ে গাছটা হঠাৎ যেন তার বার্দ্ধক্যের খোলস খুলে ফেলে নতুন করে জন্ম নিল।

দেখতে দেখতে প্রথম যৌবন আসা কুমারী মেয়ের মত ওর সমস্ত শরীরে উচ্ছ্বসিত যৌবনের ঢল নামল। সুঠাম সুন্দর সতেজ হয়ে গেল কাণ্ড ডাল-পালা। চকচকে ঘন সবুজ পাতায় ভরে গেল ওর সর্বাঙ্গ। আকাশের দিকে দুহাত বাড়িয়ে সমস্ত শরীরটাকে মেলে ধরে ও দাঁড়িয়ে রইল পূর্ণ যুবতী গরবিনীর মত। হাওয়া আর আলোর সঙ্গে সমস্তদিন প্রেমের খেলা খেলতে সুরু করল নববধূর মত।

আর সেই সঙ্গে ওর সর্বাঙ্গ ভরে গেল অজস্র কুড়িতে। সেই কুড়িগুলি দলমেলে ফুল হল। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ফুল আর ফুল। চোখ জুড়োনো মন ভরানো নয়নাভিরাম অপূর্ব দৃশ্য! আবেশমদির মধুর সৌরভে শান্তিদের বাড়িখানা ভরে গেল। সুরু হল মৌমাছি প্রজাপতিদের আনাগোনা।

খুশী হয়ে মা বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল। আমার ঠাকুর এতদিনে নিজের ফুলের জোগাড় নিজেই করে নিলেন। এবার থেকে ঠাকুরের পায়ে দুটো ফুল দেওয়া যাবে—মনের সাধ মিটিয়ে।

ভাইপো ভাইঝি দুটো খুশীতে চেঁচামেচি করে রোজ ফুল কুড়োতে সুরু করল। ঘরের টেবিল ফুলদানি বোঝাই হল। মালা গাঁথতেও ভুল হলনা ছোট্ট ভাইঝিটার।

আর হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল শান্তির, নিভৃত বারান্দার কোনে দাঁড়িয়ে দুই ছেলে মেয়ের মা সুধার মাথার ঘোমটা খুলে তার দাদা হাসি মুখে তার মাথায় ফুল গুঁজে দিচ্ছে।

কাঠচাঁপার ফুল!

শেষ পর্যন্ত শুকনো কাঠ কাঠচাঁপাটাও কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করল শান্তির সঙ্গে।

'কেটে ফেল, কালই সকাল বেলায় কেটে ফেল গাছটাকে। মাগো মা মা কী ঝাড়ই হয়েছে! জলে কাদায় শুকনো পাতায় ফুলে সারা উঠোনটা থই থই। কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। ঘেন্নায় মরে যাই। এতবড় একটা রাক্ষুসে বিরাট গাছ হবে জানলে আমি কবে ওটাকে কেটে ফেলতাম। মা,

কাল সকালেই গাছটাকে কেটে ফেলার ব্যবস্থা কর। উঠোনটা পরিষ্কার হোক।'

শান্তির বিধবা মা আকাশ থেকে পড়েন। 'অমন কথা মুখেও আনতে নেই শান্তি। ছেলে পুলের ঘর, গেরস্থ বাড়ি। ভরন্ত পুরন্ত ফলন্ত গাছ কি হুট বলতে কাটতে আছে মা? এতকাল অফলা বাঁজাকাঠ হয়েছিল তুই মায়া করে কিছুতেই কাটতে দিসনি। আজ ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে, অমন গাছে হাত দেওয়া যায় কখনো? অমন গাছটাকে প্রান ধরে কাটা যায় কখনো? মানুষে পারে?

'না যায় না।' শান্তি ক্ষেপে রেগে মায়ের মুখের ওপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠে; 'তোমরা না পার, আমার গাছ, আমি পুঁতেছি আমিই কাটব। পাপ হয়, অকল্যাণ হয়, আমারি হবে। আগে রোগা ডিগডিগে শুকনো কাঠ ছিল। এখন কি অবস্থা হয়েছে ওর চোখে দেখতে পাও না? সারা বাড়ি জুড়ে বসে আছে গাছটা। জলকাদা, না আলো না রোদ্দুর, এভাবে থাকা যায়? বাড়ির মধ্যে এত অসুবিধে সহ্য করা যায় না একটা বাজে গাছের জন্যে।

'তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে ঠাকুরঝি? রান্নাঘর থেকে সুধা হেসে ওঠে বয়সে বড় ননদের অনভিজ্ঞতায় অজ্ঞানতায়। 'ফলন্ত গাছ কাটতে নেই, একথা কেনা জানে? এ গাছের ফল হয় না, ফুলগুলিই ওর ফল, সন্তান। জাননা বুঝি?'

নাঃ। গাছটা কাটা হল না। শান্তির হিংস্র ক্ষুধিত দৃষ্টির বিষে জর্জরিত হয়েও অনড় অটল হয়ে সমস্ত উঠোন জুড়ে ফুলের সজ্জায় শরীর সাজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাথা উঁচু করে।

নতুন যৌবনের, ফুল ফলানোর অহঙ্কারে বেপরোয়া অহঙ্কারী উদ্ধত রমনীর মত।

শুধু বর্ষায় নয়। শরতেও নয়। প্রত্যেক ঋতুতে ও রঙ্গ বদলাতে সুরু করল।

শীতে পাতা ঝরিলে রিক্ত হল। আবার দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে নতুন করে ফুলের সাজে সাজতে বসল। নির্লজ্জ বেহায়া অভিসারিকা নায়িকার মত।

কোন হাত আর এগিয়ে এলোনো ওকে নির্মূল করবার জন্যে।

কারু চোখের বিষাক্ত হিংস্র দৃষ্টি আর ওর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করল না। আগুন ঝরাল না ওর সমারোহের দিকে তাকিয়ে।

যে শ্রীহীন কুরূপা মেয়েটা একদিন ওকে কোথা থেকে কুড়িয়ে তুলে এনে নিজের হাতে উঠোনের এককোনে যত্ন করে পুঁতেছিল এ বাড়ি ছেড়ে সে চলে গেছে চিরদিনের জন্যে।

এ বাড়ির কেউ আর তার নাম উচ্চারণ করে না।

করবেই বা কেন?

বংশের মুখে চুন কালি দিয়ে, বাড়ির লোকগুলোরে মাথা হেঁট করিয়ে দিয়ে, পাড়ার লোক হাসিয়ে, কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত করে কুলীন বামুনের মেয়ে হয়ে, শিক্ষিত, অভিজাত ঘরের মেয়ে হয়ে সে মেয়ে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে চলে যায় একটা নীচুজাতের কায়স্থ, একটা গাড়ি সারানোর মিস্ত্রির হাত ধরে তাকে বিয়ে করে ঘর সংসার করে।

তার নাম কি কেউ উচ্চারণ করতে পারে?

শুধু সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে শান্তির মায়ের অবাধ্য দুটো চোখ ওই কাঠচাঁপা গাছটার ওপর স্থির হয়ে থাকে। আর জলে ভরে ওঠে।

সেকি লজ্জায়? অপমানে? গ্লানিতে? দুঃখবেদনায়?

না হৃদয়ের গভীর গুহা থেকে বেরিয়ে আসা একটা অব্যক্ত পরম পরিতৃপ্তিতে—সান্ত্বনাতে—আনন্দে—স্বস্তিতে—? কে জানে?

কালো দুটি চোখ

হাসি ভট্টাচার্য্য

কাজল মেঘের কালো দুটি চোখে কত না সৌন্দর্য্য। এই কালো চোখকে ঘিরে কত কাব্য, কত গান এবং কত না স্তুতি-বন্দনা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলিতে এই কালো চোখ নিয়ে কী স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা। সত্যিই চোখ দুটী যদি সুন্দর না হয়, তাহলে মেয়েদের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। হরিণের মতন আয়ত নেত্র, তা যদি কাজল কালো হয় তবে তার দিকে কে না বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে দেখে? শাস্ত্রে বলে সর্ব দোষ গায়ের রংই ঢেকে দেয়; কথাটি কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে 'কালো মেঘের কালো দুটি চোখ।' অর্থাৎ দুটি কালো চোখই মেয়েদের সব স্বরূপ ঢেকে দিতে পারে।

তাই রূপচর্চায় চোখের পরিচর্যা বিশেষ দরকার।

চোখ দুটি যাতে সুন্দর সুশ্রী দীঘল টানাটানা এবং ঘন কালো হয় তার দিকে আগেকার দিনের মেয়েরা বিশেষ নজর দিতেন। আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মা, জ্যেঠি—এঁদের এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁরা নবজাত নাতনী, কন্যাদের চোখে বাড়িতে মনসা পাতার তৈরী কাজল লাগাতেন। তাঁদের ঘরে ঘরে কচি কলা-পাতায় তৈরী করা কাজল কাজল-লতায় সযত্নে রক্ষিত হত। বিয়ের কনের হাতে কাজল লতা হয়ত তারই প্রতীক।

কাজল শুধু যে চোখকে স্নিগ্ধ রাখে, চোখের বর্ণকে উজ্জ্বল করে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তা নয়, কাজলের উপকারিতা আরো অনেক। চোখে ঠাণ্ডা লেগে চোখ ফুলতে পারে, চোখ উঠতে পারে, কাজল তার প্রতিষেধক। কাজল চোখের জ্যোতিকেও বাড়ায়।

সেকালে ড্যাবডেবে কাজল লাগান্ হত মেয়েদের চোখে শিশুকাল থেকে। বড় হলে যাতে কাজল কালো স্বাভাবিক ভোগ হয়,—চোখের

দৃষ্টিশক্তি যাতে বাড়ে,—বাইরের ধুলো বালি যাতে চোখের দৃষ্টিকে নষ্ট করতে না পারে।

এ কালে কাজলের প্রচলন কমেনি। কিন্তু কাজলের উপকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে মোটা করে কাজল লাগানোর প্রথা নেই আর। এখন মেয়েদের সুক্ষ্মতার দিকে দৃষ্টি, তাই 'অঞ্জন আঁকো নয়নে'—সৌন্দর্যের জন্যে শুধু রূপচর্চার খাতিরে আধুনিক কালের কাজল ব্যবহার। আর সে কাজল ঘরের তৈরী নয়। ঘরের তৈরী কাজলে ভেজাল কিছু থাকত না। আজ কাল সে শ্রমটুকু করতে আমরা নারাজ। তাই কাজলের সত্যিকারের উপকারিতা থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে হয়।

আগেকার রূপচর্চ্চার আপাতকালীন সৌন্দর্যকে বড় করে দেখা হোত না। চোখে ঘন কাজল, কপালে কাজলের বড় টিপ—এখন সুক্ষ্মতায় চোখ, কপাল এবং ভ্রূযুগলে ব্যবহৃত। এতে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের তুলনায় কৃত্রিম সৌন্দর্য্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

চোখে অবশ্য সূক্ষ্ম কাজলের রেখা, কপালে ছোট এমন কী বড় কাজলের টিপও মানানসই করে দিতে পারলে ভালোই লাগে; ভ্রূযুগলের ওপর কাজলের প্রলেপ ও ক্ষেত্রবিশেষে সৌন্দর্যকে বাড়ায়; কিন্তু ভ্রূযুগল কামিয়ে কাজলের প্রলেপ আমার মতন অনেকের চোখেই দৃশ্যকটু।

চোখের জন্যে আরো কিছুটা সচেতনতার দরকার। আগেকার দিনের মেয়েদের পড়াশুনার জন্যে চোখের পরিশ্রম খুব বেশি ছিল না, গৃহস্থালী কাজে চোখের যে পরিমান পরিশ্রম হত—তা পূরণ করত প্রকৃতির গাছপালার দৃশ্যস্পর্শ, অবগাহন স্নান, সুনিদ্রা প্রভৃতি। এখন মেয়েদের ঘরে বাইরে কাজ। রাত্রি জাগরন, অনিদ্রা, তার ওপর পথঠাসা ভিড়। শহরে তো কথাই নেই, গ্রামেও স্নিগ্ধতার অভাব। প্রকৃতি আজ চোখ থেকে সরে গেছে। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো নেই। সর্বত্রই তীক্ষ্ণতা। আর এরই জন্যে সত্যিকারের কাজল কালো চোখের অভাব।

এ-অভাবকে মেটাতে চোখের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধি করতে তাই দরকার যতটা সম্ভব চোখকে বিশ্রাম দেওয়া, বিশুদ্ধ কাজল এবং মাঝে মাঝে পদ্মমধু ব্যবহার, চোখে খুব ঠাণ্ডা জলে কিংবা ভালো কোন আই-লোশন দিয়ে অথবা গোলাপ জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে চোখ ধোওয়া।

শ্যামলশ্রী গাছপালা, নরম ঘাস এবং নির্জন প্রকৃতির দিকে সময়মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা। চোখের জন্যে মাছের মাথা নাহোক টাটকা কুচো মাছ যাতে ফসফরাস আছে খাওয়া।

চোখ হচ্ছে মেয়েদের সৌন্দর্যের আসলরূপ। সেই রূপের প্রতি আকর্ষণ যুগে যুগে। সেইরূপের স্তব বন্দনায় কবির কাব্য—'কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুটা পিয়ে, হৃদয়ে দিয়ে হৃদি অনুভব।'

* * * *

"গৃহসজ্জা থেকে আরম্ভ করে নিমন্ত্রন উৎসবাদি পর্য্যন্ত ঘর গৃহস্থালীর সকল বিভাগেই বিদেশীয়ানার ছাপ দেখা যায়। তবে আগেকার সেই দোটানা দো-আশলা ভাব এখন অনেকটা পরিণত পারিপাট্য এবং ঐক্য লাভ করেছে এই যা তফাৎ।"

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

মানুষের ধর্ম আছে, সমাজ আছে, রাষ্ট্রনীতি আছে, সচেতন ও অবচেতন আত্মা আছে তার যে কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, মানুষের, সমাজের, দেশের, দশের স্বরূপটী তুলে ধরলেই একটী সুন্দর আদর্শ প্রবন্ধ রচনা সার্থক হয়।

খুসীকরণের খাতা

লীলা মজুমদার

শীত যে আসছে সে বিষয় আশা করি কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই ? হোতে পারে যে গায়ে ঘাম হয়, পাখা চালাতে হয়, মানে ইয়ে গরম লাগে ; কিন্তু তার মানে নয় যে শীত আসছে না। সকাল বেলায় দস্তুর মত কুয়াশা হয়, হয়তো সত্যিকার কুয়াশা নয় ; হাজার হাজার উনুন ধরানো ধোঁয়া এক হোয়ে শূন্যে পেতে থাকে। কিন্তু সেই তো যথেষ্ট প্রমাণ যে শীত এল বলে। কাজেই শীত নয়, বললেই তো আর হবে না। এখন শীত না পড়তে শুরু করলে, পৌষ মাঘে লেপ-কম্বলগুলো গায়ে দেবো কি করে ? তাছাড়া গত বছর আমরা অনেকে নতুন আলোয়ান কিনেছি, সেগুলো ব্যবহার না করলে, আমাদের লোকসান হবে না বুঝি ? আমাদের লোকসান মানেই যে দেশেরও ক্ষতি একথা আজ কেনা জানে ? কাজেই বুঝতেই পারছেন শীত পড়া দরকার। শীতকে ওরকম অস্বীকার করলে চলবে না।

এখন আমাদের ভাগ্য আমাদের যখন যেরকম অবস্থাতেই ফেলুক, সেই অবস্থাটি উপভোগ করাই আমাদের কর্তব্য। কাজেই এই যে শীত পড়া দরকার, এটা থেকেও আনন্দের ব্যবস্থা করতে হবে। আনন্দ না হোক্, নিদেন আরামের ব্যবস্থা তো করা যায়।

আরেকটু শীত যখন পড়বে, তখন ঐ সম্পূর্ণ আরামটি পেতে হোলে, দুটি জিনিসের প্রয়োজন হবে। তার প্রথমটী উপভোগ করতে হোলে, একটু পাহাড়ে-টাহাড়ে যেতে পারলে ভালো, কারণ একটু বেশী শীতের দরকার। বুঝি অবিশ্যি সবই, এখন যে পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সে আমি জানি। তাছাড়া আবার খরচ-খরচা কোরে শিমলে দার্জিলিং যাবে ? তা হোলে এদিকে যদি বেশী শীত না-ই পড়ে, তবে কি ঐ প্রথম ব্যবস্থাটা করা যাবে না ?

আমাদের দেশের পণ্ডিতরা বলেন এমন কোনো অবস্থা নেই, যার ব্যবস্থা করা যায় না। আর শুধু পণ্ডিতরা কেন—তাঁরা যে অনেক অদ্ভুত কথাও বলেন সে আর কে না জানে?—আমার দিদিমার হাতে লেখা খুসীকরণের খাতাতেও ঠিক ওকথা না হোলেও পুরোন কথা দিদিমা কষ্ট কোরে লিখবেনই বা কেন—ঐ ধরনের কথা লেখা আছে?

না-ই বা পড়ল শীত, শীত পড়েনি বলে আমরা শীত নিবারণের ব্যবস্থা-গুলোও উপভোগ করব না নাকি! কেন, মানুষের কি হাত পা কামড়ায় না? তা হোলেই চলবে, বেশী শীতের অপেক্ষায় থাকার দরকার হবে না।

বলুন তো কি আরামের কথা। সারাদিন খেটে খুটে, বেশী রাত কোরে খেয়ে-দেয়ে, শোবার ঘরে ঢুকে দেখলেন গা ঢাকা চাদরের তলায়, পায়ের দিকে একটা বেশ বড় ঢিব্‌লি হোয়ে রয়েছে। শীত উপভোগ করতে হোলে গরম জলের ব্যাগের মতন আর আছে কি? একটা খুব নাম করা ইংরেজি বইতেও ঠিক এই কথাই লিখেছে। বাস্তবিক, শীতটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে হোলে, শীত পড়বারও দরকার হয় না, একটু হাত পা কন্‌কন্‌ করলেই হল। অবিশ্যি সবার যে সব সময় হাত পা কন্‌কন্‌ করে না, এও ঠিক। অনেকের কপাল এমনি মন্দ যে ব্যথা-ব্যামো আরাম হবার সুখটুকু থেকে পর্যন্ত তারা বঞ্চিত।

তবে সে রকম মনের জোর থাকলে, ব্যথা-ট্যথারও দরকার নেই, খানিকটা মন খারাপ হোলেও চলে যায়। এটা তো সব সময় মানুষের হাতের মধ্যেই থাকে। এমন দুটো চারটে বিষয় আছে, যে কথা ভাবলেই মন খারাপ হোয়ে যায়। তা হোলেই হোল, ঐরকম একটু ভেবে নিয়ে, গরম জলের ব্যাগ নিয়ে শুতে যাবেন। এমন আরাম কম আছে। তবে একটা বিষয় সবাইকে সাবধান কোরে দেওয়া দরকার। বেশ হিসেব মতন মন খারাপ করতে হবে, আবার বেশি বাড়াবাড়ি কোরতে গিয়ে যদি মন ছেড়ে মেজাজও খারাপ হয়, তাহোলে কিন্তু সব আরাম মাটি!

সে যাক্ গে, প্রথম উপায়টি বলতে গিয়ে, দ্বিতীয়টির কথা ভুলেই যাচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি দিদিমার খুসীকরণের খাতাতে প্রথমটার বিষয় খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে—'উপায়টি বড় শক্ত ঠেকিবেক্ যেহেতু বোতল দিয়া বানা', —বানা মানে যে তৈরী, সেটা বুঝেছেন

নিশ্চয় ? অর্থাৎ কি না গরম জলের ব্যাগের সেকালে অত চল ছিল না, ওঁরা সোডা বোতলে গরম জল পুরে নিতেন। তা শক্ত ঠেকবে না ? তার আবার গলার কাছে একটা কাঁচের গুলি নড়বড় করত। মানে বোতলের গলার কাছে, দিদিমাদের না। বোতল নড়াচড়া হলেই সেটা কল-কল করত।

দ্বিতীয় উপায়টার একটা মুস্কিল হোচ্ছে যে আগে উটি সতেরো টাকা দিয়ে যেখানে সেখানে কিনতে পাওয়া যেত। এখন আর চোখেই দেখা যায় না। তবে তৈরী কোরে নেওয়া যায়। জিনিসপত্রগুলো জোগাড় হোলে তৈরী কোরে নেওয়া এমন কিছু শক্তও নয়। জোগাড় কোরতে গিয়ে হয়তো বা একটু পারিবারিক ভুল বোঝা কি অশান্তিও ঘটতে পারে। তবে তাকে তো আর ভয় কোরলে চলবে না। অল্প শীত উপভোগ করবার এই দ্বিতীয় উপায়টার সুবিধে হোচ্ছে যে ওর জন্য পয়সা খরচা কোরে পাহাড়ে যেতে হবে না, গায়ে-হাত-পায়ে ব্যথা পাকাতে হবে না, কোথাও যেতেও হবে না, ঘরে বসেই হোয়ে যাবে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে জিনিষটা তৈরী করা উপলক্ষ্যে বাড়িতে বাড়িতে এই ধরণের কথা বার্তার একটা পরিবেশ তৈরী হোতে পারে :—

পুরুষকণ্ঠ—(নাক টানতে টানতে) আচ্ছা আমার রাতে গায়ে দিয়ে শোবার রেশমী চাদরটা কোথায় বলতে পার ?

নারী—শীত পড়ি পড়ি করছে বলে ওটা আমি নিয়েছি।

পুরুষ—গরমের সময় না নিয়ে এই শীতের সময়টাতে নিলে ? ঠাণ্ডা লেগে আমার সর্দি করবে না ?

নারী—বলছি, সেই জন্যই নিয়েছি। সর্দি করবে বলেই নিয়েছি।

পুরুষ—(অবাক হোয়ে) সর্দি কোরবে বলেই নিয়েছি ? কেন, আমার সর্দি হোলে তোমার কি সুবিধেটা হবে শুনি ?

নারী—আরে আমার সুবিধের জন্য কি আর নিয়েছি ? যাতে শীতে কষ্ট না পাও, তাই সময় থাকতে ওটা দিয়ে একটা বালাপোষ বানিয়ে ফেলব বলে নিয়েছি।

পুরুষ—(আরো আশ্চর্য হোয়ে) ঐ পুরোনো চাদরটা দিয়ে একটা বালাপোষ বানাতে পারবে ? আশ্চর্য ! তা সেটি কবে হবে ?

নারী।—তোমার দিদির গরদখানি একটু ছিড়লেই হবে।

পুরুষ—বাঃ। এতো খাসা ব্যবস্থা! আমার শীত লেগে সর্দি করবে বলে, আমার গায়ের কাপড়টি সরিয়ে রেখে, আবার এখন দিদি বেচারির গরদখানি ছেঁড়বার তালে আছো!

নারী।—আহা, আমি ছিঁড়ব কেন—অবিশ্যি আঙ্গুল দিয়ে আচমকা একটু টান দিলেই ছিঁড়ে যে যাবে সে আমি জানি—একেবারে একটুও না ছিঁড়লে আমি নিই-ই বা কি করে? আর উনি দেবেনই বা কেন? আর কটা দিন অপেক্ষা কর লক্ষীটি, তুলোটুলো সব কেনা আছে, এখন ঐটি পেলেই হয়। খুববেশী দিনও অপেক্ষা করতে হবে না; বলে কয়ে দিদিকে রাজী করিয়ে, একবার ওটাকে পান্নালালের কাছে যদি কাচতে দিতে পারি, তবেই আর পায় কে! তবে একেবারে ফালা ফালা কোরে না আনে, এই হোল ভয়!

পুরুষ—(জোরে জোরে নাক টানতে টানতে) বেশ, খুব ভালো ব্যবস্থা! এখন কথা হোল তদ্দিন আমি করি কি?

নারী—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে! তদ্দিন আমার ঐ দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা করে দিই, কেমন? একটা গরম জলের ব্যাগে—ওকি, চলে যাচ্ছ যে!

যাইহোক সে তো রেগে মেগে গেল চলে! অথচ দুপিঠে দেবার দুখানি রেশমি কাপড় না হোলে বালাপোষ হয় কি কোরে? নতুন রেশমি কাপড় দিয়েও যে হয় না তা নয়, তবে সে আর দিচ্ছে কে? পুরোনই দিতে চায় না! রেশমি কাপড় দিয়ে করা এই জন্যে যে নরম ও হবে, আবার টিকবেও বেশী। অন্য কাপড় হলে আবার দুটো শীতও চলবে না, তা হোলে মজুরী পোষাবে না। এবার তা হোলে ব্যাপারটা খুলেই বলি।

সেকালের বালাপোষগুলি পাতলা নরম সুতির হোত। সুন্দর ধূপছায়া রংএর, দু'পিঠ দু'রকমের। চকচকে পাড় লাগানো থাকতো চারদিক ঘুরে, তাও দু'পিঠে দু'রঙ্গের। মাঝখানে পাটখানা এক পরথ তুলো দেওয়া থাকত। মিহি কোরে একটু লেপের সেলাই দেওয়া থাকত, তুলো যাতে সরে না যায়।

দেখতেও ভারি বাহারে হোত, আবার গায়ে দিয়েও আরাম ছিল, নরম, হাল্কা। গায়ে দিয়ে বেড়ানোও যেত, আবার অল্প শীতে গা ঢাকা দিয়ে শোয়াও যেত।

তবে একটা অসুবিধে এই যে ময়লা হোলে কাচানো মুস্কিল ছিল, তুলো সরে যাবার ভয়ে। অবিশ্যি দোকানে দিয়ে শুক্‌নো পরিষ্কার করানো চলে।

এখন বালাপোষ করতে হোলে তুলোও দেওয়া যায়, কিম্বা মাঝে আরেকখানি পুরোন রেশমী কাপড় দেওয়া যায়।

কাপড়গুলি একটার ওপর একটা সমানভাবে পড়া চাই, যাতে ভাঁজ না থাকে। চারদিকে সেলাই হোলে, মাঝে একটু পাৎলা সুতো দিয়ে অল্প লেপের সেলাই দিলে ভালো, যাতে পরেও কাপড় না সরে।

ভালো কথা, মাপের বিষয় কিছু বলা হোল না। বালাপোষখানি বেশ লম্বায় চওড়ায় মাপসই হোলে তবে সে না আরাম? যদি দু'খানি ১১ হাত কাপড় নেওয়া যায়, তাব বালাপোষ হবে ৫২ হাত লম্বা, আর শাড়ির দেড় বহর চওড়া।

তার মানে গোড়ায় শাড়িটাকে দুই অর্দ্ধেক করে কেটে নিতে হয়। একটা অর্দ্ধেক লম্বা লম্বি দু ভাগ করে নিয়ে, অন্য অর্দ্ধেকটার সঙ্গে লম্বালম্বি যুড়ে দিলেই দেড় বহর চওড়া আর ৫২ হাত লম্বা পাওয়া যায়।

পাড় বাদ দিয়েই ভালো, নইলে একটু শক্ত ঠেকবে। তবে ছাপা পাড় হোলে আলাদা কথা। এই হোল নিয়ে বালাপোষ তৈরী।

অ্যাঁ, কে?

পুরুষ কণ্ঠ—পাশের ঘর থেকে আমি সব শুনেছি। কই, দাও আমার গায়ে ঢাকা চাদরটা। বেঁচে থাক্ আমার তসরের চাদর।

মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট

জয়ন্তী সান্যাল

এতদিন সচরাচর বাংলাদেশে মেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের বড় বেশী দেখা যায় নি। এখন দুএকজন করে এই লাইনে ভীড় করছেন। এখন মোট আটজন বাঙালী মেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আছেন, তাদের মধ্যে চারজন আই-এ-এস।

পাঞ্জাব, কেরালায় মহিলা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পাঞ্জাবে ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস পদে একজন মহিলা ছিলেন—কেরালায় হাইকোর্টে মহিলা জজ আছেন—বাংলাদেশে এখনও তা হয়নি।

বাংলাদেশে মেয়েরা এক্সিকিউটিভ লাইনে এতদিন বেশী আসেন নি তার কারণ একটা হতে পারে খুব বেশী টুর করা মেয়েদের একটু কঠিন হয়ে পড়ে। এই লাইনে সার্ভে-সেটেলমেণ্ট, সিভিল ডিফেন্স প্রভৃতির নানা কষ্টসাধ্য ফিল্ড ট্রেনিং দেয়, হঠাৎ করে মেয়েদের করতে একটু অসুবিধে; কেননা ছোটবেলা থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা কোলকাতার স্কুলে বা কলেজে খেলাধুলো করার কতটুকু সুবিধে পায়। একে তো পার্কে, স্কুলে কোন খেলার মাঠ নেই তারপর খোলা জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করতে মেয়েদের সঙ্কোচ ঠিক তাদের শরীরটাকে এই লাইনের উপযোগী করে তোলে না। মেয়েরা শিক্ষিকা, প্রফেসরবৃত্তি গ্রহণ করে আসছেন এজন্যে যে এটা অনেকটা সহজ বাঁধাধরাগৎ ধরে চলে আর স্কুলে-কলেজে পড়ানোতে ছুটি-ও অনেক বেশী।

এক্সিকিউটিভ চাকুরীতে এমারজেন্সীর জন্য সবসময় তৈরী থাকতে হবে। বেশী বর্ষায় নদীগুলো অত্যধিক স্ফীত হয়ে বাঁধ ভেঙ্গে কোনখানে বন্যা দেখা দেয় তখন এস-ডিও, বি-ডিও বা সদর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অফিসার-গুলোকে চাল, ডাল, কাপড়, তাঁবু নিয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গিয়ে রিলিফ, আশ্রয় ও ত্রাণকার্য্য করতে হয়। এই সময় এই চাকুরীতে নিজেদের দিকে

তাকাবার এতটুকু ফুরসুত হয় না। ৬৮ সালের ভয়াবহ জলপাইগুড়ি বন্যার তাণ্ডব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ঐ সময় রাইটার্স বিল্ডিং-এ মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ করে বহু উলের জামা বোনা, জামাকাপড় ও সেগুলো বন্যা-উপদ্রুত অঞ্চলে দ্রুত সরবরাহ কাজে ব্যস্ত থেকেছি।

তারপর আছে দাঙ্গা, সেসব সময়ের জন্য আমাদের সবসময় তৈরী থাকতে হয়। তারপর ধরুণ চীন আক্রমণ বা ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মিলিটারী বিভাগের মত আমাদের অসামরিক কর্তৃপক্ষকে ঠিকসময়ে সাইরেন, ট্রেঞ্চে ঢোকা এইসব ব্যাপারে জনসাধারণকে সাহায্য করতে হয় ও ফার্ষ্ট এডের ব্যবস্থা করতে হয়।

এক্সিকিউটিভ লাইনে আবার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজ করার সুবিধে ও ক্ষেত্র প্রসারিত। বিচারবিভাগে জুভেনাইল কোর্টে শিশু ও কিশোরদের অপরাধ মনস্তত্ব মেয়েদের মন দিয়ে বিচার করা সহজ। দোষীর দিকে জোর না দিয়ে দোষ ও তার নানাবিধ কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলে সমস্যাটার সমাধান হতে পারে। আমি জানি প্রবেশন অ্যাক্টে ধৃত শিশু অপরাধীদের বিচারে একজন মহিলা নিয়োজিত আছেন। তারপর বালক ও বালিকাদের তত্বাবধানের ভ্যাপরেন্সী অনাথ হোমগুলো লিলুয়া, কলকাতা, অন্যান্য স্থানে সোস্তাল ওয়েলফেয়ারের মেয়ে-অফিসাররা পরিচালনা করেন। ওখানে তাদের হাতে কলমে শিক্ষা, সেলাই প্রভৃতি করে কার্য্যক্ষম করার চেষ্টা হয়।

ক্রমে মেয়েরা নূতনত্ব ও অ্যাডভেঞ্চারের মোহে এই লাইনে আরো আসবেন। কাজের অসুবিধেগুলো দূর হবে তাদের কল্পনাপ্রসূত মনকে কাজে লাগিয়ে ও adjust করার সহজাত প্রতিভাবলে। আর সেদিনও বেশী দূর নেই।

বাংলার মেয়ে সমাজ সেবী সরলাদেবী চৌধুরাণী

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

ইংরেজী ১৮৭২ সালে কোল্‌কাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে সরলাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জানকীনাথ ঘোষাল; মাতা সমাজসেবী ও সুলেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী। সরলার স্কুলশিক্ষা আরম্ভ হয় বেথুন স্কুলে; ১৮ বৎসর বয়সে তিনি ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে ঐ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পদ্মাবতী মেডেল দিয়েছিলেন। বাড়ীতে মাষ্টার রেখে তিনি শেখেন পারসি, উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষা। গান বাজনায় ও তাঁর দক্ষতা ছিল। সরলার গান রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগত। প্রথম বয়সে সরলা দেবী স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য মহীশূর ও বরোদা রাজ্যে চাকুরি নিয়ে যান, কিন্তু সেখানে এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হয় ঠাকুর পরিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য।

এই ভ্রমণের সুযোগে সরলা ভারতের নানা প্রদেশের লোকদের স্বাস্থ্য ও সাহসিকতা লক্ষ্য করে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে সে তুলনায় বাঙ্গালী যুবক কত দুর্বল ও তার মা বোনদের মর্যাদা রক্ষায় কত অপারগ। চাকরি ছেড়ে বাড়ী ফিরে এসে তাই তাঁর প্রধান কাজ হলো কিসে বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক দূর করা যাবে। তখন তিনি ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা। সেই সুযোগে তিনি বাঙ্গালী যুবকের সামনে তাদের দুর্বলতাকে তুলে ধরলেন। ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হ'লো বাঙ্গালী যুবকের বীরত্বের কাহিনী। কোন বাঙ্গালী কবে নিজের শক্তি দিয়ে স্ব-জাতীর সম্মান রক্ষা করেছে—কে

করে উদ্ধত গোরাপল্টনকে হাতে নাতে সায়েস্তা করেছে, এ রকম অনেক চিঠিই ভারতীতে প্রকাশিত হতে থাকল। বাঙ্গালী যুবক দৈনিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে লাগল। অনেকেই সরলার বাড়ীর দিকে ছুটল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এদের নিয়ে সরলা দেবী কর্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হলেন। এদেরই বলা হ'তো 'অন্তরঙ্গ দল'। উদ্দেশ্য ছিল খুব বড়-সবাই ভারতের মানচিত্র ছুয়ে শপথ করত—দেশের ও দশের সম্মান রক্ষার জন্য তারা সংগ্রাম করবে। সরলা ভগিনী স্নেহে তাদের হাতে 'রাখি' বেঁধে দিতেন। হুমায়ুন যেমন এক রাজপুত কন্যার 'রাখি' গ্রহণ করে তার হয়ে বিপদ বরণ করেছিলেন, ছেলেদের তেমনি তাঁর হাতের এ রাখি যেন মাতৃভূমির জন্য বিপদ বরনের স্বীকৃতি হয়ে দাঁড়াল। কয়েক বৎসর পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই লাল সূতার 'রাখী' বন্ধনই দেশ বিভাগের সমবেত প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সেদিন সবাই 'রাখী' পরেছিল ; সবাই ভাই ভাই,—বাংলা দেশ সবার—সবাই ব্রিটিশ সরকারের কারসাজিতে আপত্তি করছে। ১৯০২ সালে ভবানীপুরের এক যুব সম্মেলনে তাঁরই কথা মত বীরপূজা 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' আরম্ভ হলো। এতে কলিকাতার সেরা সেরা বাঙ্গালী ছেলে যারা কুস্তি, তলোয়ার, বক্সিং ইত্যাদিতে দক্ষ ছিল তারা অংশ গ্রহণ করে। সরলা তাদের উৎসাহিত করলেন পদক দিয়ে। একজন বাঙ্গালী মেয়েকে এই ভাবে এক যুবক—সভা চালনা করতে দেখে দেশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হ'লো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মারফতে প্রতাপাদিত্যকে বাংলার বীর আখ্যা দিতে আপত্তি তুলেছিলেন, কারণ তিনি ইতিপূর্বে 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্যকে পিতৃব্য হন্তা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সরলা দেবী উত্তরে জানালেন যে তাঁর প্রতাপাদিত্য বাঙ্গালী বীর প্রতাপাদিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়—তাঁর অন্যদিক দেখা নিষ্প্রয়োজন। বীর উৎসবের উৎসাহ নষ্ট হলো না। বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রতাপাদিত্য নাটক ষ্টার ও মিনার্ভা থিয়েটারে রাতের পর রাত অভিনীত হতে থাকে। ১৯০৩ সালে সরলা 'বঙ্গের বীর' সিরিজের পুস্তকাবলী প্রকাশ করতে লাগলেন। বীর পূজার নীতি অবলম্বনে পালন করা হ'লো 'উদয়াদিত্য ব্রত'।

এর পর তাঁর দৃষ্টি গেল বাঙ্গালীর একটি জাতীয় উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করবার দিকে। বহুকালের বিলুপ্ত সংস্কার 'বীরাষ্টমী ব্রত' পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ব্যস্ত হলেন। ১৯০৪ সালে দুর্গা পূজার দ্বিতীয় দিনে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। ছেলেদের শরীর ও অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগীতা ছাড়াও এখানে অতীতের বীরদের বন্দনা করে একটি তরবারে পুষ্প দেওয়া হ'লো। সরলা দেবী যে কেবল ব্রত পালন করে তার কাজ সমাপন করেন তা নয়, তিনি মার্তাজা নামে একজন মুসলমান ওস্তাদকে নিজে মোটা মাইনে দিয়ে বাড়ীতে স্থাপিত ছেলেদের ক্লাবে শরীর চর্চ্চা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁর অনুপ্রেরনায় বাঙ্গলার নানাস্থানে ছেলেদের শরীর চর্চ্চার ক্লাব আরম্ভ, তাঁর ওস্তাদও মাঝে মাঝে অন্য ক্লাবে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে আসত। এই সব দলই কালক্রমে 'অনুশীলন দলে' পরিণত হয়। সরলা বাঙ্গলার ছেলেদের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির জন্য স্বাস্থ্য চর্চ্চার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি 'অনুশীলন দলের' বিপ্লবী কার্যক্রমের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি চাইতেন ছেলেরা সরকারী চাকুরির মোহ ত্যাগ করে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। কয়েকটি যুবক 'সুহৃদ সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লো যে তারা গভর্নমেণ্টের চাকরি না নিয়ে নিজেরা একটা বড় রকমের জমি নিয়ে একত্রে স্বহস্তে চাষ আবাদ করবে। পাঁচশত টাকার মূলধনের প্রয়োজনে তারা অনেক নেতাদের কাছে যায়, কিন্তু বিশ্বাস করে সেদিন তাদের কেউ টাকা ধার দেননি। সরলা দেবী তখন তাদের সাহায্যে মুক্তহস্তে এগিয়ে আসেন। সরলার উদার বুদ্ধি, স্বদেশ বাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায় স্বামী বিবেকানন্দকেও অভিভুত করেছিল। স্বামীজী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে ধর্ম প্রচারে যেতে চেয়েছিলেন, ভগিনী নিবেদিতাকে যেমন তিনি প্রাচ্যে প্রতীচ্যের নারীজাতির প্রতীক খাড়া করেছিলেন—সরলাকেও তাঁর সেইরূপ প্রতীচ্যে প্রাচ্যের নারীর প্রতীক প্রতিপন্ন করতে ইচ্ছা গিয়েছিল।

সরলা যে কেবল বাঙ্গালী বীর তৈরী করতে চেয়েছিলেন তা নয়, তাদের দিয়ে তিনি দেশের ঐক্য স্থাপনে স্বচেষ্ট হন। হিন্দু মুসলমানের বিভেদ তিনি মানেন নি। 'হিন্দুস্থান রিভিয়ুতে' তিনি কংগ্রেসী রাজনীতি ও হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। লালা লাজপত রায় প্রমুখ

নেতৃবৃন্দ তাঁর এ প্রচেষ্টাকে খুব তারিফ করেছিলেন। বেথুন স্কুলে যখন হিন্দু ও খৃষ্টান মেয়ে একসঙ্গে পড়বার সুযোগ পেল তখন সরলাদেবী মুসলমান মেয়েরা প্রবেশের অধিকার পায়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন ও সরকারকে-এর জন্য দোষারোপ করেন। সরলাদেবী জাতিভেদের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। হয়ত তাঁর পিতার অনুকরনেই। পিতা জানকী নাথ ঘোষাল এক ডোম বালককে বাড়ীতে রাখেন বাবুরচির কাজের জন্য। সরলাদেবী দেব মন্দিরকে কেবল পূজার স্থান না ভেবে ঐক্যের মিলন ক্ষেত্র রূপে কল্পনা করতেন। তিনি প্রতি গ্রামে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাতে উঁচু নীচু জাতি নির্বিশেষে সকলকে সপ্তাহে একদিন মিলিত হয়ে সার্বজনীন পূজা করতে পরামর্শ দিতেন। এই পূজায় সংগৃহীত অর্থ দিয়ে গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তির সেবায় ব্যায় করার কথাও তিনি বলতেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সরলার দান ও কম নয়। আমাদের জাতীয় গান বন্দেমাতরমের প্রথম দুই পদের সুর রবীন্দ্রনাথ দিলেও বাকী অংশের সুর তাঁরই দেওয়া। তিনি কুটীর শিল্পজাত জিনিষ প্রচলনের জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের' মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতেন। তাঁর চেষ্টাতে দেশীয় কুটীর শিল্পজাত জিনিষপত্র বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সেসনের একজিবিসনে দেখান হয়েছিল, নিপুন কাজের জন্য দেওয়া হ'লো একটি স্বর্ণ পদক।

১৯০৫ সালের ৩৩ বৎসর বয়সে সরলার পাঞ্জাবের রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রামভূজ উগ্রপন্থী রাজনীতিক ছিলেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও চরখা-খদ্দর প্রবর্তনে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন সরলা দেবী। কংগ্রেসের অনুসন্ধান কামটিতে যখন গান্ধীজী পাঞ্জাবে যান তখন তিনি সরলাদেবীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সরলার প্রাণ খোলা হাসি দেখে গান্ধীজী তাঁকে জাতীয় সম্পদ আখ্যা দিয়েছিলেন।

স্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে সরলার দানও কম ছিল না। অল্প বয়স থেকে শিক্ষাকেই তিনি স্ত্রী জাতির মুক্তির পথ বলে মনে করতেন। মহাবোধি সোসাইটির জার্নালের দুই সংখ্যায় তিনি স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে এই লেখা 'বই' আকারে বের হয়। মেয়েদের শিক্ষা কিভাবে হওয়া উচিত তা তিনি বিষদভাবে এতে বর্ণনা করেন। মেয়েদের তিনি সুশ্রুষা বিদ্যা স্কুলে শেখার কথাও এতে বলেছেন।

সামাজিক মেলামেশায় ও নারী-জাতির দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করার ফলে তাঁর মনে আসে নিখিল ভারতীয় মহিলা সংঘ প্রতিষ্ঠার কল্পনা। ১৯১০ সালে এলাহবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মহিলা সম্মেলনে তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠার কথা তোলেন। লক্ষ্য হলো ভারতের স্ত্রী জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি করা।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের মাধ্যমে তিনি লাহোরের পল্লীতে নারীদের জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছিলেন। ৬৭ বৎসর বয়সে সরলার মৃত্যু হয়।

*   *   *   *

সমাজ আজ অনেক বড়, আর তার মধ্যে মেয়েদের সমাজ সমস্যা এবং জিজ্ঞাসায় অঙ্গণের গৃহকোণ ছেড়ে প্রাঙ্গণের বহির্জগতে নিত্য আবর্ত্তিত, এই আবর্ত্তনের জীবন চেতনায় মেয়েদের বক্তব্যগুলি কিছু সমাধানের ইঙ্গিত ধর্মী।

"সহধামণী না সহকামণী"

হিমা মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় পুরুষ তাঁর দৈনন্দিন চণ্ডীপাঠের মধ্যে আবৃত্তি করে চলেন। "ভার্যাং মনোরমাং সেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিণী" সত্যিই বলুনতো যে মানুষ দুটিকে একটি ছাদের নীচে প্রায় গোটা জীবনটাই কাটাতে হবে পরস্পরের মনোমত না হলে বিপদ যা হবে—তার list দিতে গেলে আমার আসল বক্তব্য আর বলাই হবেনা। শুধু কি তাই সুরসিক করিয়াও আবার যোগ দিয়েছেন গৃহিণী-সচিব-সখা-প্রিয়-শিষ্যা-ললিত-কলাবিধৌ ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ শুধু ঘরটি-স্বামীটি সন্তান পরিজনগুলি সামলে সুমলে চললে হবেনা, সচিব অর্থাৎ তাঁকে বুদ্ধি জোগাতে হবে এবং তাঁরা যথানিয়মে সে বুদ্ধি একটাও নেবেন না উল্টোটি করে ঝামেলা বাঁধিয়ে আপনার উপরেই হামলা হবে- "তোমার বুদ্ধিতেই তো এই-হোলো একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"। —সখী অর্থাৎ সিনেমা-থিয়েটারে একসঙ্গে দেখে উপভোগ করতে হবে—টিকিট কেটে যথানিয়মে সেজেগুজে শনিবারের সন্ধ্যায় প্রমোদগৃহে পাশা-পাশি বসবেন আপনারা, তারপর বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে বা কথার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে স্বামীর দিকে ফিরে যখন এই ভাবটি share করতে যাচ্ছেন তখন দেখলেন তাঁর চক্ষু নিমীলিত, সুযোগ পেয়ে তিনি একটু 'নিদ্রাসুখ' উপভোগ করে নিচ্ছেন। আর প্রিয়শিষ্যা অর্থাৎ অফিসে তিনি কি আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে সবকিছু manage করেন, কিন্তু তাঁর পলিসীগুলো সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বুঝেও বোঝেন না, নিয়েও নেন না। সেই পলিসী অর্থাৎ মন্ত্রগুলি আপনাকে আবৃত্তি করে শোনাবেন আপনি যদি অনন্ত ধৈর্য্যশীলা হয়ে দিনের পর দিন সেইগুলি শুনে যান 'প্রিয়শিষ্যা' রূপে স্বামীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পাবেন নচেৎ—

যাক আবার অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। কথা হচ্ছে এককালে সহধর্মিণী হতে পারলেই ঝামেলা চুকে যেত কিন্তু ডারউইন সাহেবের ক্রমবিকাশের নীতি অনুযায়ী ভারতীর ভাবধারাতেও ক্রমবিকাশ দেখা দিয়েছে। সহধর্মিণী হলেই চলবে না সহকর্মিণীও হতে হবে। সহধর্মিণা অর্থাৎ সংসারধর্মটি একত্রে পালন করতে হবে, উভয়ের থাকবে সমান সহযোগিতা। ব্যাপারটা এ পর্য্যন্ত মন্দ ছিলনা কিন্তু সংসারের পরিধি কমে আসাতে গৃহীণীর অবসরটা একটু বাড়লো, সেই সঙ্গে অর্থ নৈতিক দুর্গতি বাড়লো চূড়ান্ত। নানাকারণে আমরা ও ঠিক রন্ধন আর সন্তান পালন এর মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারলাম না। তাছাড়া লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের ঐ দিকটা দেখবার ইচ্ছে কজনেরই বা না হয় বলুন? প্রয়োজন-আর্থিক বা মানসিক আমাদের পুরুষের কর্মের অংশীদার করে দিলো—আমরা বেরিয়ে এলাম কর্মক্ষেত্রে কেউ আইনজীবি, কেউ চিকিৎসক, কেউ শিক্ষক, কেউ বা নানা অফিসের কত রকমের কাজে। তারপর—রাজনীতি, ব্যবসা, শিল্প এসব তো আছেই—

সহধর্মিনী এবং সহকর্মিনী একসঙ্গে দুটো বজায় রাখা মানে নিজেকে ধর্ম্মকর্ম্মটি করে আবার স্বামীর কর্মে সহযোগীতা যারা পারেন তাঁরা আমার নমস্ত। সংসারের পরিধি কমে গেছে বটে কিন্তু ঝামেলাটা হিসেব করেছেন? আয়-ব্যায়র সঙ্গতি নিয়েতো হিম্‌শিম্ খাচ্ছেনই—তার উপরে আছে অর্থ দিয়েও চাল চিনি কেরোসিন সংগ্রহের নিত্যনূতন কলা-কৌশল, ছেলেমেয়ের চতুর্বিধ স্কুল আশ্রমও বলতে পারেন পড়া-গান-নাচ খেলা সবগুলিতে রক্ষীরূপে যাতায়াত গৃহশিক্ষকতা, স্বামীপুত্রকন্যার পোষাক-গুলি সযত্নে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে গৃহরজকিনী—আর কি কি নয় বলুন, সংসার ধর্মটি সুচারুভাবে করতে গেলে আপনার তো wholetime job. এই তো কত ভদ্রলোক অফিসের সহকর্মিনীকে বিবাহ করলেন, দুমাস না যেতেই সংসার ধর্মের চাপে কর্ম্মে ইস্তফা আবার কর্ম বজায় রাখতে গেলে ধর্ম থাকে না। প্রচুর ডাক্তারের স্ত্রী ডাক্তার থাকেন—উভয়েই দেখি পুরোদমে কর্ম করে চলেছেন। দু'একজন ডাক্তার ভদ্রমহিলাকে জানি কর্ম্ম ছেড়ে সংসার ধর্মে পুরোপুরি মন লাগিয়েছেন কিন্তু ষ্টেথিসকোপ পুরোপুরি বাতিল করে আচার-বড়ি ওখানে আপনারা যাই বলুন আমার মনটা কর্‌কর্ করে।

একবার বিখ্যাত হয়ে যেতে পারলে ঝামেলা থাকেনা, আপনার সংসার-ধর্ম নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না কিন্তু পিয়েরকুরী-মাদামকুরী। বা ডাঃ সানইয়াৎ সেন বা মাদাম সেন এর মতো ভাগ্য আর কজনের আছে বলুন? সহকর্মী-সহকর্মিনী রূপে এই দম্পতিরা মহান হয়ে উঠেছেন কিন্তু আমরা এই সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ স্ত্রীরা-আমরা কি করি বলুন তো?

সহকর্মিনী একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করুন আপনার স্বামীর ও আপনার কর্মক্ষেত্রে একই! একই জায়গায় একই সময়ে রোজই যাচ্ছেন আসছেন—একই ধরণের লোকদের মুখ দেখছেন রোজ, একই কর্ত্তার মনস্তুষ্টি করে চলেছেন উভয়ে। আবার বাড়ীতেই সেই একই ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা। দিবারাত্রের কাব্যে আপনাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ও সাহচর্য্য! রাধা কৃষ্ণের তিলেক বিরহে অধীর হয়ে উঠতেন "তিল এক হয় যুগ শত চারি যেন শত যুগ মনে হয়" কাব্যের অর্থাৎ ঐ অতি রোমান্টিক মেলোড্রামাটিক কাব্যের নায়ক নায়িকাদের ওসব পোষায়—আপনার আমার রবিবারের উপর সোমবার ছুটি, দুদিনই গৃহস্বামী গৃহে স্থায়ী হয়ে রইলেন—নট্ নড়ন চড়ন—এতটা আবার ধাতে সয় না, অমৃত কেমন প্লেন চিটে গুড় মার্কা হয়ে যায়।

আপনার স্বামী সাহিত্যিক আপনি নিজে সাহিত্যিক হতেও পারেন নাও পারেন। না হলেও ঐ সাহিত্যিক স্বামীর কিঞ্চিৎ extra ঝামেলা আপনাকে পোহাতেই হবে—যেমন তাঁর লেখার সরঞ্জাম, কাগজ পত্র, পোড়া সিগারেট ছাই, কলমের কালি—সব কিছুই তাঁকে বিব্রত করছে সর্বদা—আপনি যতই যোগাচ্ছেন তাঁর বিরক্তি ততই বাড়ছে, কারণ এলোমেলো না হলে তাঁর সাহিত্য ঘটিত আইডিয়া আসে না আবার কলমে কালি না থাকলেও বা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে emotional upset কদিন ধরে আর লেখা বেরোয়না। এ ছাড়া যাবতীয় কাব্য সাহিত্যের নায়িকাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই কিন্তু কাব্যে উপেক্ষিতা একটি নারীমন এর সন্ধান অনেক সময়েই তাঁর রাখা হয় না। আমার এক দাদা ছোটখাটো সাহিত্যি-কের পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছেন—অফিস করেন অফিস শেষে লাইব্রেরীতে বসে মোটা মোটা বই পড়েন। রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত গুরুগম্ভীর সব প্রবন্ধ লেখেন। আমার বৌদি বিয়ের অনতিকাল পরে দুএকবার সেই সাহিত্যরসের আস্বাদন

করবার চেষ্টা করেছিলেন, পাণ্ডুলিপি কপি করে বা প্রুভ দেখে বা রেফারেন্সের বই যোগাড় করে দারুণ রকমের সহধর্মিণী হবারও সাধনা করেছিলেন, কিন্তু বেচারার বেশিদিন থাক্তে সইলো না। সহকর্মিণী হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে সহধর্মিণীরূপে উদাসীন সাহিত্যিক দাদার বৈচিত্রহীন সংসার তরনীটি ভাসিয়ে তাঁর সাহিত্যসেবা অব্যাহত রেখেছেন। দাদার সাহিত্য সভার মালাটালাগুলো যত্ন করে রাখেন অজস্র সাহিত্যিক বন্ধুকে মিষ্টিমুখে চা দিয়ে আড়ালে তিক্তমুখ করেন। ব্যস-বাকীটা সংসার ধর্ম—।

ভাবুন তো—ওঁরা দুজনেই যদি সাহিত্যিক হতেন? বৌদির মুখে শুনেছি দাদার ঈষৎ সর্দি বাতিকগ্রস্ত, সুযোগ পেলেই পাখা বন্ধ করে দেন। বৌদি বলেন "নাকে-মুখে-পায়ে বিশ-ত্রিশটা মশা কামড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি-এত লেখায় মগ্ন একটা চাপড় মেরেও তাড়ায় না "এই অবস্থায় বৌদিকেও যদি সাহিত্য চর্চ্চা করতে হোতো সংসার তরনীটি নির্ঘাৎ ডুবতো।"

অবশ্য এই একটা case দেখে আপনারা ধরে নেবেন না সাহিত্যিক জায়া মাত্রেই এইভাবে উপেক্ষিতা আস্বাদন। তা'হলে এতদিনে তাঁরা গোটা কয়েক প্রতিবাদ মিছিল বার করে সাহিত্যিক স্বামীর টনক নড়িয়ে ছাড়তেন। সাহিত্য সভার উদ্যোক্তারা যখন স্বামীকে খাতির করে গাড়ীতে করে নিয়ে ফল, ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, সময় সময় অটোগ্রাফও বিতরণ করেন তিনি এসব দৃশ্য দেখে কোন নারীর হৃদয়ে দোলা, চোখে আনন্দাশ্রু না বয় বলুন? তাছাড়া স্বাধীন রাষ্ট্রে সাহিত্যিকের মর্য্যাদা বেড়েছে, তাঁরা স্বীকৃতি পাচ্ছেন অর্থ ও উপাধিভূষিত হয়ে—সুতরাং সাহিত্যিক জায়ার সবটাই লোকসান নয়। এক্ষেত্রে সহধর্মিণীরূপে তাঁকে সংসারে ঝুট্‌ঝামেলা থেকে যতদূর সম্ভব আড়ালে রেখে তাঁর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিলে এবং সহকর্মিনী রূপে প্রুফটা দেখে দিলে বা রেফারেন্স বইগুলো-খাতাপত্রগুলো গুছিয়ে রাখলে আখেরে আপনারই লাভ কি বলুন?

কিন্তু জায়া যদি সাহিত্যিক হন? স্বামী ভদ্রলোক কেমন বোধ করেন জানতে ইচ্ছে করে। অবশ্য আমার জানা সব মহীয়সী সাহিত্যিক মহিলারাই বেশ দুদিক সামলেই চলেন। সংসারের কাজের অবসরে বৃথা আলস্য না করে লেখনীটি নিয়ে বসলেন—সৃষ্টি হল রসোত্তীর্ণ কাব্য-কথিকা-উপন্যাস সমাদর পেলেন পাঠকের, স্বীকৃতি পেলেন সুধিজনের। আবার ওদিকে

স্বামী-সন্তান সময়মতো ভাত জল পেলো, ছেলে মেয়ের শিক্ষা শাসন সুষ্ঠু ভাবে পালিত হল-কোনই ঝামেলা নেই। কিন্তু যদি whole time সাহিত্য সাধনা করতে সুরু করেন এবং যাঁরা বৎসরে তিনটে চারটে উপন্যাস লিখে ফেলছেন—তাঁদের অনেকখানি সময়ই দিতে হয় নিশ্চয়। সংসার এর কাজ যাঁরা করেন তারা জানেন, ঘরে থাকলেই কাজ, একটু সময় বের করাও কত কঠিন! ধরুন আপনাকে সাহায্য করবার জন্য বাড়ীতে অন্য কোনও মহিলা আছেন এবং যেহেতু আপনি বেশ মোটা রকমের দক্ষিণাও পেয়ে থাকেন সুতরাং বাড়ীর লোকেদের মুখ বন্ধ "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো" গোছের রূঢ় মন্তব্য করবার পথটি আর তাঁদের নেই। কিন্তু সাহিত্য ঘটিত আইডিয়া যে হুট্ করেই আসে এবং অনেক সময়ে সাধ্য-সাধনাতেও আসে না এটা আমার মতো অকিঞ্চিতকর সাহিত্যিক থেকে পার্লবাক ইউজেন ও নীল পর্য্যন্ত জানেও না। আপনার স্বামী ট্যুরে বেরোচ্ছেন, দম্‌দমে্ ছুটতে হবে এখনই তাঁর সুটকেশে বাড়তী কাপড়, দাঁড়ি কামাবার সরঞ্জাম, টুথ ব্রাশ টুথ পেষ্ট পুরছেন—হঠাৎ একটা দারুণ গল্পের প্লট এসে গেল আপনার মাথায় আপনার আবার সঙ্গে সঙ্গে না লিখে ফেললে প্লট হারিয়ে যায়—ব্যস এবার প্লট হারিয়ে গেল। দ্বিতীয় বার এই ভুল করলেন না সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখতে গেলেন ফলে আপনার আপনভোলা স্বামী টুথপেষ্টের বদলে মলম দিয়ে দাঁত মাজলেন! তারপর দেখুন ঘাড় গুঁজে কলম পিষে পিষে মাথাকে আইডিয়ার ভারমুক্ত করলেন ওদিকে stiff muscle হয়ে আপনার মাথা আবার ভার হ'ল। আপনি নিজে সাহিত্যিক হন বা সাহিত্যিকের স্ত্রী হন একপক্ষের মাথা ধরেই আছে।

উচ্চস্তরের সাহিত্যিক হলেন ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রীর ঝামেলাটাই বেড়ে চললো। বাড়ীতে থাকলেই লিখবেন, বাইরে বেরোলেই সাহিত্য-সভায় যাবেন। তারপর আসবে ভক্ত ও অভক্ত পাঠকের বিচিত্র পত্রালাপ সেগুলির বেশির ভাগই তাঁর জায়াকে উদ্ধার করতে হবে। মিঠাইওয়ালা যেমন মিষ্টি খায় না সাহিত্যিক পত্নীর ও স্বামীর উপন্যাসটা আগাগোড়া পড়া অবশ্যই হয়ে ওঠেনা—কিন্তু ঐ চিঠিগুলো উদ্ধার বেশির ভাগ তাঁর ঘাড়েই পড়ে। তার মধ্যে দু'চারটে যে অল্পবয়সী কোনো তরুণীর হৃদয়োচ্ছ্বাসে ভরা থাকে না এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন না। কিন্তু স্ত্রীর মুখ অন্ধকার,

চক্ষু রক্তবর্ণ। ভদ্রলোক জন্মেও যে এই পাঠিকাকে দেখেননি এ কথা বারবার হলপ্ করে বললেও স্ত্রী বুঝবেন না উল্‌টে বলবেন... 'সাহিত্য সভা-টভা সব বুজরুকী আসলে—ঐ...ইত্যাদি ইত্যাদি'। বিয়ের অব্যবহিত পরে আরও ঝামেলা স্বামীর সব গল্পের নায়িকাই বাস্তব আসলে ব্যাপার দিল।

অনেক সাহিত্যিক ভদ্রলোকই তবে বড় ঝকমারীর হাত থেকে বেঁচে যান। স্ত্রীকে নিয়ে সাহিত্যিকরা সাহিত্যসভা বা সম্বর্দ্ধনা সভায় বড় একটা যান না, গেলেও ঝামেলা নেই, সাহিত্যিক জায়া স্মিতহাস্যে আগাগোড়া বসে থাকলেই কাজ চলে যাবে বাড়তী একটা ফুলের মালাও পেয়ে যাবেন-কিন্তু এইটে যদি উলটো হোতো? স্ত্রী সাহিত্যিক-তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে, ভক্তবৃন্দ নিয়ে গেছেন-ভদ্রলোকও সঙ্গে গেছেন ব্যস তাঁকে একটি ভাষণ দিতে অনুরোধ। দিতেই হবে—অথচ অফিসে তিনি হোমরা চোমরা, বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইয়ে ছাড়েন কিন্তু বক্তৃতা—তায় আবার স্ত্রীর সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে—তিনি ঘামছেন, ঘামছেন, দরদর করে মাথা বেয়ে, ঘাড় বেয়ে ঘামের ধারা নেমে আসছে গলা ঝেড়ে অনেক কষ্টে বার হচ্ছে "শ্রীমতী দেবী, মানে আমার স্ত্রী—মানে ওঁর সাহিত্য প্রতিভা......"

ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে আমরাও লাল উঠছি অনুরাগে নয় নিশ্চয়ই।

*   *   *   *

"প্রতীচ্যের কাছে সভ্যতা যে বস্তু, আমাদের কাছে ধর্ম তাই। এই ধর্মরক্ষার জন্য আমাদের জীবন বিসর্জন করতে হবে।"

—ভগিনী নিবেদিতা

কেন এই বিচ্ছেদ !

অরুণা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টির আদিম প্রভাতে কল্যাণরূপিণী নারীর শ্রীমূর্তি দেখে কবির কণ্ঠ একদিন ডেকে উঠেছিল। অচঞ্চল শান্তির প্রতীক আর ত্যাগে মন্ত্রপূতা নারীকে দেবতার দূতীরূপে কল্পনা করে লিখেছিলেন—

'ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে তাহারি সন্ধানে তুমি নারী
দু-বাহু বাড়ালে।'

ত্যাগের মহিমায়, অকৃত্রিম সহনশীলতায়, প্রেমের পরিপূর্ণতায় আপনার প্রয়োজনকে বিসর্জন দিতে পারে যে নারী, তিনিই আদর্শ নারী। এই অতি পুরাতন শাশ্বত কথাটিকে বর্তমান জগৎ ভুলেছে। ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। ভুলেছে নারী তার সৃষ্টি কোন প্রয়োজন; ভুলেছে তার নিজের সত্তাটিকে। ফলে নারী ও পুরুষের সমষ্টি যে সমাজ-জীবন তা হয়েছে শ্রীহীন মণ্ডিত।

বর্তমান পারিবারিক জীবনের প্রায় প্রতিগৃহেই নিয়ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসংযত ব্যবহার, অবিশ্বাস ও নিষ্ঠুরতা দানা বেঁধে উঠেছে। দাম্পত্যজীবন ঠিক এর ফলেই অনেকের কাছে ভয়াবহ ও বিষময়। আর এরই চরম পরিণতি বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের আশ্রয় প্রার্থী হয়ে আদালতে ভীড় করা। এ ধরণের মামলা এখন প্রচুর। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত কেউ-ই এ থেকে বাদ পড়েন না। আদালতে দেখেছি বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার বহু কারণের মধ্যে ব্যভিচারিত্ব (adultery) ও নিষ্ঠুর আচরণই (cruelty) প্রধান কারণ হয়ে থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো হিন্দু সমাজে এত যে আনন্দ অনুষ্ঠান দিয়ে ঘেরা বিয়ে, এর কি পরিণতি বিচ্ছেদে।

অবশ্য এ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা দেখব হিন্দু কোডের অন্তর্ভুক্ত বিবাহ বিচ্ছেদের মনোভাব সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মতবাদ থেকে উদ্ভূত নাকি অন্য কিছু। পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখি প্রাচীন যুগেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি ক্রমাগতঃ ঘটতে থাকলে ও শান্তিভঙ্গ হলে বিচ্ছেদ ভিন্ন উপায় থাকতো না যদিও এ বিচ্ছেদ স্বীকৃত লাভ করেছে সে যুগে নানাভাবে। অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ীও এ বিচ্ছেদ ঘটতো। স্মৃতিকারদের মতে ভারতে মেয়েরাও দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করতে পারত নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রে। প্রাচীন হিব্রু আইন, বাইবেল ও অ্যাঙ্গলো মুসলমান আইন থেকে প্রমাণিত হয় প্রাচীন অখৃষ্টান প্রথার মধ্যেও নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সমর্থন লাভ করেছিল। ২৩০০ থেকে ২৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যেও বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। কমনওয়েলথের বিবাহ আইনেও আছে যে ব্রিটিশ কলোম্বিয়া, গায়না ও পূর্ব আফ্রিকাতে পাশ্চাত্য দেশের বিচ্ছেদ আইন প্রচলিত আছে। এ ছাড়া সিংহল, ফিজি, লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, মরিসাস, নিউসাউথ ওয়েলস, নিউজীলণ্ড, রোডেসিয়া, সেন্টহেলেনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ নাইজেরিয়া, ভিক্টোরিয়া ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রাচীনকালে বিচ্ছেদের অস্তিত্ব দেখা যায়। পরস্পরের সম্মতি দিয়ে জাপানেও সে যুগে বিচ্ছেদ আনা যেত। ১৮৬৯ সালের পাশ্চাত্য আইন ও ভারতীয় বিচ্ছেদ আইন অনুসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ আনা যেত ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতার কারণে। ভারতীয় আইনে স্বামী ধর্মান্তরিত হলেও অপর নারীকে বিয়ে করলে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতে পারত। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বিবাহ বিচ্ছেদের মনোভাব প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে জাগরিত ছিল ও এই মনোভাবকে মানুষ স্বীকৃতি দিয়েছে কখন সামাজিক চিরাচরিত প্রথার নিয়মের বন্ধনে অথবা কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে আইনের প্রচলনে।

বর্তমানে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনে বিচ্ছেদের যে সব কারণ দেখানো আছে তার প্রত্যেকটি কতখানি গ্রহণযোগ্য এ বিষয় নিয়ে আইনের

দৃষ্টিতে আলোচনা করার আগে সাধারণভাবে সমাজগত চারটি কারণকেই বিশ্লেষণ করব।

প্রথম কারণটি হলো আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য প্রায় বেশির ভাগ মেয়েকেই ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে হয় ও এর ফলে অবিরত কর্ম করার ফলে তাঁরা এক প্রকার পুরুষসুলভ কাঠিন্যের ভাব অর্জন করেন। কর্ম্মী স্বামীর ক্লান্ত দেহ ও মনে শান্তি, তৃপ্তি ও ভালবাসা দেবার অবসর এদের কোথায়! উপরন্তু বাইরের জগতে নিজের স্থান করে নিতে গিয়ে অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবচেতন মনে গৃহের সম্বন্ধকে এঁরা অস্বীকার করে বসেন। পারিবারিক পরিবেশ ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠে ও সংসারের প্রতিটি কাজে স্ত্রীর সামন্যতম ভুলত্রুটি ও অনেক সময় স্বামীর দৃষ্টি এড়ায় না। আদালতে এক মামলায় দেখেছি এক কর্ম্মী স্ত্রী সংসার ও কর্মক্ষেত্র উভয় দিক রক্ষা করতে গিয়ে স্বামীর কাজে একটু শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। ফলে ক্রুদ্ধ স্বামী নানাভাবে গালি গালাজ করতে থাকলে ও নিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে থাকার ফলে অভিমানী স্ত্রী একদিন বাপের বাড়ী চলে যান উদ্বেগ হতে উদ্ধারের জন্য। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য কোর্টে দরখাস্ত করেন স্বামী। স্ত্রী কিন্তু নারাজ হন। তবে অনেক সময় সৎ পরামর্শ ও উপকারী বন্ধুর সহযোগিতায় অনেকে মিটমাট্ করে মামলা উঠিয়ে নেন।

আধুনিক যুগে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ আছে তা থেকেই আসে নানা ধরণের জটিলতা ও একে কেন্দ্র করেই ব্যভিচারিত্বকে ভিত্তি করে অনেক সময় বিচ্ছেদের মামলা আনা হয়। একবার এক ভদ্রলোক তাঁর চাকুরীরতা স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা আনেন ব্যভিচারিত্বের কারণকে ভিত্তি করে। স্ত্রী এর জন্য স্বামীর ছোট বংশ ও হীন মনকেই দায়ী করে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে দাবী করেন। বিচ্ছেদের অনেক মামলাতেই এই কারণ থাকে।

এবারে দ্বিতীয় কারণটির প্রসঙ্গে আসা যাক্। বর্তমানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র প্রীতির চাপে ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি সাধন ঘটায় ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একত্র সান্নিধ্য বহুক্ষণ সম্ভব হয় ও ফলে মাঝে মাঝে বিবাহিত জীবনে এক প্রকার বিতৃষ্ণার উদ্ভব হয়। যৌথ পরিবার

দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করে না, বরং বর্ধিতই করে। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন করে পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি উচ্চাদর্শ যৌথ পরিবার প্রথার ভিত্তি। এ ছাড়া রক্ষণশীল গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে থাকায় অবিরত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হবারও ভয় থাকে না।

এবারে তৃতীয় কারণটির পর্য্যায়ে বলা যায় অনেকে বর্তমানে বহু ক্ষেত্রেই কোন একটি খেয়ালের জন্য অথবা কোন একটি গুণে অন্ধভাবে আকৃষ্ট হয়ে ধর্ম, জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের বিলুপ্তি সাধন ঘটিয়ে বিয়ে করেন। এতে সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই বাস্তবতার সংঘটে তাঁদের দাম্পত্যজীবনে ভাঙন ধরে। একবার আদালতে দেখেছিলাম এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে এক ধনীর মেয়েকে বাবা মায়ের অমতে বিয়ে করে অল্পদিনের মধ্যেই বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে আসেন। সামান্য আয়ের দ্বারা সংসার চালানো মেয়েটির কাছে অসহ্য—এ থেকেই যত বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি। তবে এর কারণ অবশ্য প্রধানতঃ দুটি—প্রথমতঃ বেশী বয়সে বিয়ে করার ফলে পৃথক ব্যক্তিত্ব অর্জন করে অল্প বয়সের মত পরের সঙ্গে মিশে যাবার ক্ষমতা তাঁদের লোপ পায় ও দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞ বাবা মায়ের বিনা অনুমতিতে তাঁরা যে বিয়ে করেন সেটি অনেক ক্ষেত্রেই বংশ, জাতি, কুল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পাত্রীর মানসিক গঠনের তারতম্য না দেখে হয় বলে পরবর্তী দাম্পত্য জীবন হয়তো সুখের হয় না।

এবার শেষ কারণটি হলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বৈষম্য। এটি এক বিশেষ কারণ যা অপ্রকাশ্যভাবে দাম্পত্য প্রেমে ফাটল ধরায়। মেয়েরা সাধারণতঃ কোমল, মৃদু, অনুভূতি প্রবণ ও লাজুক স্বভাব সম্পন্ন কিন্তু পুরুষ বেশির ভাগই অগ্রগামী। এ সব ব্যাপারে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর স্বভাবগত বৈষম্য না বুঝে স্বামী যদি দিনের পর দিন ভুল বোঝেন তবে এর ফল বিষময় হয়। এ সময় অনেক সময় মানসিক রোগগ্রস্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে পাগল আখ্যা দিয়ে স্বামী বিচ্ছেদের মামলা দাখিল করেন। সমাজে এ দৃষ্টান্তও কি দেখা যায় না!

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩নং ধারায় বিচ্ছেদের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে—যেমন ব্যভিচারিত্ব, ধর্মান্তর গ্রহণ, বিকৃত মস্তিষ্ক,

সাংঘাতিক দুরারোগ্য কুষ্ঠ ও যৌন ব্যাধি, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, নিরুদ্দিষ্ট হওয়া ও দাম্পত্যজীবনের কর্ত্তব্যে বিরত থাকা।

এখন দেখা যাক এগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য। প্রথমেই ব্যভিচারিত্ব কারণটির প্রসঙ্গে বলা যায় যে বিচ্ছেদের দরখাস্ত দেওয়ার ঠিক আগেই এই ধরণের ঘটনা প্রমাণিত হওয়া চাই। অতীতে এ ধরণের ঘটনা আইনে গ্রহণযোগ্য নয়। এর পর ধর্মান্তর গ্রহণের প্রশ্নটি দাম্পত্য প্রেমে সঙ্গত। তবে এ কারণটি বিচ্ছেদের মামলায় অল্পই থাকে। এরপর বিকৃত মস্তিষ্কের কারণটি বিচ্ছেদের পক্ষে এক বিশেষ কারণ যদি এটি চিকিৎসার অসাধ্য বলে প্রতিপন্ন হয়। কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সমাজ ও দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে অনেক সময় বিকৃত মস্তিষ্কের ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করা হয় দরখাস্তকারীর কৌশলে। তাই চিকিৎসকের সাক্ষ্য, আদালতের অনুসন্ধান ও মতামত নিয়ে তবেই কারণটি গ্রহণযোগ্য কিনা দেখা উচিত। কুষ্ঠ ব্যাধিকেও এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে হবে। তবে যৌনব্যাধি হলো এক অন্যতম কারণ। দেশে এই কুৎসিত রোগ যাতে সংক্রামিত না হতে পারে তার জন্যই বিশেষ করে সচেষ্ট হতে হবে। এ ছাড়া অবশ্য সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, নিরুদ্দিষ্ট হওয়া ও দাম্পত্য জীবনের কর্ত্তব্যে বিরত থাকা কারণগুলিকেও গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হ'লো বিশেষ কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়ায় বিচ্ছেদ প্রাপ্তা মেয়েদের ভবিষ্যতে কোন সমস্যার সর্ম্মুখান হতে হয় কিনা। এর উত্তরে বলা যায় যদিও বিচ্ছেদের এক বছর পরে বিচ্ছেদ প্রাপ্তা মেয়েরা পুনরায় বিবাহ করতে পারেন বলে আইনে বলা আছে তবুও বহু হিন্দু পরিবারের সনাতন পন্থীরা এখনও সেই ধরণের মেয়েদের পুত্রবধূ করতে অনিচ্ছুক। এ ছাড়া ভাব প্রবণ মেয়েদের ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ এক মহাসমস্যা। জটিলতায় দিন কাটান তাঁরা। এ ছাড়া বিচ্ছেদের ফলে শিশুরা সাংঘাতিক ভাবে মানসিক অসুস্থ হয়। হিষ্টিরিয়া, নিউরেসিস ইত্যাদি রোগ বিচ্ছেদেরই কুফল। নিরপরাধ শিশু বোঝে না পিতামাতার মধ্যে দোষী কে! শিশু মন ছাড়তে চায় না কাউকে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তাদের ছাড়তে বাধ্য করানো হয় পিতামাতার মধ্যে কোন এক প্রিয়জনকে। চেতনও অবচেতনমনে কান্নায় সে ভেঙে পড়ে।

কিন্তু একান্ত যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া বিচ্ছেদ যাতে না হয় তার জন্য প্রতিকার কি? এর উত্তর কয়েকটি যেমন:— ১। বিয়ের অনুপযোগী দুর্বল, অক্ষম ও রুগ্ন ছেলের বিয়ে না দেওয়া, মানসিক অসুস্থ, নির্বোধ ও হাবা প্রকৃতির পাত্র পাত্রীকে বিয়েতে প্ররোচিত না করা, এ ধরনের প্রকৃতি গোপন করে বিয়ে দিলে পরবর্তী দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে উঠে। ২। রেজেস্ট্রী বিয়ের পাত্র পাত্রীর উচিত বাবা মাকে শুভাকাঙ্খী মনে করে তাদের মতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা। ৩। স্বামী অথবা স্ত্রী মানসিক অপ্রসন্ন হলে অথবা শারীরিক কাজে নির্জীবতা বোধ করলে চিকিৎসক অথবা মনস্তত্ত্ববিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৪। বিয়ের আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কিছু গোপন না করে বিশেষ ভালভাবে বোঝাপড়া হওয়া উচিত।

সুতরাং আলোচনা শেষ করার আগে একটি কথাই বিশেষ ভাবে মনে হয় খুঁটিনাটি দোষ বাদ দিয়ে কোন বিশেষ গুরুত্ববহুল ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সামাজিক সুস্থতা ও নিরপরাধ অবোধ শিশুর শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার মুখ-চেয়ে সামান্য কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের আগুনে ঝাপিয়ে পড়া ব্যাপারে দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ আছে—সেকথা বলাই বাহুল্য।

* * *

সংসারে ফুলের কার্য্য, কাঁটার কার্য্য এক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কাঁটার কোনই আবশুকতা নাই—তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে গড়িলেন কেন?"

স্বর্ণকুমারী দেবী

আজকের সমাজ চিন্তা

সুতপা চক্রবর্ত্তী

একটি কথা প্রায় অনেকের মুখেই আমরা শুনে থাকি—কী যে হচ্ছে আজকাল সমাজে—যত চোখ কান বুঁজে থাকা যায় ততই ভালো। কিন্তু কথাটি একটু তলিয়ে ভাবুন তো, সমাজে যা ঘটে জীবনে কী তা ঘটে না? সমাজে এই যা সব অহরহ ঘটছে তা কী আমার আপনার জীবনকে বাদ দিয়ে? তা কখনও নয়। সমষ্টিবদ্ধ জীবন নিয়েই তো সমাজ। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণই সমাজের চেহারায় প্রতিফলিত। এক কথায় সমাজের আয়নায় আমরা নিজেদের চেহারাকেই ফোটাই এবং ফুটে উঠতে দেখি। সে আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলে নিজেকে ঠকানো হবে—নিজেকে দেখা অসম্পূর্ণ র'য়ে যাবে।

মানুষের জীবন নিয়ে সমাজ এগিয়ে চলে তাই মানুষের ভালো মন্দর মধ্যে দিয়ে সমাজেরও ভাল মন্দ রূপটি নির্ণীত হয়। অবশ্য সামাজিক পরিবেশও মানুষের জীবনকে খুব বেশি নিয়ন্ত্রিত করে। সামাজিক পরিবেশ অসুস্থ হলে জীবন গঠনও ত্রুটিপূর্ণ হয়। সুতরাং সমাজের প্রয়োজনে মানুষকে তার জীবন গঠন করে নিতে হয়। বিগত শতাব্দীতে আমাদের দেশে যেসব চিন্তাশীল মনীষি ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হ'য়েছে তাঁরা সমাজের দিকে তাকিয়ে নিজেদের জীবন গ'ড়ে তুলেছিলেন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করেছিলেন।

আজকের সমাজ এগিয়ে চলেছে বর্তমান যুগকে অনুসরণ করে। আজ ব্যক্তি জীবনে যে অনিশ্চয়তা ও সংশয়, সমাজ তা থেকে মুক্ত নয়। এ শুধু গণ্ডীবদ্ধ কোন এক বিশেষ সমাজের কথা নয়—বিশ্ব সমাজের কথাই এই। সারা বিশ্বে এখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এর ফল ভালো মন্দ যাহা হোক —সমাজ তার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে। মেয়েদের মধ্যে জাগরণ

এসেছে—ইউরোপ আমেরিকায় তো বহু আগেই—এখন সে জাগরণ দেখা দিয়েছে এশিয়া আফ্রিকার অনুন্নত দেশ গুলোতেও। অর্থ নৈতিক কারণই যে নারী জাগৃতির পথ সুগম করেছে এতে সন্দেহ নেই—আবার এই নারী প্রগতির দরুণই সমাজের চেহারা আশ্চর্যভাবে বদলাতে সুরু করেছে একথা বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা নারী হ'ল পরিবারের সব চেয়ে বড় ভিত্তি—তাকে কেন্দ্র করেই অটুট হয় সাংসারিক বন্ধন। সুতরাং পরিবারের বাইরে তার এই পদ-সঞ্চারের ফলে সমাজের ভিত্তি মূলে বেশ একটু নাড়া পড়ছে। বৃহত্তর সমাজে নারীর স্থান হওয়াতে তা যেমন কল্যাণকর হয়েছে তেমনি পরিবার থেকে একটু সরে থাকতে হওয়ার দরুণ সমাজের চেহারাও যে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অর্থনৈতিক তাগিদে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ফলে কিংবা অন্য যে কারণেই হোক—এদেশে সামাজিক অবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় এই, সমাজ যেন ক্রমেই শৃঙ্খলাবোধকে হারিয়ে ফেলছে। যে শৃঙ্খলা ও সংযম এতকাল সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হয়েছিল তার এই বিলুপ্তি কেন ঘটল এ প্রশ্ন জাগতে পারে। হয়ত আমাদের জনসংখ্যার আধিক্য তার অন্যতম কারণ হ'তে পারে। ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার চাপ প্রতিটি পদে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব ক'রে চলেছে। হয়ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা তাতে আরো ইন্ধন জুগিয়েছে। আগেই বলেছি অর্থ নৈতিক তাগিদে মেয়েরা ব্যাপকভাবে বাইরের কাজে যোগ দেওয়ার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। মেয়েরা বাইরে আসার দরুণ সবচেয়ে বড় চাপ এসে পড়ছে তাদের ঘরে রেখে আসা ছেলেমেয়ের ওপর। যে সময়ে মায়ের প্রভাব সবচেয়ে জরুরী সেই সময়েই তারা মাতৃ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। ফলে এরা হ'য়ে পড়ে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। আজকাল বড় পরিবার নেই—ছোটখাটো সংসারে বাইরের লোকের হাতে এরা মানুষ। এদের ধরণ ধারণ প্রকৃতিকে বুঝে চলা বাইরের লোকের পক্ষে মোটেই সহজ নয়, কাজেই অনেক ক্ষোভ আর অভিমান এদের মনের কোনে জমতে থাকে। ছেলেমেয়েদের এমনি ভাবে নিজেদের কাছ ছাড়া ক'রে বাইরে যেতে কোন মায়েরই মন চায়না তবু উপায় কী! তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে

দেখি অফিস করতে গিয়েও মায়ের মন সেই ঘরের দিকে, ছেলেমেয়ের দিকেই পড়ে থাকে। অফিসে দুটি মা একত্র হলেই ছেলেমেয়ের কথা। ওদিকে ছেলেমেয়েও হয়ে পড়ে জেদী, অসহিষ্ণু ও বেপরোয়া। চাকুরে মা দু-হাত ভরে জিনিষ এনেও শিশুর অভিমান অনেক সময় ভাঙাতে পারে না। অনেকে দুঃখ করেন—ছোটবেলায় নিজেরা যা কখনও পেতে পারি বলে স্বপ্নেও ভাবিনি, ওরা তা এত সহজে পেয়ে যাচ্ছে তবু ওদের মন ভরে না। কিন্তু সত্যিই কী তাই ! আসল কথা, কোন কিছু দিয়েই ওদের মন ভরানো যাবে না, কারণ আসল জিনিষই যে ওরা হারিয়ে বসে আছে। আমার এক কর্মচারী বান্ধবী সেদিন বলেছিলেন—তার আট ন' বছরের ছেলেকে তার বন্ধুরা একদিন বলছিল তোর কী মজারে! তোর মা রোজ রোজই তোর জন্য কত জিনিষ এনে দেয়। ছেলেটি নিস্পৃহ গলায় জবাব দিয়েছিল—'কিন্তু তোরা যে রোজ রোজ বাড়ী এসে মাকে দেখতে পাস। আমি তো পরীক্ষা দিয়ে এসেও মাকে পাইনা।' আজ যারা চাকুরে মা তাদের পক্ষেও শিশুকালে বাড়ীতে মার এমন নিত্য অনুপস্থিতির কথা ভাবা অসম্ভব ছিল। মাকে যারা সর্বক্ষন কাছে পেয়েছে তারা সামান্য জিনিষই কত আনন্দে লুফে নিয়েছে। আজ শিশুদের মুখে দুনিয়ার কোন খেলনাই হাসি ফোটায় না কেননা সে আগে চায় মাকে, তারপর তার খেলার সামগ্রীকে।

খুব ছোটবেলা থেকে এই মা, শিশুর জীবনে যার সব চেয়ে বড় আশ্রয়, সব চেয়ে বড় ভরসা হবার কথা—অধিকাংশ সময় তার সঙ্গচ্যুত হবার জন্য শিশুর মনে যে ক্ষোভ, নিরাপত্তার অভাব, অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বোধ জমতে থাকে, পরবর্তীকালে তার ওপর দাঁড়িয়ে তাকে যখন আরো বহু ভালমন্দ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে হয় তখন তাকে কতটা পরিশীলিত, শান্ত, স্থৈর্য ও বিকেকবান বলে আমরা আশা করতে পারি। আজকের দিনে সারা বিশ্বে যে তারুণ্যের উচ্ছৃংখলতার কথা আমরা শুনি তার পেছনেও মায়ের প্রভাবের অভাব এমনিভাবে কাজ করছে কিনা কে জানে !

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্তও আমাদের সমাজ মোটামুটি কতকগুলি ন্যায় নীতি, ধ্যান ধারণা বা আচার আচরণ, মেনে চলতে। তখন প্রত্যেককে

সমাজের উপযোগী ক'রে তোলার জন্য পারিবারিক শিক্ষার একটা ধারাকেও সকলের মেনে চলতে হ'ত। ছোটদের ভালোমন্দ শেখাবার দায়িত্ব পরিবারের বয়স্কজনরা নিতেন। তাদের কর্তব্য অকর্তব্যকে সর্বদা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরুণ ছোটদের কাছে তাঁরা অনেক সময় অপ্রিয় হলেও এই শিক্ষা যে তাদের ভালোর জন্যই এটা ছোটরাও বুঝত। কিন্তু আজ পরিবারগুলির ধাঁচ পাল্টে যাচ্ছে—ছোট বড় আচরণে তারতম্য নেই—বয়স্কদের প্রতি ছোটর শ্রদ্ধা নেই, সবাই এখন মাথা তুলতে চাইছে—ব্যক্তিনিষ্ঠ হ'তে চাইছে। ফলে সমাজ জীবনে সুখ-দুঃখ, পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি, পরমত সহিষ্ণুতা মানবিক মূল্যবোধ, চিন্তার স্বাধীনতা এসবই লোপ পেয়ে গেছে। আগে পারিবারিক জীবনে মানুষ পরস্পরের প্রতি স্নেহ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার যে পরিচয় পেত—বৃহত্তর জীবনে মানুষের সঙ্গে আচরণেও সেই শিক্ষাই তার বড় সহায়ক হত। আজ পারিবারিক জীবনের ভিত্তি যেমন দুর্বল তেমনি অসাড় মানুষের ব্যক্তি বীবনের অনুভূতির দিকগুলি।

নানা কারণে তাই আমরা যে সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন তার অবস্থা একেবারেই বে-সামাল। এ যেন ঝড়ের মুখে তরী দাঁড়িয়ে কাকে আশ্রয় করবে ঠিক পাচ্ছে না। অবক্ষয়ের চিহ্ন চার দিকে। শিল্পে সাহিত্যে সংবাদপত্রে, চলচ্চিত্রে সর্বত্র তার প্রতিফলন। আসলে যুগটাই অবক্ষয়ের শুধু নীতিকথা দিয়ে, সমালোচনা ক'রে এর গতিরোধ করা যাবে না—কেননা নানা কার্য কারণের মধ্যে দিয়ে সমাজ আজ এই পর্যায়ে এসেছে। তাছাড়া পৃথিবীর আয়তন এসেছে ছোট হয়ে। এদেশ থেকে যেমন বিদেশে লোকের যাতায়াত বেড়েছে—তেমনি বেদেশীদের আসা যাওয়ারও অন্ত নেই। বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে কতকগুলো ক্ষেত্রে পরানুকরনের মোহ আমাদের খুব বেশি ক'রে পেয়ে বসেছে—কিন্তু বিদেশীদের শ্রম, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম এখনও আমাদের অনুপ্রাণিত করছে না। আমরা ওদের মত গভীর কাজে যোগ্য হ'য়ে ওঠার আগেই ভাঙার নেশায় মেতে উঠেছি। ফলে এক অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হ'চ্ছে আজকের সমাজ। তবে এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারেনা—ঝড়ের পরে যেমন সূর্যোদয় হয় তেমনি মানুষের বিবেকও একদিন ফিরে আসে স্বস্থানে। এই বিবেক যেদিন ফিরে আসবে—সব অস্থিরতার ঝড় কেটে যাবে সেদিন। সমাজকে সেদিন আমরা দেখতে পাব নতুন চেহারায়

শরৎসাহিত্যে সমাজ চিত্র

গীতা বসু

শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন উপন্যাস মানুষের মনের ছবি। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার অতি মধুর ও সজীব বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা ও মাধুর্য্যকে তিনি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর চরিত্র সৃষ্টিতে এই বৈচিত্র ও নানা রসের সংমিশ্রনের অপূর্ব পরিচয় রয়েছে। তাদের মধ্যে দোষ আছে, তাদের কোথাও পদস্খলন ও আছে তারা কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয় কিন্তু তবুও তাদের অনুভূতির ঐশ্বর্যে অতুলনীয়, তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ অতিশয় সুক্ষ্ম। এরা হলো রমা, রাজলক্ষ্মী, অচলা, কমল, ভাকিনী, ইন্দ্রনাথ, দেবদাস, সতীশ—।

শরৎচন্দ্রের আরো একটি প্রধান গুণ—তাঁর গভীর সহানুভূতি। সকল শ্রেণীর নর নারীকে তিনি গভীর ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। যারা ক্ষমাহীন ধর্ম ও প্রীতিহীন সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হয়েছে তিনি তাদের মনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন এবং তাদের আশা আকাঙ্খা বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন। সমবেদনাহীন সঙ্কীর্ণতাকে তিনি কষাঘাত করেছেন কিন্তু নীতিকে নয়।

সমজশক্তি অনেক সময় নিজেকে প্রকাশ করে চিরাগত সংস্কারের মধ্য দিয়ে। সংস্কার কিন্তু একেবারে বাহিরের জিনিষ নয়। তার আসন রয়েছে আমাদের মনের মধ্যেই। মানুষের বুদ্ধি আছে, অনুভূতি আছে। কতকগুলি অনুভূতি সংস্কারের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে প্রাণ দিয়েছে। আবার অনেকের মন বুদ্ধি ও সংস্কারকেই আঁকড়ে ধরেছে।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে এই পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের চিত্রণে। তাঁর অঙ্কিত নারী চরিত্রের বিশেষত্ব সর্বজন সম্মত। তার

কারণ পুরুষ বুদ্ধিজীবি। সংস্কার বুদ্ধিকে অতিক্রম করে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আঘাত করে না। নারীর কাছে হৃদয়াবেগের মূল্য অনেক বেশী। কাজেই সমাজ শক্তি তার কাজে বাহিরের শক্তিমাত্র নয়—এটা তার অন্তরের জিনিষ। একে সে আপনার করে গ্রহণ করেছে। তাই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নারী-চিত্তে। এই জন্য শরৎসাহিত্যে নারী চরিত্রের স্থান এত উঁচু। নারী চরিত্রের মধ্যে প্রবৃত্তির সঙ্গে সচেতন সংস্কারের এই সংঘাতকেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখিয়েছেন। ভালবাসার আকর্ষণ প্রবল—আবার তাকে প্রত্যাখ্যান করবার শক্তিও দুর্বার। এই দ্বন্দ্বের কোন শেষ নেই—এতে কোন কল্যাণ নেই—এই হলো সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্র থেকে তাই আমি কিছু কিছু পাঠ করবো। তার আগে একটু বলেনি যে শরৎসাহিত্যে আমরা দেখি সমাজের সঙ্গে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। সমাজ এখানে আদর্শ নয়। যাদের মঙ্গলের জন্য তার সৃষ্টি, তাদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অনেকটা শক্তি ব্যয় হচ্ছে। শরৎ সাহিত্যে সমাজ সক্রিয় শক্তিশালী। তাই এই যুদ্ধে হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত হয়েই বিদায় নিতে হল।

পল্লী সমাজের রমেশের পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বেশ্বরী খেদের সঙ্গে বলছেন :—

"সে অনেক কথা যদি থাকিস এখানে আপনিই সব জানতে পারবি। কারুর সত্যকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে অপবাদ আছে—তা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেয়া নিয়ে মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দুদিন আগে যেতুম রমেশ, তাহলে এত উদ্যোগ আয়োজন কিছুতে করতে দিতুম না। কি যে সেদিনে হবে তাই কেবল আমি ভাবছি, বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে যে কি ছিল তার ঠিক মর্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না এবং এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদেই বা কি হইতে পারে তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না, বরঞ্চ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু আগের সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি এক রকম বিদেশী বলিলেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করবো না, ব্রাহ্মণ শীঘ্রই নিমন্ত্রণ করে আসবো। কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়াত পারিনে—তুমি হুকুম দাও জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, এ রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ! তাতে গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয় তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যিমিথ্যের কথা নয় বাপ। সমাজ যাকে শক্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেছে তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক্ তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হলে তো কোন-মতেই চলতে পারেনা রমেশ!"

শীতলাতলাকে রমা ভুলিয়াছিল কিন্তু রমেশ যে সেই শৈশব স্মৃতিকেই বসে আনবে এটি সে ভাবেনি। তাই রমেশ যখন ডাকলো "রানী কইরে"—রমার বুকের ভিতর হ্যাঁৎ করে উঠলো। হৃদয় তার তখনই রমেশের নিকট ছুটে যেতে চাইলো কিন্তু বাধা দিল পল্লী সমাজ।

তারকেশ্বরে রমেশের সঙ্গে রমার দেখা হয়েছিল। যেখানে রমেশকে কাছে বসিয়ে সে তৃপ্তি পেয়েছিল। হয়ত এই দিনটিকে যে স্মৃতিতে রাখতে পারতো কিন্তু এখানে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো সমাজ। অপর এক সময়ে অন্য পরিবেশে—রমা বলেছিল—"না ভাববার সময় নেই। আজই আপনাকে ঘরে কোথাও যেতে হবে। না গেলে বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল, রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাইলে বিপদ যে কী ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল ভাল তাই যদি যাই তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও তো কম চেষ্টা করনি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেছ। কারণ খুলে বলো। আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধা হয়, আমি চলে যেতে হয়ত রাজি হতেও পারি, বলিয়া সে যে উত্তরের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল তাহা পাইল না। কতবড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহা ও জানা গেল না।... কিছুক্ষণ স্থির করিয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল, আচ্ছা খুলেই বলছি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ শুষ্ক হইয়া কহিল এই? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা একটুখানি থামিয়া কহিল, না দিলে? না দিলে, দুদিনে পরে আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবে না। আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না—আমার বীর ব্রত—এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় স্মরণমাত্র রমা যেন শিহরিয়া উঠিল।

রমেশের আর না শুনিলেও চলিত, কিন্তু থাকতে পারিল না। কহিল তার পরে?

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, "তারও পরে? না তুমি যাও—আমি মিনতি করছি রমেশদা। আমাকে সব দিকে নষ্ট করো না; তুমি যাও-যাও এ দেশ থেকে।" আমরা দেখি, রমা এখানে পল্লীসমাজকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি।

বিশ্বেশ্বরকেই রমা হৃদয়ের কথা বলেছিল—তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ দিয়েছি তার অনেক বেশী দুঃখ যে আমিও পেয়েছি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।"

এই যে হচ্ছে রমার জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় সে তার একান্ত প্রেমাস্পদের শত্রুতা করেছে।

বিদায়ের দিনে রমেশ জিজ্ঞাসা করেছিল "রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?" শরৎচন্দ্র বলেছেন—বিশেশ্বরী একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন দমন করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন—

সংসারে যে তার স্থান নেই, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে ও বাঁচে কিনা জানিনা। কিন্তু যদি বাঁচে, সারাজীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করবেন, কেন ভগবান তাকে এতরূপ, এতগুণ, এতবড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংশয়ের বাহিরে ফেলে দিলেন। একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় ভবেই না, এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা?

সমাজের খেয়ালের আর এক খেলা দেখতে পাই পার্বতীর জীবনে। কিন্তু রমার ও পার্বতীর হৃদয় এক বস্তু দিয়ে গড়া নয়। পার্বতীর জীবনের

ও সমস্ত কামনা বাসনা আশার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সমাজ। জমিদার পুত্র দেবদাসের সঙ্গে বেচাকেনা চক্রবর্তী ঘরের মেয়ে পার্বতীর মিলন সম্ভব হয়নি। কিন্তু পার্বতী চলে যাবার পূর্বে তালসোনাপুর এবং হাতীপোতা গ্রামে নিজের কতকটা পরিচয় রেখে গেল।

যাবার আগে দেবদাসের ঘরে গিয়ে গভীর রাত্রে নিজের মনের কথা বলতে পেরেছিল।

দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখল। বিস্ময়ের উপর আরো বিস্ময় বাড়িল, কহিল,

"এত রাত্রে?"

পার্বতী উত্তর দিল না; মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,

"এত রাত্রে কি একলা এসেছ নাকি?"

পার্বতী কহিল, 'হাঁ।'

দেবদাস উদ্বেগে আশঙ্কায় কন্টকিত হইয়া কহিল, বল কি! পথে ভয়! পার্বতী মৃদু হাসিয়া কহিল, ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

ভূতের ভয় না করুক কিন্তু মানুষের ভয় ত করে। কেন এসেছ?

পার্বতী জবাব দিল না; কিন্তু মনে মনে কহিল এ সময়ে আমার তাও বুঝি নেই।

বাড়ী ঢুকলে কি কোরে? কেউ দেখেনি ত?

দরওয়ান দেখেছে।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিল দরওয়ান দেখেছে? আর কেউ? ইত্যাদি ইত্যাদি!

দেবদাস আবার শুধায়—এমন কাজ কেন করলে?

পার্বতী মনে মনে কহিল তা তুমি কেমন করে বুঝবে? কিন্তু কোন কথা কহিল না—অধোবদনে বসিয়া রহিল। এত রাত্রে! ছি ছি! কাল মুখ দেখাবে কেমন কোরে?

মুখ নীচু করিয়াই পার্বতী বলিল, আমার সে সাহস আছে।

...এখানে এভাবে আসতে তোমার লজ্জাবোধ হইল না? কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না?

প্রশ্ন শুনিয়া পার্বতী তীব্র অথচ করুণদৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণ-কাল চাহিয়া থাকিয়া অসঙ্কোচে কহিল, মাথা কাটাই যেতো—যদি না আমি নিশ্চয় জানতুম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।

দেবদাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, 'আমি! কিন্তু আমিইকি মুখ দেখাতে পারবো?'

পার্বতী তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল' তুমি? কিন্তু তোমার কি দেবদা?

একটু খানি মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, 'তুমি পুরুষ মানুষ। আজ না হয় কাল তোমার কলঙ্কের সব কথাই সবাই ভুলবে দুদিন পরে কেউ মনে রাখবে না—কবে কোন্ রাত্রে হতভাগিনী পার্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে সমস্ত তুচ্ছ করে এসেছিল।'

পার্বতী দেবদাসের কাছে থেকে কঠিন আঘাতই সহ্য করেছিল, তাই অন্তরের অভিমানী নারী হৃদয় তার প্রত্যাঘাতেই উত্তর দিতে চাইল। ফলে 'চাঁদের উপর কলঙ্কের দাগ' নিয়ে তাকে গৃহে ফিরতে হলো। নববধূ সাজে পার্বতীকে তাল সোনাপুর ছেড়ে হাতীপোতা গ্রাম আশ্রয় করতে হলো। এই ভাবে বিচ্ছেদের মাত্রা পূর্ণ হলো বটে, কিন্তু এক হৃদয় অপর হৃদয়ের সঙ্গে এই আঘাতের মধ্য দিয়ে আরো জড়িত হলো।

শরৎ সাহিত্যে পোড়াকাঠ ভাসিনী আর এক নারী। নারী স্বরূপা হতে পারে, কুরূপা হতে পারে, তার পতিবেশ তাকে কঠিন করে তুলতে পারে, কিন্তু অন্তরে তার গোপন ফল্গুধারার মত চিরন্তন নারী প্রকৃতিই বাস করে। শরৎচন্দ্র নারীর এই অন্তরকেই রূপ দিয়েছেন। ন্যায়ের নামে, স্নেহের নামে নারীর প্রতি অত্যাচার দেখে তার নারীর অন্তরই সেদিন ব্যথিত হয়েছিল তাই এর বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানালো।

রঙ্গস্থলে পোড়াকাঠ আসিয়া দেখা দিলেন। দুইহাত গোবর মাখা। বোধ করি তখনো গোয়াল ঘরের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। উঠানের উপর আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া অকস্মাৎ ভাঙ্গা কাঁসার মত খ্যাম্-খ্যান্ করিয়া বাজিয়া উঠিলেন—বলি সুপাত্তরটি কে গো ঠাকুর? একবার শুনতে পাইনে?

শম্ভু স্ত্রীর ভাবগতিকে বিচলিত হইলেন। কিন্তু মুখের সাহস বজায় রাখিয়া কহিলেন যেই হোক তোর তাতে কি? পোড়াকাঠ গোবর মাখা হাত

হুখানা নাড়া দিয়া অর্দ্ধেক উঠানটা যেন নাচিয়া আসিল। তেমনি সুমধুর কণ্ঠে সমস্ত পাড়াটা সচকিত করিয়া কহিল মামা মামাষ ফলাতে এসেছেন। নবীনের সঙ্গে বিয়ে দেবে। তাহলে একশ টাকা সুদে আসলে শোধ যায় না? তাই সে সুপাত্তর? বটে! আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে? তাড়ি গাঁজা খেয়ে, পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আটমাস পেটের ওপর লাথি মেরে মেরে ফেললে কি না—তাই সুপাত্তর আর নেই —।

গলায় দড়ি জোটেনা তোমার? ধিক্! ধিক্।

ভাই হলেও সেই দশজনের নিকটে নারী হয়ে আর একটি নারীকে কেমন করে সে বলি দিবে!

তাই দেখি দুর্গামণি নিজের ভুল বুঝে অনুশোচনা করছেন। যাবার সময় মাপ চেয়ে নিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—পোড়াকাঠ আজ আর সমস্ত মাড়ি বিকসিত করিয়া হাসিল না। এবং চট করিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া লইয়া কহিল—"পোড়া কপাল! অপরাধ ত সব আমাদেরই হলো ঠাকুরঝি। ওগো গেনি, মামামামীর উপর রাগটাগ করিসনে যেন।" এই বলিয়া তাহার গেনি-মাকেই সে আসচে বারে আম-কাঠালের দিনে জামাইসব নিমন্ত্রণ করিয়া হাতের পিঠ দিয়া আর দু ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।"

শরৎচন্দ্র বলতে চেয়েছেন যে স্নেহ মাধুর্যেই নারীর স্বাভাবিক বিকাশ এই হৃদয়ের রূপটিই আসলরূপ।

"নারী মাত্রেই যে মা! আর আমার মা তো
তাদেরই মতো নারী।"

—বিদ্যাসাগর

স্মৃতিকথা

আমার সঙ্গীত জীবন

সুপ্রীতি ঘোষ

কবে কোন ছোট্টবেলা থেকে আমার এই গান গাওয়ার সুরু, তার হিসেব করে বলা সত্যই কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে আজ। লিখতে গেলে ছোটখাট একটি ইতিহাস হ'য়ে যাবে।

তখন ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়ে, ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউশন স্কুলে পড়ি। স্কুলে কোনও সময়ে আমাদের (মানে আমি ও আমার দিদি প্রখ্যাত শিল্পী ভারতী বসু) বিশ্রাম ছিলনা। স্কুল বসার আগে, টিফিনের সময়ে, ছুটির পর— সব সময়েই আমাদের গান গাইতে হোতো—তাতে কিছু আপত্তি ছিলনা গাইতে বললেই হোলো গলা ছেড়ে উচ্চৈঃস্বরে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে গাইতাম। সব রকম গানই গাইতাম কীর্ত্তন, খেয়াল, ভজন ছাড়া অন্যান্য গানের নাম বাংলা গান বলেই জানতাম। কোনটাই বা রবীন্দ্র সংগীত, কোনটাই বা নজরুলগীতি; অতুল প্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রগীতি এইসব বিচারের ধার ধারতাম না বা জানতাম না।

একদিন স্কুলের ছুটীর পরে শুনলাম রেড়িও অফিস থেকে গাড়ী এসেছে আমাকে নিতে-বড়বাবু (আমার জেঠামহাশয় ৺নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার) পাঠিয়েছেন—গান গাইতে যেতে হবে। সেই আমার প্রথম গান গাওয়া কলিকাতা বেতার কেন্দ্র। গানখানি ছিল "সন্ধ্যা হ'লো গো ওমা। গানটি যে রবীন্দ্র-সংগীত তা জানতাম না এর সঙ্গে আর একখানি হিন্দী ভজন গেয়েছিলাম। তখন এই ছিলো রীতি। গানের কোন শ্রেণী বিভাগ বিশেষ ছিলো না। যে কোন গানের পরে যে কোন গান গাওয়া যেতো। গান দু'টি ঠাকুরমার কাছ থেকে শেখা—আমার ঠাকুরমা ও পিসীরা খুব ভাল গাইতে পারতেন। আমার ঠাকুরদা ৺নগেন্দ্র নাথ মজুমদার বিশেষ গুণী ছিলেন। তার কাছে ৺ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বহু বৎসর যাবৎ গান শিখেছিলেন।

এই কলিকাতা সহরের মির্জাপুর ষ্ট্রীটের এক অখ্যাত গলিতে প্রথম সূর্যের আলো দেখি আমি। পিতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ মজুমদারের চারিটি কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে আমি মধ্যমা কন্যা। ভাই বোনেরা আমরা ছোট বেলা থেকেই গান করতাম। কারণ বাড়ীতে গানের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি আমরা। জ্যেঠামহাশয়ের কাছে তখনকার অনেক বড় বড় বেতার শিল্পী ও ওস্তাদেরা প্রায়ই আসতেন এবং গানের বৈঠক বস্তো।

কলম্বিয়া রেকর্ডিং কোম্পানীর মহড়া আমাদের বাড়ীতে বসতো। তখনকার একমাত্র সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান "বাসন্তী বিদ্যা বীথির" শিক্ষকবৃন্দ আমাদের গান শুনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে শিষ্যারূপে গ্রহন করেন। খেয়াল, ঠুংরী কীর্ত্তন, ভজন, আধুনিক, রবীন্দ্র সংগীত, পল্লীগীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ নিতে সুরু করি। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার চর্চ্চা ও চলতে থাকে। ভিক্টোরিয়া থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী অবধি পড়ি। পরে আর লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৺অজয় ভট্টাচার্য্যের লেখা "আবার আমি আসবো" ও "আজেকি যমুনা তীরে" গান দুটি ৺শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে সেনোলা রেকর্ডিং কোম্পানীতে প্রথম রেকর্ড করি। তারপর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ নিয়ে আসে আমার জয়মাল্য—পাইওনীয়ার রেকর্ডিং কোম্পানীতে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের গান "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে" ও "কে বলে যাও যাও আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া" রেকর্ড করি। কবিগুরু তখনও জীবিত, স্রষ্টার সস্নেহ আশীর্ব্বাদে সেদিন কানায় কানায় পরিপূর্ণা হয়েছিলাম। ১৯৪২ খ্রীঃ বিয়ের পরেও সঙ্গীত সাধনা আমার সমানভাবে চলতে থাকে। শ্বশুর গৃহের সকলে রবীন্দ্র সংগীতের বেশী অনুরাগী হওয়াতে ক্রমশঃ আমার মন সেই দিকে ধাবিত হয়। এই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার প্রায় ১১।১২০ খানি রবীন্দ্র সংগীত রেকর্ড বের হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য গান যেমন কীর্ত্তন, আধুনিক, ভক্তিমূলক, পল্লীগীতি প্রভৃতিও বাহির হয়েছে। চলচ্চিত্রেও নেপথ্য কণ্ঠে অনেক রবীন্দ্র সংগীত গেয়েছি। তার মধ্যে "তোমায় নতুন ক'রে পাব ব'লে" গানখানি আমায় প্রচুর সাফল্য এনে দেয়। 'ঘরোয়া' নামে একটি ছায়াছবিতে গানটি ছিল। মনে পড়ে গানটি গাইবার সময়ে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষালাভ করেছি শ্রীঅনাদি দস্তিদার, নীহার বিন্দু সেন এর কাছে। তাছাড়া শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীশৈলজা রঞ্জন মজুমদার ও শ্রীকনক বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষার আস্বাদ ও গ্রহণ করেছি। এছাড়া গ্রামোফোন কোম্পানী ও বেতার কেন্দ্রের অধিকর্ত্তাদের নিকট হ'তে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি এবং আজও পেয়ে থাকি।

"গীতবিতান" নামে রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক বৎসর শিক্ষয়িত্রী ছিলাম আমি।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার জন্যে যদিও আমি বিভিন্ন শ্রেণীর গান গাই, কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ভাষা ও মাধুর্য্য আমার মনের উপর আশ্চর্য্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আমার মনে হয় রবীন্দ্র সংগীত না শিখলে সংগীত পিপাসুর সংগীতজীবনে অনেক খানি ফাঁক থেকে যায়। রবীন্দ্র সংগীতে খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, ধ্রুপদ সবই আছে-আলাদা ভাবে এসব শিখলেও চলে। অবশ্য যারা মার্গসংগীতকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে নেয় তাদের কথা আলাদা। কিন্তু রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠসাধনা করবার সংগীত শাস্ত্রে যে সমস্ত পাঠ আছে তা অভ্যাস করতেই হবে। রবীন্দ্র সংগীত সাধনার অন্ত নেই—আর যে কোন গান গাইতে গেলেই মনে হয় এ বুঝি আমারই মনের কথা। এই-ই আমি বলতে চাই আর যুগ যুগ ধরে যেন এই গান গেয়ে আসছি "কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে সে তো আজকে নয়।"

একদিকে যেমন জীবনের আশা, আনন্দ, সুখস্মৃতির মাঝে কবিগুরুর গানে অনুরনিত হয়ে আকুলকণ্ঠে মন গেয়ে উঠেছে "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে", "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" ; আবার পথ চলতে জীবনে কত বাধাবিঘ্ন কত শোক তাপ এসেছে কিন্তু তখন সান্ত্বনা পেয়েছি একমাত্র তাঁরই গানে "দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।"

—•—

আমার ডায়েরী থেকে

মণিরা খাতুন

ইউরোপের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, উত্তর সমুদ্রের তীরে স্বপ্নের মতো সুন্দর ও সবুজ, পনীর ও পানচাকার দেশ নেদারল্যাণ্ড। সমুদ্রের চেয়েও নাচু এই সুদূর দেশটি থেকে যেদিন আহ্বান এল সেদিন আমি আনন্দে উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। নতুন নতুন দেশ দেখতে জানতে কারই বা না আগ্রহ হয়? বিশেষতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানের দেশ ইউরোপ দেখবার আশা মনে মনে আমি বাল্যকাল থেকেই পোষণ করতাম। সেই আশা আমার পূরণ হল। দেশের আকাশ পেরিয়ে ইউরোপের আকাশে যেদিন আমার প্রথম প্রভাত হয় সেদিনের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে কোনদিনই ভুলতে পারব না। এশিয়ার প্রান্তে বেইরুট ছেড়ে সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীসের রাজধানী এথেন্স এবং অস্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা হয়ে এসে পৌঁছুলাম পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দর শ্বীফোল হল নেদারল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টার-ডাম এর বিমানবন্দর।

ভারত থেকে ইউরোপে এলে প্রথম যা আকর্ষণ বা অভিভূত করে তা হল সেখানকার অনবদ্য নিয়ম শৃঙ্খলা। নিখুঁত নিয়ম শৃঙ্খলার জন্য বিমান বন্দরে কোন গোলযোগ, কোন অসুবিধে নেই। বিমান থেকে নেমে যেখানে যাব যে নির্দ্দেশ প্রয়োজন বা যেখানে যার যা জ্ঞাতব্য তা যেন ম্যাজিকের মত চোখের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে বা কানের মধ্যে এসে প্রবেশ করছে। ফলে সম্পূর্ণ বিদেশীর পক্ষেও নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে, বা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। বিমান বন্দরের পরিকল্পনা এবং স্থাপত্যটাও অপূর্ব। বিমান বন্দরের এক একটি অংশের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবহারযোগ্যতা লক্ষ্য করলে স্থপতিদের মৌলিকতা, সৌন্দর্য্যবোধ ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপূর্ব সমন্বয় ক্ষমতার তারিফ না করে পারা যায় না।

বিমান বন্দরে বিদেশী ভ্রমণকারীর প্রয়োজনীয় নিয়মানুষ্ঠান পালন করার পর নির্দিষ্ট জায়গায় ইনফরমেশন্ ডেস্কে এসে দেখি আমার নামে নেদারল্যাণ্ড সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতর থেকে একটী চিঠি, তাতে বিমান বন্দর থেকে ডেন হাগ্ শহরে যাওয়ার এবং সেখানে একটী মেয়েদের হোষ্টেলে থাকার নিখুঁত বান্দোবস্ত। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং আরও নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিপূর্ব্বে নানা উৎস থেকে জেনেছিলাম। কিন্তু সেদিন বিমান বন্দরে নেমে সেখানকার প্রতিটী ব্যবস্থার মধ্যে যেন ইউরোপীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সমৃদ্ধির মূলমন্ত্রটী প্রত্যক্ষ করলাম। নেদারল্যাণ্ড সরকার আমাকে বৃত্তি দিয়েছিলেন তাঁদের দেশের মিউজিয়মগুলি কিভাবে পরিচালিত হয় এই বিষয়ে শিক্ষা করার জন্য। তাঁদের দেশের বিভিন্ন মিউজিয়ম পরিদর্শন করাও এই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। নেদারল্যাণ্ড সরকারের বদান্যতায় শুধু সেখানকারই নয়, পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মিউজিয়মগুলিও আমার দেখার সুযোগ ঘটে। এই মিউজিয়মগুলি সম্পর্কে কিছু শুনতে আপনাদের নিশ্চয়ই আগ্রহ হবে। একটা দেশ বা জাতির সংস্কৃতিকে বুঝতে তাদের মিউজিয়মগুলি অনেক সাহায্য করে। ইউরোপে নানা ধরণের মিউজিয়ম দেখলাম। কলা, পুরাতত্ত্ব বা নৃতত্ত্ব তো সবচেয়ে সাধারণ বিষয়বস্তু। বস্তুতঃ সংস্কৃতির এমন কোন বিভাগ নেই যা নিয়ে ইউরোপীয়রা মিউজিয়ম গড়েনি। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার দ্রুত উন্নতির জন্য ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন জিনিষের উদ্ভাবন হচ্ছে। প্রতি ক্ষেত্রে কঠিন প্রতিযোগীতার জন্য প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার যোগ্যতার দিক থেকে অধিকতর উপযোগী নব নব উপকরণের পরিকল্পনা ও উৎপাদন হচ্ছে। ফলে পুরাণো উপকরণগুলিকে মিউজিয়মে পাঠানো ছাড়া উপায় নেই। এই ভাবে জীবন ধারণের বিচিত্র উপকরণের বিকাশ, বিবর্ত্তন বা বৈচিত্র্য ধরা পড়ছে বিভিন্ন মিউজিয়মের গ্যালারী পরিক্রমণে। এরই সঙ্গে ধরা পড়েছে একটী বিশেষ জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সৌন্দর্য্যবোধ এবং মেজাজ। এই জাতীয় মিউজিয়ম-গুলির মধ্যে পাইপ মিউজিয়ম থেকে শুরু করে যানবাহন মিউজিয়ম, ডাক বিষয়ক মিউজিয়ম নৌ-মিউজিয়ম আসবাব-মিউজিয়ম আরও নানাবিধ মিউজিয়ম আছে। সুইডেনে যেখানে নিত্যনূতন টাউনশিপ

যা জনপদ গড়া হচ্ছে সেখানকার পুরাণো ঘরবাড়ী দোকানপশার কিছুই ভেঙ্গে নষ্ট করা হয়নি। সবকিছু সমূলে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র স্থাপন করা হয়েছে। এই ভাবে নেদারল্যাণ্ডে এবং ইউরোপের নানা জায়গায় মুক্তাঙ্গনে মিউজিয়মের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ধরণের কোন একটী মিউজিয়মে গেলে বিগত তিন চার শতাব্দীর জীবনযাত্রা, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব পত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দেশাচার প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই মিউজিয়মগুলিকে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ করে সাজানো হয়েছে। এ ছাড়া অতুলনীয় ইউরোপের ইতিহাস এবং বিজ্ঞান মিউজিয়ম-গুলি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অধুনাতন সভ্যতার ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের শৈশব থেকে ধারাবাহিক বিবর্ত্তন এই সব মিউজিয়মগুলিতে বিবৃত হয়ে আছে। ইউরোপের নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশের আদি ঐতিহাসিকযুগের সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন ইউরোপের বিভিন্ন মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ইউরোপীয়রা যে সব দেশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সে সব দেশ থেকে বহু মূল্যবান নিদর্শন সংগ্রহ করে তারা নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে। যেমন নেদারল্যাণ্ডের বিভিন্ন মিউজিয়মে তাদের একদা উপনিবেশ ইন্দোনেশীয়ার সংস্কৃতির নানা নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া আফ্রিকা, প্রাচীন আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদি সভ্যতার নিদর্শনও আছে। এসব থেকে বিভিন্ন জাতির সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব।

এবারে নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসী ওলন্দাজের সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলি। নেদারল্যাণ্ড ধনী দেশ। অধিবাসীরা মোটামুটী সকলেই সম্পন্ন। মলিন বসন দরিদ্র প্রায় চোখে পড়েনা বললেই চলে। তবে দারিদ্র্য এই ধারণাটী আপেক্ষিক। একবার নোদারল্যাণ্ডের টেলিভিশনে সেখানকার একটী দরিদ্র বস্তির ছবি দেখেছিলাম। সেটী তাদের দেশের কলঙ্ক কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষতঃ বাংলাদেশের উচ্চমধ্যবিত্তেরাও বোধ হয় কতক ক্ষেত্রে তার চেয়েও দুরবস্থায় থাকেন।

ওলন্দাজেরা ধনী হলেও নিজের ধনৈশ্বর্য্য প্রকাশে খুব উদ্ধত নন। বরং তাঁদের জীবন যাত্রার মধ্যে একটা নম্রতা লক্ষ্য করেছি। এরা বেশ অতিথি-পরায়ণ। বিদেশীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করতে ভালবাসে।

সে আপ্যায়নের মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিন্তু আড়ম্বর নেই। ধর্মীয় মতবাদের ক্ষেত্রে ওলন্দাজেরা বেশ পরমতসহিষ্ণু। এক খ্রীষ্টধর্মেরই বহু সম্প্রদায় এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব গীর্জা আছে। হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদীরাও আছেন যারা খ্রীষ্টধর্মের কোন সম্প্রদায় মানেন না। এ ছাড়াও কিছু ওলন্দাজ প্রাচ্য মরমীয়াবাদ, সুফীধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত। নেদারল্যাণ্ডের উত্তরে এক মুসলিম সুফীর ওলন্দাজ শিষ্যশিষ্যাদের একটা নিজস্ব গীর্জা বা প্রার্থনামন্দির আছে।

ভারত সম্বন্ধে সাধারণ ওলন্দাজের আগ্রহ ও অজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। একটী ওলন্দাজ মেয়ের প্রশ্ন : ভারতে রেলওয়ে আছে কিনা। আরেকজনের প্রশ্ন : ভারতবাসীরা কফি নামে পানীয়ের সঙ্গে পরিচিত কিনা। এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কি বৃটিশদের ডোমিনিয়ন ভারতবর্ষ থেকে এসেছি ? আরেকজন ভারতপ্রেমিকা একটী সভায় আমাকে ভারতীয় দেখে কাছে এনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। ভারত সম্পর্কে নানা কথা খুব আগ্রহ সহকারে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমি বিশাল ভারতের কোন কোন থেকে এসেছি। তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললাম, রবীন্দ্রনাথ টেগোরের নাম শুনেছেন তো ? প্রশ্ন করে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। ভদ্রমহিলা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন মনে হল। ভারত সম্পর্কে যিনি এতটা আগ্রহী এবং ওয়াকিবহাল তাঁকে এই সর্ব্বজনবিদিত প্রশ্ন করা। জবাব্ দিলেন : নিশ্চয়ই তিনি তো ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। তাঁর নাম কে না শুনেছে

আমার ডায়েরী থেকে

অর্পণা মুখোপাধ্যায়

আমি টেলিফোন অপারেটর। আজ থেকে উনিশ বছর আগে বেঙ্গল টেলিফোন কেম্পানিতে চাকৃরি পাই। Interview হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ Appoinment letter হাতে পেয়ে যেমন আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম ঠিক সেই মুহুর্ত্তেই চিন্তায় পড়েছিলাম—তারপর? কাজে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনটির কথা বার বার মনে পড়ে। ছাত্রী জীবন শেষ করে ঘরের বাইরে কর্মজীবনে প্রথম পদক্ষেপ। আশা ও আনন্দের সঙ্গে ভয় ভাবনা আশ্রয় নিয়েছে মনের কোণে। অজানা এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ কি জানি কেমন হবে…নানান প্রশ্ন আর জবাব নিজের মনে দিতে দিতে পৌছে গেলাম সেই পুরাতন টেলিফোন অফিসের সামনে। প্রবেশ-দ্বারে দারোয়ানকে নিয়োগ পত্র দেখিয়ে লিফ্‌টের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মফঃস্বলের মেয়ে ছাত্রী জীবনও কেটেছে মফঃস্বলে সুতরাং লিফটের নামই শুনেছিলাম। উপরের দিকে ওঠা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটো আপনা হতেই বোধ হয় বুজে গিয়েছিল। একটা মৃদু ঝাঁকানিতে চোখ খুলে যেতে দেখলাম লিফটম্যান দরজা খুলে দিচ্ছে। লিফটের অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। এবার কোথায়? নিয়োগ পত্রটি নিয়ে এগিয়ে গেলাম বর্ষীয়সী এক ভদ্রমহিলার কাছে। অশেষ করুণা—সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন অপর এক ভদ্রমহিলার কাছে। মহিলাটি ইংরেজ। আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি চেয়ারে বসতে বললেন। সামান্য আলাপ আলোচনায় ভদ্রমহিলার ব্যবহার ও সদা-হাস্যময়ী মুখ দেখে আমি অভিভূত, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠেছিল। পরে জেনেছিলাম উনিই আমাদের লেডি সুপারিনটেন-ডেন্ট। আমার কর্ম্মজীবনে এই ভদ্রমহিলার দান অসামান্য। সুরু হ'ল ট্রেনিং।

তিন মাস কাগজে কলমে আর হাতে নাতে কাজ শেখার পর পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ সুরু হল সুইচ-রুমে। মস্ত বড় ঘর। ঘরের চারিদিকে সারি সারি বোর্ড—বোর্ডে অসংখ্য ছোট ছোট আলো। কানে গ্রাহক যন্ত্র আর মুখের কাছে প্রেরক যন্ত্র। দুটি হাত একের পর এক ঘরে আলোর সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে তারের সংযোগ করায় ব্যস্ত। আমি বলছি উনিশ বছর আগের কথা। আপনাদের নিশ্চই মনে আছে তখন টেলিফোন ছিল হাতের কাজ। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত Number please. নম্বর শুনে সঙ্গে সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেই বলতাম কথা বলুন। এক এক সময় বোর্ডের যেন সব আলোই এক সঙ্গে জ্বলে উঠত। আমাদের হাতের গতি যেত বেড়ে—সকলকেই যথা সম্ভব শীঘ্র কথা বলবার জন্য আমরা আপ্রাণ পরিশ্রম করে তারের যোগাযোগ স্থাপন করার কৃতিত্ব পাবার চেষ্টা করতাম। এক এক সময় আমাদের সাহায্য করতে Supervisor এমন কি Superintendent ও আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজে সহায়তা করতেন। সে শ্রম কল্পনাতীত। আর এর বিনিময়ে আপনাদের সুন্দর ব্যবহারই আমার পুরস্কার।

আজ স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা অনেক সুবিধা নিয়ে এসেছে। আজ আপনার কথা বলার প্রয়োজনে আপনি টেলিফোন তুলে ডায়াল বা মুখপাত ঘুরিয়ে সংযোগ স্থাপন করে আপনার কথা বলা শেষ করছেন। কিন্তু এখনও যে সব exchange এ আজও স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থা চালু হয়নি সেখানে মেয়েরা এবং মফঃস্বল সহরে ছেলে এবং মেয়েরা দিনরাত অপারেটরের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

স্বয়ংক্রীয় হওয়ার অনেক সুবিধা যেমন আপনাদের হয়েছে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও আপনাদের সামনে আসে আর তখনই আপনারা আমাদের ডাকেন…যেমন ডায়াল করেও নম্বর পাচ্ছেন না—নম্বর পেলেও অনবরত engage tone পাচ্ছেন—মফঃস্বলের কারও নম্বর চান—আপনাদের জন্য আমরা সব সময়ই সজাগ। আপনাদের নির্দেশ মত আমরা কাজ করে চলেছি। যেখানে গ্রাহক বা প্রেরকের কথা শোনার অসুবিধা তা যে কোন কারণেই হোক তখনি তা পরীক্ষার ব্যবস্থা আমরাই করি। যে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ রক্ষনা-বেক্ষনের জন্য দিনরাত পারদর্শী যন্ত্রবিদগণ তাঁদের কর্ত্তব্য

করে চলেছেন। আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টা এবং শ্রম সত্ত্বেও অনেক সময় কত রকম ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে—আপনাদের অভিযোগও আসে—আর তা সংশোধনের জন্যই টেলিফোন ভবনে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ এবং একে অপরকে সজাগ সতর্ক এবং সহযোগীতা করে সমগ্র কাজটি সুষ্ঠ পরিচালনায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আজ টেলিফোন একটা অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ। শুধু সহরের বিভিন্ন অংশের জন্য নয়, দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সঙ্গে টেলিফোন মারফতে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুরকে কত নিকট করেছে। ব্যবসা বানিজ্যে বা যে কোন প্রয়োজনে অল্প ব্যয়ে শ্রম এবং সময়ের অপব্যবহার বাঁচিয়ে চলেছে এই টেলিফোন। সুতরাং টেলিফোন ব্যবহার করার সময় আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার এই যন্ত্রটির অপব্যবহার যেন না হয়। কত গ্রাহক অপেক্ষা করে রয়েছে কত প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য। বিলম্বে সংবাদ প্রেরণে বা গ্রহনে কত লোকের কত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

আপনারা নিশ্চয়ই জানতে চাইছেন এত কাজ থাকতে টেলিফোন অফিসে চাকুরী নিলাম কেন? আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন চাকুরি নিলাম কেন? সকলেই একমত সংসারের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করাই হ'ল প্রথম এবং প্রধান কারণ। মা ঠাকুরমার দিনের কথা চিন্তা করুন—সে সময়ের সংসার সমাজ অর্থ নৈতিক অবস্থা এবং আজকের সমাজ সংসার অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনা করুন। আকাশ পাতাল ব্যবধান। মা ঠাকুরমার দিনে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কোন চিন্তা ছিল না আর জিনিষও ছিল পর্য্যাপ্ত কিন্তু আজ প্রত্যেক মধ্যবিত্ত সংসারে বিরাট অর্থ নৈতিক চাপ এসে পড়েছে। যার ফলে মধ্যবিত্ত সংসারের প্রায় অধিকাংশ কর্ত্তারা একার আয়ে সংসারের চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছেন না। তার ডান হাতটিকে শক্ত করার জন্যই চাকুরি করা। আজকের দিনে একার আয়ে সব দিক গুছিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে এমন কিছু অবশিষ্ট হাতে থাকে না। যাতে নিজেদের এবং পুত্র-কন্যার ভবিষ্যত্যের জন্য কোন সঞ্চয় ব্যবস্থা করা সম্ভব। সঞ্চয় তো দূরের কথা কঠিন অসুখে সু-চিকিৎসা করাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর উপর সমস্যা-পুত্র-

কন্যার সু-শিক্ষার ব্যবস্থা। আর অর্থ ই হল সবের মূল্য।

একথা স্বীকার করতে বাধা নেই সংসারে আমরা দুজন পরিশ্রম করে দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে পুত্র-কন্যার সু-শিক্ষার ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়ের মুখ দেখতে পেয়েছি। অন্যদিকে দুজন চাকুরী করায় পুত্র কন্যার উপর কিছুটা চাপ আসে। আয়ার উপর ছেড়ে সারাদিন অফিসে কাজ করার পর তাদের কাছে পাওয়ার কথা একটু চিন্তা করুন উভয়ের মনের অবস্থা কি একটু ভেবে দেখুন? আমরা কর্ত্তা-গিন্নি সারাদিন বাসা ছেড়ে নিজ নিজ কর্ম-স্থানে কাজ সেরে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে চায়ের টেবিলে সুরু হয় ছেলে-মেয়ে-দের খোঁজ খবর! যে দুটি স্কুলে যায় তাদের স্কুলের গল্প তারপর ছোটটার নানান দুষ্টুমির কথা—সব মিলিয়ে আসর বেশ জমে ওঠে। এরপর ছেলে বই নিয়ে চলে যায় কর্ত্তার কাছে। উনি কাগজ পড়ার মাঝে ছেলের পড়া দেখে দেন আর আমি রান্নার দিকটা দেখে এসে মেয়েকে নিয়ে তার পড়ায় মন দিই। বাচ্চাটি মা'র কোল সারাদিন পর পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। ও বুঝতে শিখেছে এখন মা আর ওকে ফেলে কোথাও যাবে না— এখন আরামে ঘুম।

কবিতা

মানুষ আপন অন্তরের আকুতি প্রকাশ করে কাব্যে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কোন দিন কত সহস্র বৎসর পূর্বে তমসার তীরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের কবি তাঁর তপঃসিদ্ধ বীনায় ঝংকার দিয়া গিয়াছেন। আর আজো ঐ দেখ সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝংকার শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছেন।

নিজেকে

উমাদেবী

নিজেকে সবাই ভালবাসি।
আয়নায় ঘুরিয়ে মুখ নানাভাবে
প্রত্যেকেই ভাবি—কেন, মন্দটা বা কি!
গালে হাত বুলাই সাদরে—
চিবুকে ছোঁয়াই বুড়ো আঙুলের ডগা,
মনে মনে ভাবি—আর যা হোক তা হোক
এখনো বা মন্দটা কি।

দু'পাশে ক্রমশ জড়ো হ'তে থাকে
বই খাতা কাগজের বোঝা,
ওদিকে ছড়ানো থাকে টুকি-টাকি জিনিষ পত্তর,
—ঘরে ঝুল, পিঁপড়েরা লাইন বেঁধে ঘোরে—
কোথাও চিনির দানা বুঝি
গড়িয়েছে গোটা কয়,
কিংবা হয়তো চামচে-টাক ছলকে উঠে পড়েছে চা-টাই-
ওদিকে টাঙানো ভিজে শাড়ি,
জানালার পাল্লাটা বন্ধ করাই যায় না,
বৃষ্টি এলে ভিজবেই এ ঘর,
তবু রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হয়—
এ ঘরটা মন্দটা বা কি!
এখানেই—নিশ্চিন্তে ঘুমাই—প্রতি রাত্রে
এবং স্বপ্নের, বিলাসও যথেষ্ট ঘটে—
ঘটে গেছে—ঘটতে পারে—
তাছাড়া এ ঘর—বড্ড চেনা-চেনা।

ঝগড়া হয়—
অবশ্যই সকলের সঙ্গে নয়
ঝগড়া হয় কারো কারো সঙ্গে কদাচিৎ,
বন্ধুদের কাছে—
তার নামে নিন্দা করি—
বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
বলি তার কুৎসিত স্বভাব,
কিংবা এমন সব চারিত্রিক গোপন ঘটনা—
যা কেবল আমি জানি—
আরো বলি—ধরণীর পৃষ্ঠ থেকে
কবে হবে আপদ বিদেয়—
তবু যে মুহূর্তে দেখা হয় পথে যেতে
অমনি খুশিতে ভরে মন,
খোলা আকাশের নীচে
সহিষ্ণু পৃথ্বীতে
আরো কিছু কাল-ও বেঁচে থাক
আরো বেশ কিছু কাল—
মনে মনে বলি।
রাজপথে যেতে যেতে দু'পাশে প্রাসাদ
দেখলেই আমোদে ভরে মন।
নাই থাক অধিকার সম্পত্তির মাটির উপরে,
খুশির আকাশটুকু কে বারণ করে!
কত যে সুন্দর মুখ হৃদয়ের জাল পেতে ধরি,
রূপকথাজগতের মৎস্যকন্যা যত,
কত যে সুন্দর দেহ দৃষ্টির শয্যায়—
চকিতে শায়িত হয়,
সমস্ত বিলিয়ে দেওয়া মুক্তির আমোদে
ছড়ায় রসের ধারা কমলাফুলি রোদে।

পথ কোথায় ?

ডঃ সন্ধ্যা ভাদুড়ী

পথ হারালো, পথ কোথায় কে বলবে ?
প্রতিদিনের পায়ে চলা
নিত্য জানা কথা বলা,
কোথায় সে পথ হারিয়ে গেল কোন্ ভবে,
পথ হারালো, পথ কোথায় কে বলবে ?
রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে রাস্তা নেই—
গলির থেকে কানাগলি
কেবল ঘুরি, কেবল বলি
নিজের মনে, 'এগিয়ে যাব সামনেতেই'
রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে রাস্তা নেই ॥
চারদিকেতে অনেক শাখা প্রশাখা
রাজপথকে জড়িয়ে আছে,
কাকে শুধাই কেই বা কাছে,
মুছল আলো ; কালোর কোলে চাঁদ আঁকা,
চারদিকেতে অনেক শাখা প্রশাখা !
এগিয়ে যেতে পিছিয়ে আসা সেইখানে !
অন্ধকারে স্থির জোনাকি,
সপ্ত ঋষির জ্বলছে আঁখি,
প্রকাণ্ড এক প্রশ্ন যেন মন টানে,
এগিয়ে যেতে পিছিয়ে আসা সেইখানে।
পথ হারালো, পথ যে কোথায় কে জানে ?
আলোর চিহ্ন দেখে দেখে
এগিয়ে যেতে আঁধার থেকে
আঁধারেতেই ঝাঁপিয়ে পড়া কোন্ মনে—
পথ হারালো, পথ যে কোথায় কে জানে ?

—•—

আলিম্পন

জয়ন্তী সেন

সুখের দিনে চোখের তারা
যখন হেসে আত্মহারা
দুহাত ভরা মুক্তা মণি আলোর বরণ
এক গা সুখের অলঙ্করণ,
তখন দেখি লোভীর মত অভুক্ত মন
জানালা খুলেই অচেনা এক ভিন ভুবন।
দোলনা যখন কান্না দোলায় নিজের হাতে
সঙ্গ ছাড়া একলা বসে গভীর রাতে,
তখনও তার করুণ অমোঘ নিঃস্ব মন
আয়না হয়ে ফুটিয়ে তোলে এই জীবন।
কে যে এমন দীপান্বিতার প্রহর ভরে
পিছন থেকে শব্দ বিহীন এক পা করে
এগিয়ে আসে, কি যে সে চায় হাত বাড়িয়ে
মগ্ন যখন খেলাঘরের পুতুল নিয়ে।
ভুলতে বসে সাত কাহিনীর পৃষ্ঠা জুড়ে
বাসি ফুলের মত সে ভয় ফেলছি ছুঁড়ে।
আকাশ ভরা সাতটি রঙের জলসা ঘর
মুগ্ধ মনে তার আশাতেই অতঃপর
দিন কাটাবো ফন্দি করি সযত্নেই
হঠাৎ দেখি ফেলছে ছায়া আবার সেই।
সন্ধানে তার ফুরিয়ে গেল তিন প্রহর
কখনো মেঘ, কখনো ঝড় জীবন ভর,

শেষ বিকেলে চিনতে পেরে অবাক মন
কাচের বুকে আমারই মুখ আলিম্পন।

—•—

বৃষ্টি

মঞ্জুশ্রী দাস

বৃষ্টির, অজস্র বৃষ্টির মরশুম
এসো আমরা বৃষ্টির স্বরে চলি
ঘাস থেকে ঘাসের স্বর
ঘাসের সমুদ্দুর আজ কূল ছাপানো
আমার টস্‌টসে শব্দগুলি
ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে
একটুখানি নীল পরিসর
নন্দিত মুহূর্তের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
মুঠোমুঠো ধানের শীষে ছড়িয়ে পড়ছে
কেমন এক লাইলাক ঘ্রাণ
    পাতা ঝরছে টুপটাপ
        দেওদারে বৃষ্টির স্বর
আজকের ক্যানভাসে কেমন এক জলপাই রঙ
কচি আলোর ছলকানি
চারধারে এক ঝর্ণার শ্যাওলা সবুজ স্বরে
সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে
পাল তোলা সময়
পাতা থেকে ঘাস, ঘাস থেকে পাতায়
মিড়ের উজান
চিকন পাতার ডাল থেকে কিছু শ্যাওলা
বৃষ্টির, অজস্র বৃষ্টির মরশুম
এসো আমরা বৃষ্টির স্বরে চলি।

তবু তো তাকে ছাড়তে পারে না

চিত্রিতা দেবী

সে গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছিল,
খুসীতে ঝলমল করছিল।
মুক্ত ছিল তার ডানা,—বিহঙ্গের মতো।
হঠাৎ সে একদিন পাপ করে বসল।
আর তার তাপে তার হৃদয় শুকিয়ে এল।
খুশীর হাওয়া সব উড়ে গেল শূন্যে।
চুপসানো বেলুনের মতো মনটা
রইল এতটুকু হয়ে।
সে সুখী হবার জন্যেই পাপ করেছিলো।
তবু তার না রইল কোন সুখ,—
না রইল কোন আলো।
তার লোভের সেই পাকা ফলটার গায়ে,
মনের আগুনের হল্কা লাগতে লাগল।
দেখতে দেখতে ফলটা ঝামরে এল।
রোদে পোড়া মৌসুমী ফুলের মত।
তার রং জ্বলে কালো হয়ে গেল।
তবু সে তাকে বুক থেকে
ফেলতে পারল না।
দংশনে দংশনে তাকে ক্ষত-বিক্ষত
করতে করতে
প্রাণপণ বলে সেই ছোট্ট
ফলটুকু আঁকড়ে ধরে রইল।

তার সুখ কামনার উপরে,—
অনুতাপের টুকরো টুকরো কালি।
কালো পতঙ্গের মত ছেঁকে ধরল।
সে বার বার রুদ্ধশ্বাসে, হাতড়ে হাতড়ে
তাদের সরিয়ে দিতে চাইল।
তারা বার বার ধেয়ে ধেয়ে ফিরে এল।
তারা রাতের ঘুম বিদ্ধ করে,
দিনের কাজ দগ্ধ করে।
ওদের উপস্থিতির বিকৃত অসঙ্গতি,
কালো ডানা মেলে ঝুলে রইল।
বাদুড়ের কামড় খাওয়া লোভের
ঐ ফলটার দিকে।
তাকাতে তার ঘৃণা হয়।
তবু তো তাকে ছাড়তে পারে না।

—•—

শ্রীযুক্তঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-কে

হাসিরাশি দেবী

অনেক দিনের আলো, অনেক রাতের অন্ধকার
তোমারে যে অর্ঘ দিল রূপে-রসে-গন্ধে বারবার,—
তুমি তার অকথিত বাণী
মূর্ত্ত কর আনি
নিত্য-নব রূপায়নে, প্রত্যহের পূজার বেদীতে
প্রাণের প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে,—সাধনার নীরব সঙ্গীতে।
হে গুণি! তোমার পূজা এখনও রয়েছে বহু বাকি—
আরতির দীপশিখা সে সংবাদ লেখে,—জাননা কি!
এপথে যে বাধা আছে, এ পথে যে চলার বেদনা
আছে, তুমি জানো, তবু দাঁড়ালে না।
তবু এই পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন কাটায়েছ! নিদ্রাহীন রাত্রি গেছে কেটে?

আরও কতবার
ফিরায়েছ অবসন্নতার
আলিঙ্গন! ফিরায়েছ সমাপ্তির মালা
এপথ যাত্রার; বসিয়া একেলা
জীবনের বীনা-তারে সেধেছ যে সুরটিরে,—তার,
ঝঙ্কার উঠেছে বারবার
মাটির সবুজ আর আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে,—
বেজেছে যে বিচিত্র রাগিনী,—
আমি তারে দূর থেকে শুনি।
শুনি,—আর ভাবি মনে—এ সুর যে চেনা,—
যা গেছে, যা আছে, আর
জীবনের সব দিয়ে কেনা।

—•—

তোমার একতারাটি

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

রাত্রি গভীর স্তব্ধ প্রহর
তড়িত তারকালোকে ;
ঘোলাটে আকাশে অদৃশ্য হতে
নব পত্রিকা লেখে।
যবনিকা টানা রঙ্গমঞ্চ

রহস্যময়ী শঙ্কাত্মার
অস্ফুট ইঙ্গিত।
ইথারে ইথারে জলছবি
আঁকা বর্ণালেখ,
দণ্ড প্রহর, পল, অনুপল
রোমাঞ্চে অনিমেষ।

হঠাৎ কে যেন কথা কয়ে ওঠে
জেগে ওঠে ভোগবতী।
সহস্র ফণা বাসুকী ললাটে
জলে ওঠে লাল মণি।
রক্ত গোলাপে প্রাণের পুষ্পারতি।
চূর্ণ পরাগে চ্যুত মর্মানুরাগ,
পর্ণ কেশরে ক্ষুব্ধ রাত্রি
ব্যথা কাতর।

হায় বুঝি হোল নিঃশেষ
মন মহুয়া ফাগ,
ভয়ার্ত মন গুমরে যন্ত্রণায় ।
শেষ হলো বুঝি যত্নে জমানো
সব সুখ সঞ্চয়,
রোমাঞ্চ ভরা মধু মুহূর্ত
জীবনী সুরঞ্জনা ।
একতারা তুমি মিছে ঝঙ্কারো
স্খলিত যে খঞ্জনা
নাক্ষত্রিক জগতে এখন
নতুন প্রাণোন্মেষ ।

কৌশল্যা তোমার নামে

কাজল ঘোষ

রাস্তার ধারে ঘর
জানালার মধ্য দিয়ে
দৃষ্টি বিনিময়।
কৌশল্যা, বরং এখন তুমি
ঘরেতে এসোনা।
সবাই ব্যস্ত হয়ে
বাইরে দাঁড়িয়ে—,
প্রত্যহ এক স্বপ্ন
একটি নির্দিষ্ট পথ
তোমাকে ফেরাতে হবে
তোমাকে বোঝাতে হবে
এক দুই তিন আর
কলমের কথক আত্মার।
কৌশল্যা সমস্তই রঙ করা
সমুদ্রের বিরাট হৃদয়॥

—*—

রূপ ও রুচি

বেশবিন্যাস

লক্ষ্মী ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ, শুধু বাংলাদেশই বা বলি কেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়নশিল্পীরা বিচিত্র ধরনের শাড়ির পরিকল্পনা ও বয়নে সেদিনের মতো আজও অক্লান্ত ; আঞ্চলিক এই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে শাড়ির বয়ন নৈপুণ্যে, বর্ণে এবং চিত্র সমারোহে। ঢাকাই শাড়ির বয়ন নৈপুণ্য, বালুচরী শাড়ির বর্ণসমারোহ এবং বর্ণ-বৈচিত্র, ধূপছায়া চিত্রমাধুর্য এ প্রসংঙ্গে নিশ্চয়ই অনুল্লেখ্য নয়। বাংলাদেশের বাইরেও রাজস্থান, মাদ্রাজ এবং অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চলের শাড়ির বর্ণাঢ্যতাও এই প্রসংঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতবর্ষে শাড়ি ছাড়াও অন্যতর পোষাকও মেয়েরা পরে থাকেন। পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচলিত শালোয়ার ও কামিজ এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। অধুনা প্রয়োজনের তাগিদে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অছিলায়, বাংলার তরুণীরাও উত্তর ভারতের শালোয়ার কামিজে নিজেদের মনোহারিকা করে তুলছেন। এ ধরনের পোষাকের বৈচিত্র্যও কোন অংশে কম নয়। কামিজের বর্ণময়তার সংগে কারুকার্য শালীনতার সংগে রুচি ও সৌন্দর্য-প্রিয়তার অপরূপ সমন্বয় সাধনেরই নামান্তর। এ পোষাকের আধুনিকতা নিঃসঙ্কোচ অথচ নম্র। রূপোর ঝুমকো এ পোষাককে ব্রীড়ায় আড়ষ্ট করে না। নতুনতর সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে।

প্রাচীনকালের মতো একালেও নারীদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়তো স্বর্ণ বা মূল্যবান পাথর নির্মিত না হয়ে, হয় রৌপ্য, কাঁচ বা স্বল্প মূল্যের পাথর বা ধাতুর। অর্থনৈতিক কারণেই আজ সোনা বা মূল্যবান পাথর অপস্রয়মান ; কিন্তু সে অপসারণ অলঙ্করণের বিশেষ কোনো ক্ষতি সাধন করে নি বা করতে পারে নি ; কেন না, নিজেকে সুসজ্জিত করার বাসনা নারীর মনজাত প্রবৃত্তি। প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুযায়ীই তা ঘটে।

যুগে বা কালে সাজের যে তারতম্য দেখা যায় তা' নিয়ে অনেকে বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন; অনেকে 'গেল গেল' রবে সরব হ'ন। নাভিমণ্ডলের নিম্নাঞ্চল শাড়ি পরা এবং হাতকাটা ছোটজামা পরা প্রভৃতি সজ্জার যে ধরন অধুনা আমাদের চোখে পড়ে তা' কতকটা প্রয়োজনের খাতিরে, কিছুটা বা তার বিদ্রোহ মাত্র। যদি তা' নেহাতই কুরুচির পরিচায়ক হয় তবে এইটুকু মনে রাখলেই হবে যে চলিষ্ণু সমাজ-স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে স্থায়ি হ'তে দেবে না। অতএব মাভৈঃ।

"মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখনো বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালেও পারিবে না।"

স্বামী বিবেকানন্দ

আয়নার সামনে বৈষ্ণব যুগের রূপসজ্জা

দীপালি রায়

রবীন্দ্রনাথ নারীদেহের সৌন্দর্যকেই বলেছেন, 'সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা।' নিসর্গ-সৌন্দর্যের চেয়ে মানুষের দেহসৌন্দর্য কেন অনেক বেশি সুন্দর তার কারণও কবি বলেছেন। বলেছেন, ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদের বেশি আকর্ষণ করে, কেন না মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে। আর আছে ভালোবাসার অমৃত। কবির কাব্যলোকে পুষ্প নারীকে বলছে।

"সুন্দর আমাতে আছে আমি
তোমাতে সে হ'ল ভালোবাসা।"

বৈষ্ণবযুগে বাংলাদেশ প্রেমের প্রদীপ জালিয়েই সৌন্দর্যের আরতি করেছে। খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীকে বলা যেতে পারে বাংলার বৈষ্ণবযুগ। সে যুগ ছিল বাংলা ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। দিব্যপ্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই সেই স্বর্ণ যুগে বাঙালী চারুশীলনের চরমে পৌঁছেছিল সে যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রতীকেই বাঙালীর প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয়েছে। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি বলেছেন :

তুঙ্গ মামমন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে মেঘরুচি বসন-পরিধানা। উত্তুঙ্গ প্রেমের মন্দিরে রাধাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণব কবিগণ সেই অতুলনীয় প্রেমমূর্তিকে যে সকল প্রসাধন ও আভরণে সজ্জিত করেছেন তার মধ্যেই পাওয়া যাবে বৈষ্ণবযুগের নারীর রূপসজ্জার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাধার রূপবর্ণনায় বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন।

তিনভুবন জন মোহিনী।
রতিরস কাম-দোহিনী॥
শিরীষ কুসুম কোঙলী।
অদভুত কণক পুতলী॥

এই অদ্ভুত কণক পুতলীর মণ্ডনকলাতেই বৈষ্ণবযুগে নারীর রূপচর্চার ষ্ঠ সৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

বৈষ্ণবযুগের রসনাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণিতে রাধার বিগ্রহ ও বেশভূষার বর্ণনায় া হয়েছে, তাঁর শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশ রচনা ষোড়শ এবং তাঁর আভরণ দ্বাদশ কার। ধৃত ষোড়শ শৃঙ্গারা রাধা হলেন, স্নাতা, তাঁর নাসাগ্রে দেদীপ্যমান ণি; পরিধানে নীল বসন, কটিতটে নীবীবন্ধন, মস্তকে বেণী, কর্ণে উত্তংস, ঙ্গে কর্পূর কস্তুরী ও চন্দনাদি রচিত অনুলেপন, চিকুরে কুসুম, গলদেশে পমালা, হস্তে লীলাকমল, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, নয়নে কজ্জল, ণ্ডাদিতে মৃগমদরচিত সুচিত্রা, চরণে অলক্ত করাগ এবং ললাটে তিলক।

রাধার দ্বাদশ আভরণের মধ্যে আছে; চূড়ায় দিব্য মনীন্দ্র,কর্ণদ্বয়ে স্বর্ণ-রচিত কুণ্ডল, নিতম্বে স্বর্ণকাঞ্চী, গলদেশে নিষ্ক অর্থাৎ পদক, কর্ণোপরি শলাকা, করে বলয়াবলী, কণ্ঠে কণ্ঠহার, বক্ষোদেশে তারাবলী হার, ভুজে ঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, চরণে রত্ননূপুর, এবং পদাঙ্গুলিসমূহে উত্তুঙ্গ ঙ্গুরীয়ক।

এই বিচিত্র শৃঙ্গার ও আভরণের তালিকায় বৈষ্ণবযুগের ধরার রূপসজ্জার চিত্র ফুটে উঠছে তাকে মোটামুটি তিনভাগে বিন্যস্ত করা যায়: অঙ্গসজ্জা, লংকার ও বেশভূষা।

অঙ্গসজ্জার একটা প্রধান অংশ ছিল ললিত অনুলেপন। কর্পূর সুবাসিত নই অনুলেপন হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হত। কপালে চন্দনের তিলক, চিবুকে স্তুরীবিন্দু, বক্ষোদেশে চন্দনের পত্রলেখা ছিল অঙ্গসজ্জার অপরিহার্য অঙ্গ। জলে রঞ্জিত নয়নযুগল এবং অলক্তকরাঞ্জিত পদযুগ সকল যুগেরই নারীর পসজ্জার অংশ ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন, রাধার 'কাজলে উজল' লস লোচন দেখে নীলপদ্ম লজ্জায় জলে লুকিয়েছে। কৃষ্ণের সামনে দিয়ে ধা আলতাপরা পায়ে চলে যাচ্ছেন। মাটিতে তার পা আলতোভাবে ড়ছে, আর কৃষ্ণের মনে হচ্ছে যেন স্থলপদ্মের পাপড়ি খসে খসে পড়ছে।

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥

ঁথিতে সিঁদুর এবং কপালের মাঝখানে বড়ো করে সিঁদুরের ফোঁটা যে কী

অপূর্ব হত তার কথাও বলেছেন বৈষ্ণব কবিরা। বড়ু চণ্ডীদাস বলছেন, রাধার সিঁথিতে সিঁদুর দেখে মনে হচ্ছে, যেন সজল মেঘের মাঝে সূর্যোদয় হয়েছে :

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর॥

কপালে সিন্দুর বিন্দু সম্পর্কে বিদ্যাপতির বর্ণনাটি অতুলনীয়। রাধার মুখখানি যেন নিকলঙ্ক চন্দ্র, কপালের সিন্দুর বিন্দু যেন সূর্য। কেশভার এলিয়ে দিয়ে রাধা যখন কপালে সিন্দুরবিন্দু ধারণ করছেন তখন যেন অন্ধকার আকাশে একই সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যোদয় হয়েছে।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুরভার।
জনু রবিশশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥

সে যুগে কুঞ্চিত কেশকলাপ অনবদ্য মর্যাদা পেয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস বলছেন, রাধার ললিত অলকপরক্তির কান্তি দেখে কুঞ্চিত কৃষ্ণ তমালককলি বনবাসি হয়েছে।

ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বনমাঝে॥

বিচিত্র রীতির বেনীবন্ধন এবং কবরীরচনা মেয়েদের কেশকলাপের সৌন্দর্য বাড়াতো। জ্ঞানদাসের একটি পদে বেনীবন্ধনের বর্ণনায় আছে।

বেণিয়ে বান্ধল বেনন জাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥

অর্থাৎ বেনন জাদকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেন মনে হচ্ছে আধ-ফোটা পদ্ম অধোমুখ পদ্ম অধোমুখ হয়ে আছে। ফুলের মালা দিয়ে বিচিত্র ছাদের কবরীবন্ধন রূপসজ্জায় যে অনেকখানি স্থান পেত বলাই বাহুল্য কবি বলেছেন,

কামড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥

কানড় অর্থ নীলপদ্ম। কানড় ছন্দে কবরীবন্ধন অর্থাৎ কেশকলাপের নীলপদ্ম প্রস্ফুটন।

বৈষ্ণবযুগে মেয়েদের অলংকার একটু জমকালো ছিল বলেই মনে হয়। রাধার দ্বাদশ আভরণের প্রথমেই আছে চূড়ায় দিব্য মনীন্দ্র। সিঁথির অলংকারটিও ছিল মণিরত্নখচিত। শ্রবণযুগলে কুণ্ডল তো ছিলই, আরো ছিল চক্রীশলাকা। নাসায় বেসর ছিল, মণিপুষ্পও পরা হতো সূক্ষ্ম চারুতায়। গলায় পদক, কণ্ঠে কণ্ঠহার, বক্ষোদেশে তারাবলী মালা, বাহুতে অঙ্গদ বলয় কঙ্কন তো ছিলই, শাঁখাও ছিল অপরিহার্য। কবি বলছেন,

শঙ্খ ঝলমলি সুবাহু দোলা
কিয়ে সরু সরু শশীর কলা ॥

প্রতিপদের শশিকলার মতো সরু শাঁখা ছিল পবিত্র শুভ্রতার প্রতীক। হাতের আঙুলে আংটি তো ছিলই, নখগুলিও চারুতায় চিত্রিত হত। কবি বলছেন,

কর কোকনদ নখর মনি।
অঙ্গুলে মুদরি মকুর জিনি ॥

সে যুগে মেয়েরা নিতম্বে স্বর্ণকাঞ্চী পরতেন। আর পায়ে পরতের মঞ্জীর ও নূপুর। পায়ের আঙুলও উঁচু উঁচু অংটিতে সাজানো হত। পদ নখরঞ্জনী ও ছিল বিচিত্র বর্ণের। রঞ্জিত পদনখের চন্দ্রকান্দি ছিল সবচেয়ে মনোহর।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে বেশভূষা রচনা ছিল বৈষ্ণযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাধার অভিসার বর্ণনায় তার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিয়মিলনের জন্য গোপনে সংকেতস্থানে গমনের নাম অভিসার। দিনে অথবা রাত্রে, বর্ষায় অথবা বসন্তে জ্যোৎস্নালোকে অথবা ঘনতমসাবৃত রজনীতে প্রেমিকা যখন অভিসারে বেরোতেন তখন তার সাজসজ্জা হত সেই সেই পরিবেশের অনুরূপ। রাধার জ্যোৎস্নাভিসারের বর্ণনায় গোবিন্দদাস বলছেন,

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দন চরচিত রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর ॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি ॥

ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥

অঙ্গে ধবল বিভূষণ, ধবল বসন, ধবলিম কৌমুদীর সঙ্গে দেহকান্তি মিলিয়ে অভিসারিকার এই অঙ্গসজ্জা অনবদ্য। জ্যোৎস্নাভিসারে যেমন সবই কৌমুদীরুচি, তিমিরাভিসারে তেমনি সমস্ত আবরণ ও আভরণই কজ্জল সন্নিভ। কবি বলছেন,

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পরিহণ নীল নিচোল॥

"এ প্রতিমা কখনো মিথ্যা বিষয়ের প্রতিমা নহে—তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া এত কোটী লোকে, এত উল্লাসের সহিত কখনো ইহা পূজা করিত না। যাহা মনুষ্য হৃদয়ে বদ্ধমূল তাহা কখনো মিথ্যা নহে।"

বঙ্কিমচন্দ্র

নারীর সৌন্দর্য

পুতুল রায়

'কদলীব তন্বী'—সংস্কৃত কাব্যের একথাটি মেয়েদের উপলক্ষ করে পুরুষের উক্তি।

বস্তুতঃ কলার সৌন্দর্য সৌন্দর্য-কলার উপমা। পুরুষের চোখে সুন্দর হওয়া এবং পুরুষের স্তুতি কুড়ানো মেয়েদের মন ভরায়। চোখে পড়বার মতন ছিমছাম স্লিমফিগার শুধু আজকের দিনের ফ্যাসন নয়—এটা চিরকালের ফ্যাসন। মোটাসোটা ভারিক্কি ভারের দেহ সেকালের গিন্নীবান্নীদের—একালেরও। কিন্তু ছিপছিপে না হোক্—ছিমছাম গড়ন শুধু সৌন্দর্যের জন্যে নয়—কাজ করার জন্যেও দরকার। বিশেষ করে আজকের দিনের মেয়েদের পক্ষে যাদের ঘরে বাইরে তু'জায়গাতেই কাজ করতে হয়। যাদের বাইরে উপার্জনের ক্ষেত্রে খাটতে হয় আবার ঘরেও সৌন্দর্য-লক্ষ্মী হয়ে স্বামীর এবং আত্মীয়-পরিজনের চোখ এবং মন ভরাতে হয়। শরীরে এই ছিমছাম ভাব বজায় রাখা যায় কেমন করে?

হঠাৎ মেয়েরা, বিশেষ করে বিয়ে হবার পর দেখেন তাঁরা মোটা হয়ে যাচ্ছেন। কেন, এমন হন?

অনেকের ধারনা বয়সের জন্যে শরীর ভারী হয়ে যায়। বয়েসের জন্য শরীরের ওজন বাড়ে না। শরীরের ওজন ব্যালেন্স ফুডের অভাবে; আর বেশি খাওয়া এবং পরিশ্রমের অভাবে। আমার এ-কথা অনেকেই হয়ত প্রতিবাদ করবেন। বলবেন, 'আজকের দিনের বেশির ভাগ মেয়েরাই খাটেন বেশি। তাঁদের ঘরে-বাইরে কাজ।

না, তা ঠিক নয়। তাঁদের বাইরের কাজে মানসিক পরিশ্রম বেশি, আর ঘরের কাজও শারিরীক পরিশ্রমের অভাব।

ঘরের কাজ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে নিজেরাই করে। তারাই আবার রান্নাবান্নাও করে। বাইরে কাজ, ঘরে এসে রাঁধা-বাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা—অর্থাৎ যাতে শারীরিক শ্রম হয়—তা সম্পন্ন করা আর চলে না।

যদিও এ-যুগে বাইরের কাজ করা মেয়েদের ঘরের তত্ত্বাবধানের কাজও বড় কম নয়। কিন্তু তাতে মানসিক পরিশ্রমই বেশি হয়; শক্তি ক্ষয় হয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকে না। তাই শরীরকে কাব্যের নায়িকা করে রাখা কঠিন হয়ে ওঠে।

মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আজকের মেয়েরা শারীরিক পরিশ্রম করতে ঠিক মতন পারেন না যখন তখন শরীরকে ছিমছাম রাখার পদ্ধতি কী?

এপদ্ধতি মেয়েদের নিজেদের হাতেই আছে।

স্বাস্থ্য শুধু দৈহিক স্বীকৃতি নয়। স্বাস্থ্য সুন্দর সুঠাম চেহারা।

আগেকার দিনের মেয়েরা এই চেহারা প্রাকৃতিক কারণে বজায় রাখতে পারতেন—জীবন-ধরনের প্রণালীও ছিল এ বিষয়ে সাহায্যকারী।

সকালে উঠে ঘর নিকানো—ঘর ঝাঁট দেওয়া. বাসন-মাজা, রান্না-বান্না করা—সব কিছুই শারীরিক পরিশ্রম সাপেক্ষ। আবার প্রাতঃ স্নান. পুজা-ঘরের পবিত্র পরিবেশ, সূর্যের আলো গায়ে লাগানো—এগুলি মানসিক স্বাস্থ্যের উপকরণ ছিল।

আগেকার দিনে আমাদের মেয়েদের সর্বাংশে ফিরে যাওয়া আর সম্ভবপর নয়—কিন্তু শরীর মনের স্বাস্থ্যের উপকরণগুলিকে অগ্রাহ্য না করলেও তো পারি। শুধু ট্রামে-বাসে, মোটরে ট্যাকসিতে, রিক্সায় না বেড়িয়ে খোলা-মেলা জায়গায় একটু বেড়ান। অখাদ্য কুখাদ্য আদি ভোজনের লোককে দমন করে খাদ্য তালিকায় স্বাস্থ্যকর এবং মাত্রা সম্পূর্ণ আহারের ব্যবস্থা করা, একটু করে ব্যায়াম করা সংসারটাকে পরিষ্কার এবং পবিত্র পরিবেশে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করা—এমনকি দুঃসাধ্য?

প্রসাধনের মধ্যেও উগ্রতাকে বর্জন করে স্বাভাবিকতা—শুধু আপনাকে কেন সকলকেই খুশি করে। যেমন এখনো বলি—'চেহারা ত নয়' যেন দুর্গা প্রতিমা।' এই প্রতিমা সদৃশ সাজ পোশাকে ব্যয় বাহুল্য নেই—আছে শুচি-শুভ্র ভাব। আর আছে দেহ-মনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শরীরের সঙ্গে মনটাকে যদি আমরা এম্‌নেটিক করে তোলার যত্নে উদ্যোগী হই—তা হলে এ-কালে মেয়েরা কিছুটা সেকালের শুচি-শুভ্রতায় নিশ্চয়ই পুরুষের মনোরঞ্জন করতে পারেন।

যে-মেয়েটি লক্ষ্মী-প্রতিমা সদৃশ কোমলতায়, শালীনতায় পথে-ঘাটে চলেন

তাঁর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই তাকিয়ে থাকি—যদিও কামনা থাকে—কাম-গন্ধ থাকে না।

আর উগ্র-সাজে বে-ঢপ শরীরে যে মেয়েটিকে দেখি তাকে কী সৌন্দর্যবুদ্ধি দিয়ে তারিফ করি ?

পূর্বের কথায় আবার ফিরে আসি।

'কদলীর তন্বী'—নারী-দেহের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে উগ্র সাজ-পোশাকের দরকার হয় না—যেমন তেমন ভাবে শুধু পরিচ্ছন্ন সাজে তাঁরা আমাদের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রীকে দেখে আমরা আমাদের মাতৃভাব, ভগ্নিভাব, কন্যাভাব এবং পত্নীভাবের সামগ্রিকতাকে উপলব্ধি করি।

পরিমিত আহার, সুনিয়মিত জীবন-যাত্রা, যেখানে গার্হস্থ্য-জীবনে প্রেম, ভালোবাসা, প্রীতি, স্নিগ্ধতা এবং কোমলতার স্পর্শ আছে, সংসারে মানিয়ে চলার অভ্যাস, বিশেষ উত্তেজনামূলক খাদ্য এবং জীবন-যাত্রার প্রণালী থেকে আত্মরক্ষা—এগুলি শুধু মেয়েলি গুণ নয়—এদের মধ্যে নারীর স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের লক্ষণও আছে।

সৌন্দর্য শুধু দেহে নয়, মনে এবং আত্মায়।

তাই দেহকে সুশ্রী করতে হলে মনকে সুশ্রী করা দরকার।

মনের উর্দ্ধের আত্মা এবং তা শুধু ব্যক্তির নয়। এই আত্মাকে ঘিরে আমাদের সাধনা। সে সাধনাকে ইটোপিয়ান বলে উপহাস করা চলে না। দেহ থেকে মন এবং মন থেকে আত্মা। এরই সর্বাঙ্গীন সাধনা আমাদের মেয়েদের সৌন্দর্য সাধনার মূল কথা।

আজকের মেয়েরা দেহের স্থূলতা চান না ; কিন্তু মনের স্থূলতার দিকে লক্ষ্য রাখছেন কই ?

তাই বলি সৌন্দর্য-কলা সাধনায় দেহ, মন এবং আত্মার সমন্বয় সাধন দরকার।

নারীর সৌন্দর্য শুধু দৈহিক খাদ্য, দৈহিক কাজকর্ম এবং ব্যায়াম নয় ; পরন্তু তার মধ্যে মনের সৌন্দর্য এবং আত্মার প্রসারতাও দরকার।

মুখের উজ্জ্বলতা

আভা পাকড়াশী

আমরা বেশীর ভাগ মেয়েরাই আজকাল মেক-আপ ছাড়া বাইরে বেরুতেই পারিনা! নানা রং এর ক্রীম বা ফাউণ্ডেসন ক্রীম আর পাউডারের প্রলেপ মুখের ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে আমরা যথেষ্ট তৎপর কিন্তু মুখশ্রী বজায় রাখার জন্য তেমন কোন চেষ্টা আমাদের আছে কি? এখানে মুখশ্রী বলতে আমি মুখের আসল শ্রীর কথাই বলতে চাইছি কিন্তু! এই শ্রী ক্রমাগত নানা রকম কড়া মেক-আপ ব্যবহার করতে গিয়ে ক্রমে ক্রমে একেবারেই হারিয়ে যায়! নানা রকম কেমিক্যাল অ্যাকসন ও হয় এর দরুণ! এইসব কারণেই মুখের পেলবতার স্থায়িত্বের জন্য আলাদা করে একটু যত্ন নেওয়া বিশেষ দরকার।

অনুকরণ ভাল নয় কিন্তু শীকরণ তো সব সময়েই বরণীয়! বিদেশিনী মহিলারা মেক-আপ করেন চূড়ান্ত, কিন্তু রাত্রে শোবার আগে সমস্ত মেক-আপ তুলে ফেলতে কখনই অবহেলা করেন না কিম্বা সপ্তাহে অন্ততঃ একটিবার মুখে ফেসপ্যাকের প্রলেপ দিতে ভোলেন না। এর দরুণ যতই তাঁরা মেক আপ করুণ তবু এঁদের মুখের ত্বক থাকে নিটোল! আমাদের বাঙ্গালীর ত্বক স্বভাব নিটোল তাতে আমরা সর্বদা কিছু মেক আপ করি না! সুতরাং আমরা যদি ফেসপ্যাক ব্যবহার করি তাহলে মুখের উজ্জ্বলতা হবে এত বেশী মেক আপের হয়তো বিশেষ প্রয়োজনই হবে না। মুখ খানি হবে তখন নিদাগ, নিটোল প্রতিমার মুখের মত পেলব আর সুশ্রী!

মুখখানি নিটোল দেখতে হলে মেক আপ করাটাই বড় কথা নয়। একবার মেক আপ করা মুখে অভ্যস্ত হয়ে গেলে মেক আপ ছাড়া আপনি নিজেও কারুর সামনে বেরুতে পারবেন না তাছাড়া আপনাকে মেক-আপ ছাড়া কেউ দেখলেও বলবে—বাবাঃ সন্ধ্যেবেলা মহিলাকে দেখলাম কি সুন্দর আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। ভবেই বুঝুন! তার চেয়ে ভেতরটা যদি ভাল করতে পারেন তবে মুখে সেই সুস্থতার উজ্জ্বল ছাপ ফুটে উঠবেই।

তাই যাঁরা সত্যিই মুখখানিকে এমন নিটোল করতে উৎসুক তাঁদের জন্ত আমি কিছু কিছু সহজ সাজেস্‌শান দিচ্ছি। বিউটি সেলুন এ গিয়ে ফেসিয়াল করাতে হলে মুখের ত্বকের যে পরিচর্য্যা তাঁরা করে থাকেন সেটি সত্যিই খুবই উপকার দেয়। কিন্তু বার বার সেখানে যাওয়া খরচ সাপেক্ষ। আবার সময় সাপেক্ষও। বিলিতি ফেসপ্যাক, বা অন্তান্ত বিউটি ক্রীম বা ব্লিচিং ক্রীম কিনতেও যথেষ্ট টাকার দরকার। কিন্তু মুখের ত্বকের যত্ন নেবার সঠিক তথ্যটি যদি জানা থাকে তাহলে ঘরে বসেও অত্যন্ত কম খরচে অবিকল ঠিক সেই একই উপকার পেতে পারেন।

মনে করুন সেকালের ঠাকুমা দিদিমায়ের রং আর ত্বকের কথা। ঘরের জিনিষ দিয়েই কিন্তু তাঁরা রূপচর্চা সারতেন আর তার দরুণ যতটা উপকার তাঁরা পেতেন সেটা তো বুঝতে পারছেন। সুতরাং একালেই বা সেগুলিকে একালের মত করে ব্যবহার করবনা কেন। সুতরাং আপনার মুখে-ত্বকের পরিচর্য্যার জন্ত হাতের কাছে প্রথমেই যা যা প্রয়োজন হচ্ছে তা হল একটি গায়ে মাখা সাবান। নরম একটি তোয়ালে। গোটা কয়েক বরফের টুকরো বা ঠাণ্ডা জল, কোল্ডক্রীম সামান্ত তুলো। এ ছাড়া যে কোন একটি ফেসক্যাপ আপনার ত্বকের জন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন। আর গজ দুয়েক ব্যাণ্ডেজও চাই, কিম্বা একটি স্কার্ফ।

মাথার চুলগুলো বেশ করে এই ব্যাণ্ডেজ বা স্কার্ফ দিয়ে পেছন দিকে টেনে বাঁধুন। সামনের দিকের চুল যেন ঢাকা থাকে এই ভাবে বাঁধুন।

সাবান মেখে অল্প গরম জল দিয়ে বেশ করে মুখটা ধুয়ে ফেলুন। এবার তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে মুখের জলটা শুকিয়ে নিন। সব প্রথমেই বলি চোখের নিচের দিকের ত্বক কিন্তু বিশেষ নরম। যাই করবেন চোখের চারধারটুকু বাদ দিয়ে করবেন।

তখন বরফের মধ্যে কিম্বা ঠাণ্ডা জলে তুলো ভেজান। এবার বেশ তাড়াতাড়ি সারা মুখে আর গলায় ঐ তুলো গোল গোল চক্কর এঁকে বোলান। সাবধান! চোখের চারধার কিন্তু বাদ। বার দুয়েক হয়ে গেলেই মুখটা আবার মুছে নিন।

এবার সারা মুখে, গলায় কোল্ডক্রীম মাখুন। রগড়াবেন না কিন্তু। ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করবেন। অবশ্ত যাদের তেলাল ত্বক তাঁরা এই ক্রীম মাখা বাদ

দিয়ে বরং এইভাবে শশার রস মাখুন। দুহাতেরই প্রথম তিনটি আঙুল দিয়ে আলগা হাতে মুখের ত্বক ওপর দিকে তুলে তুলে ধীরে ধীরে ম্যাসাজ চালিয়ে যান। তারপর ভিজে তুলো দিয়ে বাড়ীতে ক্রীমটি মুছে ফেলুন।

এখন আর মুখে আর গলায় ফেসপ্যাক দিন। বড় দুটি টুকরো ভিজে তুলো চোখের ওপর চাপা দিয়ে নিন।

সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। দু পায়ের হাঁটুর নীচে একটি দিয়ে পা দুদিকে একটু উঁচু করে নেবেন।

মিনিট পনের পরে উঠে অল্প গরম জল দিয়ে ফেসপ্যাক তুলে ফেলুন। তারপরই ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন, মুখটি ধীরে মুছবেন। এবার আস্তে আস্তে মুখের ত্বকে এ তিন আঙুলে নীচে থেকে মৃদু মৃদু টোকা দিন।

এইভাবে যদি হপ্তায় দুবার কি একবারও আপনি নিয়মিত মুখের যত্ন নিতে নিতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার মুখখানি কেমন নিটোল আর উজ্জল থাকে। ঐ ম্যাসাজের দরুণ অযথা মেদ জমে মুখ ভারীও হবে না আবার ক্লান্ত ত্বকের দরুণ মুখটি শুকনোও দেখাবেনা উপরন্তু পুরন্ত মুখখানি স্বাস্থ্যের আভায় যেন টলটল করবে। কোন রকম কোন মেক-আপ ব্যতিরেকেই মুখখানি উজ্জল দেখাবে। মুখের পেলবতার সঙ্গে সঙ্গে রংও অনেক ফর্সা দেখাবে।

এবার কয়েকটি ফেসপ্যাকের কথা বলছি। আপনার ত্বক অনুযায়ী বেছে নেবেন।—কেমন!

যাঁদের ত্বক খসখসে তাঁদের জন্য এটি উপকারী হবে। (১) একটি ডিমের কুসুম। এক চায়ের চামচ বাদাম তেল। ফোঁটা ফোঁটা করে তেলটি ফেলে ডিমের কুসুমের সঙ্গে মেশাবেন। তারপর বেশ করে ফেঁটিয়ে নেবেন। পনের থেকে কুড়ি মিনিটি এটি মুখে আর গলায় মেখে থাকবেন তারপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।

যাঁদের ত্বক সাধারণ পর্যায়ের তাঁদের পক্ষে এটি ভাল—

২। দুই টেবিল চামচ ময়দা দুধের সঙ্গে গুলে নিয়ে তার সঙ্গে একটু গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এবার এটি গলায় মুখে মাখুন। পনের মিনিট রাখুন। তারপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

যাদের ত্বক বেশ তেলাল এটি তাঁদের পক্ষে ভাল।

৩। সমান মাপে কর্ণফ্লাওয়ার আর ট্যালকাম পাউডার মেশান। সামান্য ঠাণ্ডা জল দিয়ে বেশ করে ফেটাতে থাকুন। দুটোতে মিশে গিয়ে বেশ পরিজের মত হবে। মিনিট কুড়ি এটি মুখে গলায় মেখে থাকুন। এবার বৃষ্টির জল বা গোলাপ জল দিয়ে উঠিয়ে ফেলুন।

সুতরাং মুখের ত্বককে তিন ভাগে ভাগ করে নিলে ফেসক্যাপ বা মুখের প্রলেপের ব্যবহার সহজ হবে।

১। শুকনো ত্বক ২। তৈলাক্ত ত্বক ৩। সাধারণ ত্বক।

সাধারণতঃ ত্বক হয় এই তিন ধরনের। এখন নিজের মুখের ত্বক কেমন সেটা ঠিক করে নিয়ে এই প্রলেপগুলি ইচ্ছেমত কাজে লাগান। ত্বক যে কেমন তা বিচার করবার সহজ উপায় হল সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখ আয়নায় দেখুন। যদি মুখ ভরা তেলতেলে ভাব থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার মুখের ত্বক তৈলাক্ত। যদি দেখেন খসখসে তাহলে শুকনো। দুয়ে মেলান হলে সাধারণ ত্বক। এবারে ঐ প্রলেপগুলির কথা বলছি। যার যেমন দরকার আর সুবিধে তেমনি বেছে নেবেন। আগেও একটি একটি করে তিনটি বলেছি এবার আরও বলছি।

শুকনো ত্বকের জন্য

(ক) বড় দু চামচ ময়দার সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা করে সলিভ অয়েল মেশান। বেশ একটু মাথা মাথা না হওয়া পর্যন্ত মিশিয়ে যাবেন। এবার এটি গলায় আর মুখে মাখুন। আধঘণ্টা পর্যন্ত রাখতে পারলে খুবই ভাল হয়। বৃষ্টির জল যদি একটু ধরে রাখতে পারেন তবে তাই দিয়ে নয়তো গোলাপ জল দিয়ে পরে এটি তুলে ফেলুন।

(খ) ভাল সাদা মাখন বা ঘি চায়ের চামচের আধ চামচ কেকের সঙ্গে বেশ করর মেশান। মিনিট পনের এটির প্রলেপ মুখে গলায় রাখুন। তারপর গরম জল আর সাবান দিয়ে তুলে ফেলুন। এটির গন্ধ ভাল নয় কিন্তু মুখের ত্বক মসৃণ করতে এর জুড়ি নেই।

সাধারণ ত্বকের জন্য

(ক) সামান্য একটু আটা জলে গুলে নরম আঁচে একটু জাল দিন।

বেশ পরিজের মত হবে। সামান্য গরম থাকতে থাকতে প্রলেপ দিন। মিনিট পনের কুড়ি পরে সাবান গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

(খ) সামান্য বাদাম তেলের সঙ্গে এক চামচ মধু মেশান। গলায় মুখে মাখুন। মিনিট পনের পরে বৃষ্টির জল বা গোলাপ জল দিয়ে মুছে ফেলুন। এটিতে মুখে চোখে যদি রিঙ্কলস্ থাকে তা হলে খুবই উপকার দেবে।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য।

(ক) একটি মুর্গির ডিমের সাদা অংশটি বেশ করে ফোটিয়ে নিন। তারপর সমস্ত মুখে গলায় মাখুন। শুকিয়ে গিয়ে বেশ ফকটু টান ধরবে তারপর উস্‌ল উস্‌ম গরম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্রলেপটিও রিঙ্কলস্ এর জন্য যথেষ্ট উপকারী।

(খ) গরম কালের জন্য এই প্রলেপটি খুবই আরামপ্রদ আর উপকারী। একটি ছোট শশা ছাড়িয়ে থেঁতো করে রস বার করে নিন। তার সাথে কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস আর একটু গোলাপ জল মেশান। এবার পাতলা গেজ্ (gauze) বা পাতলা কাপড় এই রসে ভিজিয়ে সমস্ত মুখ ঢেকে মিনিট পনের কুড়ি থাকুন। তারপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এতেও রিঙ্কলস্ মিলিয়ে যায় আর মুখখানি স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে জল জল করে।

কিন্তু কয়েকটি কথা মনে রাখবেন সব সময়—চোখের চার দিকের নরম ত্বকের ওপর কোন রকম প্রলেপ দেবেন না। যে সময় বলে দিয়েছি তার চেয়ে বেশী সময় মুখে প্রলেপ রাখবেন না। আর হাতে একটু সময় নিয়ে মুখে পেবলতা ফিরিয়ে আনাতে মন দেবেন। ঐ সময়টুকু একটু শুয়ে বিশ্রাম নিন। কেমন।

কি ধরনের উপকার পাচ্ছেন এগুলির ব্যবহারে জানালে খুশী হব।

দেহশ্রী—দেহ পরিচর্য্যার তালিকা

বেলা দে

জানি আপনি কর্মব্যস্ত গৃহিনী। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত এমন একটু সময় নেই যখন নিশ্চিন্ত মনে বসে সৌন্দর্য্যচর্চা করবেন। কিন্তু আমি ভেবে ঠিক করেছি। বান্ধবীদের একটি সহজ উপায় বলে দেবো। ঘরের কাজও তো আপনি সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে ভাগ করে নেন। আজ যদি রান্নাঘর ঝাড়ামোছা করেন করেন তবে কালকের জন্য থাকবে শোবার ঘর পরিষ্কার করা, পরশু হয় তো বসবার ঘর অথবা ভাঁড়ার ঘর। ঠিক এইভাবেই সৌন্দর্য্যচর্চা বা দেহচর্চা ও ভাগ করে নিতে পারেন। নিজের ইচ্ছেমত অবসর বুঝে কোনদিন বা চুল, কোনদিন মুখ, কোনদিন হাত, কোন ও দিন বা পায়ের একটু যত্ন করলেন।

যেমন **সোমবার**—চুলের যত্ন করবেন অবশ্য রোজই করবেন তবে একটি বারে বিশেষ করে যত্ন নেবেন। মাথায় মরামাস হলে লোসন দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। রুক্ষ চুলে একটু ভ্যাকেলিন টনিক ব্যবহার করে জোরে ব্রাস করলেন। দরকার হলে স্যাম্পু করবেন।

মঙ্গলবার—আপনার হাতের ও নখের যত্ন করবার দিন। হাতে বেশ করে ক্রাম মেখে মুছে ফেলে ফাইল দিয়ে ঘসে সরু কাঠিতে তুলো জড়িয়ে হাইড্রোজেন পেয়রক্সাইডে নাচেটা পরিষ্কার করবেন।

বুধবার—আপনার দেহসৌষ্ঠবের দিকে একটু নজর দিলে মন্দ কি? রোজই সামান্য ব্যায়াম করে যাবেন কিন্তু একটি বিশেষ দিনে বেশী হেঁটে বা খেলা ধুলা করে দেহটাকে ঝরঝরে রাখুন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অতিরিক্ত মেদ বা গ্লানি ও ঝেড়ে ফেলতে পারেন।

বৃহস্পতিবার—যদি মুখের সৌন্দর্য্যচর্চা করেন তাহলে হাতে একটু সময় নেবেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবেন আপনার মুখের কোথায়ও কি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার যেটা নৈনন্দিন প্রসাধনের মধ্যে আপনার চোখে পড়েনি।

শুক্রবার—পায়ের যত্ন করান। যদি ক্লান্ত চরনে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয় তাহলে সামান্য গরম জলে লবন দিয়ে পা দুটি ডুবিয়া রাখুন অল্পক্ষণ পরেই আপনার না নরম তুলতুলে ও স্বচ্ছন্দগতি হয়ে যাবে। সম্ভব হলে হাতের মতো পায়ের আঙুল ও গরম অলিভ ওয়েলে ডুবিয়ে নেবেন।

শনিবার—দৃষ্টি দিন আপনার চোখের দিকে—চোখের চারপাশে বেশ করে ঘসে ঘসে ক্রীম লাগাবেন। পরে মুছে ফেলে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল জলে মিশিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন।

রবিবার—রবিবারে থাকবে চট্‌পট করে সাজগোজ সেরে বেড়াতে যাবার পালা তাই না?

ঘরে

"পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পাশে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

ঘর সাজানো

করুণা সাহা

কয়েক বছরের ব্যবধানে সকলের ধারনা ছিল গৃহ পরিচালনা একটি অতি সাধারণ কাজ। গতানুগতিক ও একঘেয়ে। শুধু মাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরেই করে যাওয়া। এ কাজের মধ্যে মেয়েরা নিজেদের গুণাবলি প্রকাশ করার মত কোনও উপায় ও সুযোগ খুঁজে পেতেন না। তার জন্যে উৎসাহ বা উদ্দীপনাও থাকত না। আজকের দিনে কিন্তু সমস্ত দৃষ্টি ভঙ্গিই বদলে গেছে। একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন সুন্দর ও ভালভাবে পরিচালিত গৃহ সুখী ও তৃপ্ত পারিবারিক জীবনের গোরার কথা। আজকের দিনের অনেক গৃহিণীকেই দুদিকে কাজ করতে হয়। গৃহ পরিচালনা ও বাইরের জগতের নানা কাজে তাদের সমান ভাবে মনোযোগ দিতে হয়। উপার্জ্জন করা, গবেষণা করা বা সোসাল কাজ করা সে যে কোন কাজই না হোক। শুধু মাত্র ঘরের সীমার মধ্যে তার জীবন আজ আর বেঁচে থাকে না। সেজন্য সবচেয়ে বড় কথা ছিল গৃহ পরিচালনা তাকে সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে করতে হবে তবেই অন্য কাজের জন্য প্রচুর সময় থাকবে। অগোছান সংসারে সব জিনিস হাতের কাছে না পাওয়ার দরুণ খুঁজতে খুঁজতেই দিন কেটে যাবে। গৃহসজ্জার একমাত্র অর্থ সৌখিনতা নয় এর সুবিধা ও উপকারিতাই হল বড় কথা।

আলাদা আলাদা ঘরগুলির প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা এমন কোনও শক্ত কাজ নয়। বসার ঘরটি ছোটই হোক বা বড়ই হোক একধারে একটু ব'সে—আরাম পাওয়া যায় এ ধরণের কিছু চেয়ার বা সোফার একটা সেট্ রাখা দরকার। যার বাড়ীতে যেমন লোক আসে তেমনি হিসাব মত বসার জায়গার দরকার।

অনেকের বাড়ীতে দিনরাত প্রচুর লোকেরা আসা যাওয়া করে। তাদের বাড়ীতে শুধু কতগুলি চেয়ার কি ভাল দেখাবে? একটু একঘেয়ে লাগবে নাকি? সেজন্য বলছি যদি ঘরের কোণে একটি বিভাগে কয়েকটি সুন্দর তাকিয়া দিয়ে দেশীমতে বসার একটা জায়গা থাকে, দরকার হলে কখনও

কখনও বাড়তি অতিথির রাত কাটাবার ব্যবস্থাটাও সহজে হয়ে যাবে। অন্য ধারে একটা বেতের চেয়ারের সেট্ রাখলে মন্দ হয় না। সবগুলি জিনিষের রং কি একই রকম রাখবেন? বোধ হয় ঠিক হবে না। বড় একঘেয়ে লাগবে। সোফাসেটটির রং এর সাথে মিলিয়ে ডিভানের ঢাকনা দিন, তাকিয়ার রং ও পর্দার রং এক ক'রে দিন। বেতের চেয়ারের রংগুলি আলাদা করুন যেখানে বেতের চেয়ার থাকবে তার কাছাকাছি কোণে বা টেবিলের উপরে কিছু ছোট লতা বা ফুলের ব্যবস্থা করুন। একটা হাল্কা ও ছিম্‌ছাম্ ভাব আসবে। বেতের সেটের জন্য বলছি তার কারণ বেতের মধ্যে গাছের ডালের ভাব আছে ব'লে ফুল পাতা বড় সুন্দর দেখায় ওর সাথে। সোফার সামনের টেবিলে সানমাইকা বা কাঁচ দিয়ে দেবেন। চক্‌চকে দেখাবে পরিষ্কার করারও সুবিধা। কাঁচের টেবিলের তলায় কাঁচের বা প্লাইউডের উপরে একটি নানা রংয়ের আল্পনা দিয়ে লাগিয়ে নিন্ দেখতে ভাল লাগবে। সেই আল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে সোফার মাথার ধারে একটু করে লম্বা কাপড়ে বাতিক কাজ ক'রে রেখে দিতে পারেন, তাতে মাথার তেল লেগে সোফার কাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা হবে না। সেটের ধারে বা ডিভানের ধারে যে দাঁড়ানো বাতিটা থাকবে তার ল্যাম্প সেড্‌টাতেও বাতিক ক'রে নিন্। যেমন ঘরের সব রং একরকমের করা ভাল নয়। তেমনি ঘরে ডিজাইনের ছড়াছড়িও ভাল নয়। যদি সোফা সেটটি শুধু রংয়ের হয় তবেই বাটিক মানাবে অতিমাত্রায়, এদিকে ওদিকে নানা রকমের ডিজাইনের ছড়াছড়ি হ'লে চোখে ধাঁধা লাগবার মত হবে। ঘরে কার্পেট থাকলে ভাল। তবে ঘর জোড়া বড় কার্পেট খুব সুবিধার নয়। বড় কার্পেট পরিস্কার করার অসুবিধা।

আমাদের দেশে জানালা খুলে রাখতেই হবে—গরমের জন্য। সেজন্য ধুলোর আমদানী রোধ করা যাবে না। তাই বলি টুকরো টুকরো কার্পেট জায়গায় মত রেখে দিন। কার্পেটের অভাবে ভাল কাজ করা মাদুর বা সতরঞ্চীও দিতে পারেন। ঘরে যদি জায়গা থাকে সুন্দর ধরনে সাদা সিধে ডিজাইনের বইয়ের সেলফ্ করে রাখুন। বইয়ের সেলফ্‌য়ে যে শুধু বইই থাকবে তা নয় বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে ছোট পুতুল বা লতা ঝুলিয়ে দিতে পারেন। ছোট বাচ্চাদের ছবিও রাখা যায়। মেঝেতে জায়গা না থাকলে সেলফগুলি মাপে ছোট ক'রে উঁচুতে দেয়ালে লাগিয়ে নিতে পারেন। সেলফ্‌গুলি দামী কাঠের

নী ক'রে সস্তা কেরোসিন্ কাটের বানিয়ে নিয়ে, তাতে ভাল ডিলুক্স্ পেইন্ট দিয়ে দেখুন কি অপূর্ব্ব দেখাবে। রংয়ের দোকানে রং তালিকা পাবেন, নিজেই রং পছন্দ ক'রে নিন্। মাঝে মাঝে দুতিন বছর পরে রং সব পাল্টে ফেলে দিতে পারেন। রং পাল্টানোর দরকার আছে বইকি? বাড়ীর সবাইর মনে হবে নতুন বাড়ীতে এলাম নতুন আসবাব পত্র নিয়ে। গৃহিণীর সুনাম বাড়বে —কেমন অল্প খরচায় নতুনত্ব বজায় রাখতে পারে।

শোবার ঘরে আমাদের থাকে বড় একটা বা ছোট ছাটী খাট। খাটের সামনে পা মোছবার জন্য ছোট্ট কার্পেট রাখুন। পুরানো কাপড়ের পাড় মুড়ে কার্পেটের বদলে রাখতে পারেন। ড্রেসিং টেবিল রাখা যায় বা তার বদলে ছোট খাট সেলফ্ ক'রে দেয়ালে বড় আয়নার সঙ্গে খাটের পাশেই কোথাও লাগিয়ে নিন। আলমারি ত থাকবেই আলনা বা জুতো রাখার জায়গা এগুলি সব ঘরের যে দিকটায় আলো বাতাস কম সেদিকে রাখা উচিত। যে দিকটায় বড় জানালা আলো বাতাস আসার সুবিধা সেদিকটাই খাট বা ড্রেসিং টেবিল টা রাখবেন। সঙ্গে বারান্দা থাকলে সেখানে একটু ফুলের বা লতার ব্যবস্থা করবেন দুটো বেতের চেয়ার বা ইজি চেয়ার দেবেন। বিশ্রামের আগে বসে বসে আরাম করে গল্পের বই পড়তে ভাল লাগবে। শোবার ঘরের ভিতরে কোনও রকম ফুল বা পাতা না রাখাই ভাল। শোবার ঘরের পর্দ্দা এমনভবে করবেন যাতে ক'রে দিনের বেলা অবরু থাকবে। রাতের বেলা পুরো সরিয়ে দিলে হাওয়া বাতাস চলাচল করবে। শোবার ঘরের পর্দ্দা ও বেড্‌কভার হাল্কা রংয়ের, যাকে আমরা বলি Pastel shed সেরকম রং হলে মিঠে লাগবে। আমার মতে লাল পাড় নীল চকচকে কমলালেবু বা কালো এসব রং এঘরে ব্যবহার না করাই ভাল।

খাবার ঘর জায়গা কম থাকলে বসবার ঘরের একপাশে করে নিতে পারেন। বা কাছাকাছি একটু বড় ধরনের বারান্দা থাকলেও তাতে ছোট একটা টেবিল পেতে ব্যবস্থা করা যায়। খাবার ঘরের আসবাব, বাসন পত্র, সৌখিন জিনিষ, শুধু শুধু খানিকটা এদিক ওদিক রাখলে অর্থহীন হবে। কাঁচের আলমারিতে তোলা বাসন সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা যাতে ক'রে তাড়াতাড়ি দরকারের সময় কি আছে কি নেই বোঝা যায়। ফলমূল টেবিলের উপরে রাখা বা এঘরে ফুলের ব্যবহার প্রচুর করতে পারেন। ঘরের পর্দ্দা ভাল রংচংয়ে ডিজাইনের হলে খুবই

ভাল হয়। জিনিষগুলি এমনভাবে রাখবেন যেন পোকা মাকড়ের বাসা কোথাও না হতে পারে। এঘরেও দেয়াল আলমারির ব্যবহার চলতে পারে। তোলা বাসন সবসময়ে দরকার হয় না দেয়াল আলমারীতে রেখে দিলে যেঝেটা ফাঁকা থাকবে পরিস্কার করার সুবিধা হবে।

এখন আসছে সবচেয়ে বড় কথা রান্না ঘর। এটী বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে অন্ধকার তেলঝোল মাখা, জলে থৈ থৈ করছে এ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই একেও খাবার ঘরের মত পরিস্কার রাখা যায়। আজকাল Gas এর ব্যবহারের জন্য অনেকের বাড়ীতে রান্নাঘরের চেহারা পাল্টে গেছে। তবে যদি কেউ তোলা উনাম বা কেরোসিন ব্যবহার করতে চান তাতেও ঠিক একই ভাবে পরিস্কার ক'রে রাখা যায়। কতগুলি উঁচু টেবিলের ব্যবস্থা করে নিন। কেরোসিন কাঠের টেবিলে রং লাগিয়ে উপরের দিকটায় এলুমিনিয়ামের পাত লাগিয়ে নিন। এতে তেল মশলা লাগালে সাবান দিয়ে পরিস্কার করা যাবে সহজে। জিনিষ ও খুশীমত রাখা যাবে, পাশে একটা বাসন ধোবার জন্য বড় একটা বেসিন লাগিয়ে নিন। মোজাইক করা বেসিন সস্তায় প্রচুর পাওয়া যায়। কালি মাখা পোড়া বাসন কলতলায় মেজে নেবে। কাঁচের বা ষ্টীলের বাসন মাজা, বা তরকারি ধোয়া, চাল ধোয়া, এগুলি সবই বেসিনে করা চলে। রান্নাঘরের মেঝে শুকনো থাকবে। দাঁড়িয়ে রান্না করার দরুণ বার বার ওঠা বসা করতে হবে না। কোথায় কি দরকার। সেটাকে একটু রংচংয়ে করলেই হবে। সাদা মাটা যেমন তেমন করলে হবে না। একটু ভাবতে হবে বইকি? যেমন নিজের ছেলেমেয়ে স্বামীর জন্য ভাবনা করেন তাদের সুবিধা অসুবিধার জন্য ভাবেন তেমনি ঘরের কোথায় কি দিলে ভাল লাগবে সুবিধা হবে তাও একটু ভাবতে হবে। এছাড়া আর আরেকটা বড় কথা একবার সাজিয়ে ফেললাম ব্যাস্ আমার কাজ ফুরালো তা নয় কিন্তু। সব সময়ে নজর করে পরিস্কার করা রং লাগানো ভেঙ্গে গেলে সারাই করা এসবও করতেই হবে। রান্নাঘরের একটা কোণে ঢাকা যায়গায় ঘর পরিস্কারের সব জিনিষগুলি একসঙ্গে রেখে দেবেন। কোনও একটা জিনিষের জন্য যেন সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াতে না হয়। ঘর সাজানোর মূল কথা গুছিয়ে রেখে আমাদের নিজেদের সময় সংক্ষেপ ক'রে নিজেদের সখের কাজ বা টাকা পয়সা রোজগারের লাগাতে পারি

যেন। হঠাৎ টেলিফোন বাজল, কলিং বেল টিপল কেউ, সব কাজই গৃহিণী একহাতে সারতে পারবেন। জায়গা মত দেয়ালে হাতের কাছে মসলার কৌটো। রান্নার হাতা-খুন্তি, চামচ, আটা ময়দার চালনী এমনি আরো সবকিছু গুছিয়ে রাখলে কাজ করতে দেখবেন কত কম সময় লাগবে। রান্না ঘরটি অন্যান্য ঘরের থেকেও বেশী গুছিয়ে রাখা দরকার। সব যেন চোখের সামনে থাকে। চারটি দেয়ালে এখানে ওখানে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখবেন। তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সবাইকে খাইয়ে কাজে বেড়িয়ে যেতে দেরী লাগবে না।

অনেকের ধারনা বাড়ীঘর গুছিয়ে সাজিয়ে রাখার জন্য প্রচুর পয়সা বা সময়ের প্রয়োজন। এ কাজ, তাছাড়া নিজেও করা যায় না। উপযুক্ত কারিগড় বা মিস্ত্রীর প্রয়োজন হয়। মোটেই তা নয় সবসময়ে নজর রাখবেন।

"শিশু ও আমরা"

শ্রীরূপা নন্দী

ছোট ছেলেটা তার বন্ধুর সঙ্গে বেশ খেলা করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে লাগল দ্বন্দ্ব। বন্ধুটি তার বলটি নিয়ে খেলাচ্ছলে খানিক দূরে ছুটে পালাতে গিয়ে থমকে গেল ঐ ছেলেটির বিকট চিৎকারে। কয়েক মিনিট মাত্র। বলের প্রকৃত সত্বাধিকারী দৌড়ে কাছে এল, হাতের কাছে ছিল একটা খেলার লাঠি সেইটা দিয়ে বিপুল বেগে ধেয়ে এসে সজোরে ও সপাটে বন্ধুটিকে জোরে দুয়েক ঘা লাগিয়ে দিল। বন্ধুটি কেঁদে উঠল এবং অন্যান্য গুরুজনরাও চিৎকার শুনে দৌড়ে এল। ছেলেটিকে নিরস্ত করার পর উভয় বন্ধুর মধ্যে আপোষ করার চেষ্টা করতে এই ছেলেটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে উঠল "ওর মুখ ভেঙে দেব লাঠি দিয়ে, কান ছিড়ে দেব"।

গুরুজনরা ব্যস্ত হলেন এ হেন অশোভন ও শত্রুসুলভ মনোভাবে, বললেন— "ছিঃ ওসব কথা বলতে নেই—ওকে আদর করে ভাব কর।" ছেলেটি রাজী না হয়ে ঈষৎ জিজ্ঞাসু হয়ে বলল, "তবে বাবা আমায় মারে কেন—আমিও মারব"।

হ্যাঁ কথাটা শিশুর পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত বলা। এক্ষেত্রে শিশুটির বয়স দুই আড়াই বছরের মত। আমার এই ঘটনাটি তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে ছোট শিশুদের মনে এই বিরূপ রূঢ়, হিংস্র ও ক্ষতিকর মনোভাব হয় কেন? ছোট শিশুরা স্বভাবতই নিজেদের প্রাধান্য দিতে চায় তাই অন্যদের কোনরকম প্রাধান্য বা বিশেষত্ব পছন্দ করে না আর তাই সামান্য ঝগড়া মারামারি লেগেই থাকে। তা থাকা কোন বিচিত্র নয়। তবুও এর মধ্যে একটা বড় 'কিন্তু' থাকে। আজও যার কোন সুন্দর সুরাহা করা যাচ্ছে না।

বর্তমানে শিশুদের নিয়ে বহু রকম সমস্যামূলক তত্ত্ব আলোচিত হচ্ছে এবং হয়েছে। কিন্তু শিশুদের যদি গবেষনার যন্ত্রে ফেলা যায় তার কোন সজীব সচ্ছল উত্তর পাওয়ার সম্ভবনা কম বলেই মনে হয়। কারণ শিশুর মন আর প্রাণ উভয়ই আমাদের কাছে সবার রমনীয়, আদরণীয় ও প্রধান লক্ষ্য বস্তু।

তাই শিশুকে গবেষণার যন্ত্র স্বরূপ করার আগে তার সপ্রাণ গঠন বা আকারগত রূপটার দিকে সপ্রাণ দৃষ্টিতেই তাকাতে হবে। কারণ নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুরতার আবরণে কোন স্বপ্রাণের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে না।

মা ও বাবা শিশু দর্শন স্বরূপ। একটি শিশু জন্মাল তার দেহ ও দেহগত বাসনা ইচ্ছাগুলো নিয়ে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অস্বাদন বাদে তার ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল হয় জাগতিক রূপের রহস্যকে জানবার জন্য। শিশুর পড়া, বসা, ওঠা, শোয়া, ঘুমনো সবকিছুর মধ্য দিয়েই শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে সমান তালে চলছে ও তার রস গ্রহণ করে চলছে। যে ভাষায় 'মা' বলে প্রথম ডাকবে সে ভাষাটাও সে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই জেনে নেবে। প্রতিটি পলে শিশুটির মন সজাগ হয়ে উঠছে তার জগত ও পারিপার্শিক অবস্থা সম্বন্ধে। তাই শিশুদের কথায় এত ফোয়ারা ওঠে। বড়দের মাঝে থেকে এই কথাগুলি শেখে, তবেই বলে।

শিশুর অন্যতম সক্রিয়তার বিষয় তার অনুকরণীয়তা গুণটি। এই গুণটির প্রতি স্বভাবত আমরা কখনই সচেতন হয়ে লক্ষ্য করি না সব সময়ে। শিশু যেদিন থেকে প্রথম চোখ মেলেছে এই জগতের আলোতে সেদিন থেকেই সে সব কিছু শিখছে। তাই প্রথম থেকেই আমাদের সচেতন হয়ে থাকা প্রয়োজন এটাই আমার বক্তব্য। কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ গঠন নির্ভর করছে এই অনুকরণ গুণটির উপর; যা দেখবে তাই শিখবে এ আমরা কথায় বলে থাকি। বিবেক বলে আমরা যাকে আমরা অভিহিত করি সেই বিবেক-বুদ্ধিকে সচেতন করে সক্রিয় করে তুলি আমরা বড়রা। আমাদের আত্মায় শক্তির অংশে এই বিবেককে প্রতিষ্ঠা করেছি। সত্য মিথ্যা জ্ঞান একটি শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকে উজ্জিবিত হয় না এর উদ্বোধক আমরা? কথাটা একটু স্পষ্ট করতে চাই। একটি শিশুকে ঠিক করে মানুষ করার জন্য আমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগাই। ধরা যাক, কোন এক জিনিষ আমরা করে শিশুটির সামনেই সেই কাজটিকে অস্বীকার করলাম বা উড়িয়ে দিলাম কারুর কাছে। শিশু সেটা লক্ষ্য করল এবং সরলভাবে তার অনুকরণের স্বভাবে ভবিষ্যতে সেটা প্রয়োগ করল। আমরা কি করি। নিজেদের কীর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাকে প্রচণ্ড বকি ও মারি। শিশুর মনের রাজ্যে বিকট প্রলয় ঘটে। সে ঠিক কি করবে ভেবে পায় না। বরং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক আবেগে তার মনে আসে

বিক্ষোভ। সে ভাবে এই কাজটা তাহলে ঠিক নয়। তারপর আমরাও সেই অসর্তক মুহূর্ত্তে কতকগুলি কথা ব্যবহার করি যেমন—"মিথ্যা কথা বলছ আরও মারব" (হয়ত বা মারিই) "কখনও মিথ্যা বলবে না।" "এই রকম দুষ্টুমি করলে অন্যায় হয়" ইত্যাদি কথা বলি। এই কথাগুলি থেকে তার সচেতনা আসে সত্য মিথ্যার সাধারণ রূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক ভাবে। অন্তরের প্রথম বিবেকের দ্বারা উদ্ঘাটন করি এই কথার সমষ্টি নিয়ে।

শিশু সরল মনটাকে কত নিষ্ঠুরভাবে আমরা বদলাই সেটা বলা প্রয়োজন। আমাদের একটা গুরুজনচিত সম্মানজনক আবরণ হচ্ছে ছেলেমেয়েদের শাসন করা। কেউ কেউ অতিরিক্ত আদর দিয়ে শাসন করেন কেউ কেউ প্রচণ্ড মার ধোর করে শাসন করেন। এর মধ্যে অত্যাধিক মারাত্মক শাসন 'মারা'। আমাদের স্থূল মন আত্মসুখে এতই মগ্ন থাকে যাতে নিজের পিঠ বাঁচিয়ে (বয়স বিচার না করে) নির্যাতনের ঝড় বইয়ে মারপিট করতে এতটুকু সঙ্কোচ হয় না। অনেক শিশুর কথাবলতে শেখার আগে থেকেই তার উপর মূঢ় শাসনের কুৎসিৎ করতে শুরু করে দিয়ে নিজেদের শিক্ষাদেওয়ার অভিনব পদ্ধতির জন্য গর্ব্ববোধ করেন।

শিশুর মনে কি হয় তাতে? সে বোঝে এই মর্মান্তিক যন্ত্রনা আমার ভাগ্যে যখন আছেই তখন আমিই বা বাদ যাই কেন। সে তখন শেখে কি করে নিষ্ঠুর হওয়া যায়। আত্মরক্ষা করতে না পেরে তার কিশলয় মনখানি কঠিন পাথরে বাঁধা হয়। সভাবত সে বিদ্রোহ করে এবং অজ্ঞাতে আর একটি মনোভাব গড়ে ওঠে তা হল ঘৃণা। শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সে তখন নিজের সূক্ষ্ম মনটাকে মেরে ফেলে নতুন মনের কাঠামো তৈরী করে। এই ভাবেই রূঢ়তা, বিরূপতা, হিংস্রতা, অবাধ্যতা আমরাই শেখাই। এর ফলে আমরা ওদের কাছ থেকে ফিরে পাই কি? খানিকটা উচ্ছৃঙ্খলা অবাধ্যতা, ঘৃণা, ঔদ্ধত্য। এদের মনকে আমরা মেরে ফেলি। মনকে সহজ হয়ে চলতে দিই না, সহজ প্রকাশে বাধা দিই। দেহগত নির্যাতনে মানবের স্বাভাবিক হিংস্রতা জাগতে বাধ্য, এ তার জন্মগত প্রবৃত্তি যেমন আছে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ভবিষ্যতে এরা সব কিছু কাজে পিছিয়ে যাবে, সব কিছুকেই তিক্ততার পরিচয় দেবে। আমরা একটা ফুলকে সযত্নে রাখি কিন্তু ঠিক সেই ফুলের মত এক শিশুকে উপহার দিই আমাদের আত্ম অহংকারের মূর্খ নিয়মে যাতে সেই কোমল

আনন্দ নিষ্পেষিত হয়ে যায়। ছোট শিশুরা তাদের অনুকরণের প্রবৃত্তি নিয়ে শিখে অপরের উপরে ফলায়।

অতিরিক্ত আদর ও যথেচ্ছার আবদার দেওয়া ঠিক একই কারণে মারাত্মক। এক্ষেত্রে শিশুকে তার আত্মশক্তির মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করতে শেখাই। শিশুকে এত বেশী আত্মসুখী করে তুলিয়ে তার বিবেকে ছায়া পড়ে শুধু মিথ্যার প্রবঞ্চনা, দেহসুখ, আত্মকেন্দ্রিকতা, অহঙ্কার আর উৎকট উচ্ছলতা। সে জীবনে সুন্দরকে দেহের প্রত্যক্ষ সুখে দেখে সূক্ষ্ম আবরণে দেখে না, বরং উপেক্ষা করে। কারু ভাল দেখতে পারে না। নিজের টুকু হলেই হল।' আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব সে কখন সহজ সারল্যে হাসতে পারে না। দেহ সর্ব্বস্ব এক হতচেতন উচ্ছৃংখল মন হয়।

তাই আমার বলার উদ্দেশ্য শিশুকে দেখতে হবে তেমন করে যেমন করে ফুলকে দেখি। ফুলের যত্নকরি যখন তার সব সাচ্ছন্দ্য টুকুই দেখি। শিশুদের দেখব ঠিক তেমন করেই। খুব উগ্রপন্থী কখনই হবো না। আবার কখনই নিষ্ঠুর হব না বা আদর দিয়ে আত্মকেন্দ্রিকও করব না। বিবেক বলে যা আমরা জানি তাকে জাগানোই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই সেই বিবেকের সামনে আনতে হবে নিদর্শন। কথাটা হচ্ছে নিজে করে তাকে শেখাও এবং করাও। শাসন হবে শুধু বচনে এবং মৃদু রুষ্টতায়। ধমক দিলে যদি আমাদের রুষ্টতার চরম হয় তবে তাই দেওয়া উচিত। অবশ্য সেই ধমকের আগে নিজের আবরণকে চরম গাম্ভীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যাতে স্নেহ মমতায় পূর্ণ হয়েও গাম্ভীর্য্যের স্বচ্ছ প্রকাশে সমান তাল রাখা যায়। যে শিক্ষা নিজে শিশুকে দিতে হবে তার আগে পিতা বা মাতা আপনার আবরণ মত প্রকাশকে সংযত করতে হবে। শিশুর কৌতুহলী মনকে যতটা প্রশ্রয় দিতে হবে ততটাই সীমা রেখা টেনে তার সামঞ্জস্য রাখতে হবে। ঠাকুর পরমহংসদেব বলেছেন মাঝে মাঝে ফোঁস করা ভাল কিন্তু তাই বলে কামড়াবার কি প্রয়োজন। স্বামীজি অন্তরকে জাগাবার কথাই বলেছেন বীর্য্যে শৌর্য্যে জ্ঞানে ভক্তিতে। শিশুদের দর্পণ যখন আমরা—তখন আমাদের প্রকাশের সংযম সবার আগে। আমাদের সামান্য ত্রুটি, একটি শিশুর জীবনে বিরাট ত্রুটি।

বাইরে

"সমাজে সংসারে অর্থাৎ ঘরে বাইরে আজ নারীর অগ্রগতি অপরিহার্য। তাই তারা অবহেলার বস্তু নয়—তাদের মূল্য আজ সকল ক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে।

আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না
বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হোত কাননে ফুল ফোটা"

(রবীন্দ্রনাথ)

শাড়ি এবং রোমানিয়া

অমিতা রায়

কলকাতা রাস্তায় বেরোলে এখন মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ফ্যাশন প্যারেড দেখছি। মিনি স্কার্ট, জীন, স্ল্যাকস, শালোয়ার, কামিজ, মিনি শাড়ি কত রকমের আর কত বাহারের পোষাক পরে চলেছে বালিকা, কিশোরী, তরুণী এমন কি বয়স্করাও। তাতে যে সবায়েরই রূপ খুলেছে তা নয়। তবে একটা কথা যেন বোঝা যাচ্ছে যে, নিত্যকালের সেই পুরাতন শাড়িতে এখন আর তা করে মেয়েদের মন উঠছে না।

লোকে বলে রোজ দেখলে তাজমহলেও বিতৃষ্ণা আসে। আর শাড়ির ব্যবহার তো চলেই আসছে যুগ যুগ ধরে—তাতে অরুচি ধরা আর এমন কী আশ্চর্য ব্যাপার! বিদেশের দিকে চোখ ফেরালে কি দেখতে পাই না—সেখানে মেয়েদের পোশাকের ছাঁদ, ছন্দ ছাঁট কাট এমন কি রং নিয়েও চলছে নিত্য নতুন পরীক্ষা আর গবেষণা। আমরাই বা কেন শাড়ির প্যাঁচে নিজেদের জড়িয়ে বরাবরই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি সেজে বসে থাকব!

কথাটা নেহাৎ ফেলনা নয়। কিন্তু ঐ সব দেশে আবার আমাদের শাড়ির এত কদর আর এমন আদর যে, দেখলে অবাক হতে হয়—প্রশ্নের চোটে পাগল হতে হয়।

বিশেষ করে সে যদি এমন দেশ হয়, যেখানে জন্মে কোন দিন কেউ শাড়ি-পরা মেয়ে দেখেনি, তাহালে তো আর কথাও নেই। তেমন দেশও আছে নাকি আজকাল? এ প্রশ্নটা সবায়েরই মনে জাগছে তো?

হ্যাঁ তাই আছে—অন্তত বছর দশ আগেও ছিল। সে দেশটার নাম রোমানিয়া। উনিশ শো উনষাট সালে যখন প্রথম গিয়েছিলাম ওখানে, তখন আমাদের দেশে ও নামটা এখনকার মতন এত পরিচিত ছিল না। ওরা অবশ্য আমাদের দেশ সম্বন্ধে অনেক খবর রাখত এবং কৌতূহল পোষণ করত তার চেয়েও বেশি।

তবে শাড়ি ? না, শাড়ি সম্বন্ধে কোন ধারণাই ওদের ছিল না। কেননা, তার আগে অন্য কোন শাড়িপরা মেয়ে ওরা দেখে নি বললেই চলে। তখনো পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরের তীরে সমুদ্রের হাওয়ায় ওড়েনি কোন শাড়ির আঁচল। রাজধানী বুখারেস্টের রাজপথে লুটোয় নি কোন শাড়ির প্রান্ত।

এখন একটা দেশে হঠাৎ যদি কোন শাড়িপরা মেয়ে ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ে, তাহলে তাদের মনের পুকুরে লক্ষ লক্ষ কৌতূহলের ঢেউ জেগে উঠবে না কেন বলুন ? আর সেই ঢেউ যে সেই মেয়েটিকেও নাকানি চোবানি খাওয়াবে। সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

প্রথম ঢেউটার ধাক্কা খেয়েছিলাম কবে এবং কোথায় জানেন ? একেবারে প্রথম দিন সদর দরজায় অর্থাৎ রাজধানী বুখারেস্টের বিমান বন্দর ব্যাজিয়াসা-তে। সাতশো রকমের কাগজপত্রের ঝামেলা চুকাতে আমার সাত মিনিটও লাগে নি। কিন্তু স্যুটকেশ খুলে শাড়ির গোছা দেখেই তো কাস্টমস—মেমসাহেবের চক্ষুস্থির ! এই গোছা গোছা কাটা কাপড় নিয়ে আসছ আর ডিউটি না দিয়ে পালাবার মতলব ! মেমসাহেব খালি চোখ পাকিয়ে বলে—কি যে বলে তা বুঝি না—তবে গণ্ডগোলে ফেলবে এটুকু তার মুখ দেখেই বুঝলাম।

যত দোভাষির সাহার্য্য নিয়ে বলি—ওগুলো আমার পোষাক—ঠিক যেমনটি পরে আছি তেমনি, কে কার কথা শোনে ! কেমন সুন্দর প্লিট-দেওয়া কুঁচি দেওয়া একখানা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে আবার বলে এই দিস্তে দিস্তে থান কাপড় হল ঐ পোশাক। আমরা কি পাগল না কানা ; যা খুশি তাই বোঝাবে।

আমার জীবনে কাস্টমসের সঙ্গে মোলাকাৎ সেই প্রথম—তার পর ওদের ভাষাও কিছু বুঝি না। প্রাণ খুলে বাংলাভাষায় কিছুক্ষণ যা মুখে আসে তাই বলায় কাজ হল। কি ভেবে জানিনা আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে বিমান বন্দরের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

বাসে উঠে শহরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম—শাড়ি নিয়ে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে অনেক।

আর হলও তাই। হস্টেলে, য়ুনিভার্সিটীতে, ক্যানটিনে, পথে ঘাটে যেখানে—সেখানেই 'দেশ কোথায়' আর 'কি পরেছ' প্রশ্নের উত্তর দিতে

দিতে প্রাণ অস্থির। দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠছি, পেছন থেকে এক মন্ত্র-মধুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—ইন্দোনেশিয়া? পোস্ট অফিসে খাম দিচ্ছি—টিকিট ওয়ালী গালে হাত দিয়ে বলে জাপান না বর্মা? খিদের পেট চুঁই চুঁই করছে—ক্যানটিনের বুড়ি কুপন হাতে একগাল হেসে বলে—হ্যাঁ গো মেয়ে, তুমি চীনে না ইন্দোচীনে? মাজনওলা ছুরি উঁচিয়ে আপাদমস্তক নিরীখন করে বলে—মেকসিকো, তাই না? লাইনের পেছন থেকে এক পাকামাথা বৃদ্ধ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে—না হে না। এরকম পোষাক পরে ব্রেজিলে, তাও জান না? আর একটি তরুণী কটাক্ষে চেয়ে বলে—আরব, আবার—দেখছ না মাথার চুল একেবারে কালো?

ভাবছেন এত কথা বুঝলাম কি করে? আমি কি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রোমানিয়াক ভাষা না পড়েই পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলাম? প্রায় তাই। য়ুনিভার্সিটীতে যখন ক্লাস করতাম, অন্য অধ্যাপক অধ্যাপিকরা এসে আমার অধ্যাপিকাদের দোভাষী করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কত কথাই জানতে চাইতেন। তার মধ্যে এই সব প্রশ্নগুলোও থাকত যে?

ওদের এত রকম কৌতুহলের পরিচয় পেয়ে প্রথমে মজা লাগত; তারপর বিরক্তি বোধ হত কিন্তু তারপরে ভাবতাম। আমাদের দেশের এত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আগে তো কোন দিন ভাবি নি। ঐ ছোট্ট একটা মেয়ে একদিন বলল—তোমাদের দেশে রাস্তার ধারে কি কি রঙের ফুল ফোটে? সকালবেলা কোন পাখি ডাকে? কৈ, এ নিয়ে তো মাথা ঘামাইনি আগে। আর এসব কথা যে শুনছি, আলাপ করছি—সে তো শাড়িরই দৌলতে; তবে শুধু যে শাড়ি নিয়ে হয়রানিই হয়েছি; সে কথা বললে ভুল হবে। অনেক বাড়তি আদরযত্নও পেয়েছি শাড়ির কল্যাণে। ট্রামে বাসে ভিড়-ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে হচ্ছে। দাও হে শাড়িওয়ালীর জন্যে জায়গা ছেড়ে, পায়ে লেগে পড়ে যাবে। এমন যদি এখানে হত!

আরো একটা মজা হয়েছিল। আমার বুখারেস্টে পোঁছবার কয়েকদিন পরেই ছিল রুমানিয়ার স্বাধীনতা দিবসের উৎসব। দিনটা ছিল ২৩শে আগস্ট। সন্ধেবেলা রাস্তা দিয়ে মশাল মিছিল যাবে তাই ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়ে আছি। ফট করে একটি ছেলে একটা ভাঁজ করা চেয়ার খুলে পেতে দিল। ভাবলাম শাড়ি দেখেই খাতির—তাই বিনা বাক্যব্যয়ে বসেই পড়লাম। তারপরেই

খুলে ধরল অটোগ্রাফ খাতা। আবার কিছু না বুঝেই খাতাটা নিয়ে মাতৃভাষা না ইংরাজী—ভাবতে ভাবতে ইংরেজীতেই সই করে দিলাম। চারপাশে তখন বেশ চারটি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখছে। কিন্তু সই করার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই হায় হায় করে উঠল। আর যার খাতা সে ছেলেটি বিরস বদনে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বলে উঠল ইস, শাড়ি দেখে ভেবেছিলাম নারগিস! তখন আমার কি অবস্থা বুঝে দেখুন। সবাই এমন কটমট করে তাকাচ্ছে যেন আমি সত্যি সত্যিই জাল-জোচ্চুরি করে নারগিস বলে পরিচয় দিয়েছি। একটি মেয়ে ফোঁস করে বলে উঠল আমি আবার ভাবছি যে রাজ কাপুরের ঠিকানাটা জেনে নেব। নিজেই নারগিস নয় তা রাজের ঠিকানা দেবে কোথা থেকে?

'নারগিস' না হওয়া যে এত বড় অপরাধ তা আগে কোনদিন বুঝি নি। কিন্তু এখন এমন অপরাধী বনে গেলাম যে, চেয়ারের মায়া ত্যাগ করে চোরের মত পালিয়ে এলাম। আসার আগে অবশ্য বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় বলে এলাম—চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছ সবাই মিলে? কোথায় নারগিস আর কোথায় আমি! ওরা সে কথার মানে বুঝলনা—কিন্তু আমার ওতেই সান্ত্বনা।

এ অবশ্য গোড়ার দিকের কথা। পরে যখন চেনা জানা হয়ে গেল তখন আর এত ঝামেলা হত না। বরং অনেক সুবিধেই হত। তখন যেন শাড়িটাই আমার 'মেড-ইন-ইণ্ডিয়া' ছাপ হয়ে গেল। আর ঐ এক শাড়ির দৌলতেই হস্টেলের পোর্টার থেকে য়ুনিভারসিটীর ডীন পর্যন্ত সবায়ের কাছেই এক ভাবে চেনা হয়ে গেলাম।

একবার যখন মসকো থেকে এক ভারতীয় অধ্যাপক বুখারেষ্টে বেড়াতে এসে য়ুনিভার্সিটীতে খোঁজ করলেন 'ভারতীয় ছাত্রছাত্রী কেউ আছে কিনা'। তখন তাঁর আর অফিস অবধি যাবার দরকার হল না। দরজা থেকে গেটম্যানই বলে দিল—হ্যাঁ, শাড়িপরা ছাত্রী আছে একজন—পিয়াৎসা রোসেত্তির হস্টেলে চলে যান। নাম ধামের দরকার নেই মশাই—ওরকম পোশাক সারা রোমানিয়াতে একজন মানুষই পরে। নাহলে আর এত অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এককথায় তার নাম করলাম কি করে!

এ-ও কি একটা কম সুবিধে?

কিন্তু শাড়ি পরে লোকের চোখে পড়া যায় একথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা এসে চেপে ধরল। নাচতে যাবে,নাচ দেখতে যাবে, বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্ন যাবে—দাও শাড়ি। শুধু দিলেই হবে না—পরিয়ে দাও। মাথায় লম্বা লম্বা চুল তো আছেই—দাও খোঁপা বেঁধে তোমাদের মত করে। আমার অবশ্য এ সব হুজুগ ভালই লাগত। আর ওদেশের মেয়েদের এমন মিষ্টি চেহারা যে সত্যি কথা বলতে কি আমার শাড়িগুলো ওদেরই যেন মানাত ভাল।

ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আবার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর রাখত। সে একদিন বলে বসল চন্দন পরিয়ে দাও। ঐ দূরদেশে তখন চন্দন পাই কোথায় ? ভেবে চিন্তে মনে পড়ল মায়েরা হাতের কাছে চন্দন না পেলে পাউডার গুলে চন্দন পরাতেন। গুললাম তো পাউডার—কিন্তু পরাব কাকে ; গায়ের রঙে আর পাউডারের রঙে যে এক হয়ে গেল। চন্দন তো ফোটেই না। তখন টিপ পরবার কুমকুম দিয়েই কাজ সারলাম। ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে মেয়েটিকে।

ঐ মেয়েটি পরে নারগিতা ছদ্মনাম নিয়ে বুখারেস্টের একটি স্টেজে শাড়ি পরে ভারতীয় নাচ-গান দেখাতে শুরু করল—তাও দেখলাম। আশ্চর্য অধ্যবসায় ছিল ওর। ভারতীয় সিনেমা দেখে গানের সুর তুলেছিল আর নাচের বই দেখে দেখে আরও করেছিল ভারতনাট্যমের মুদ্রা। পরে দুটো হিন্দি গান রেকর্ডও করেছিল নারগিতা।

অনেক দিন পর—বোধ হয় গত বছর অর্থাৎ উনসত্তর সালে—কাগজে দেখছিলাম নারগিতা ভারতবর্ষে এসেছে—কোন একটা টি-ভি ফিল্মে বোধ হয় অভিনয়ও করে গেছে। শাড়ি পরা নারগিতাকে দেখতে কিন্তু বিদেশী মেয়ে বলে মনে হত না।

আমরা যাদের সচরাচর মেমসাহেব বলে দেখতে অভ্যস্ত। তাদের অর্থাৎ ইংরেজ—জার্মানী—মার্কিন মহিলাদের সবাইকে শাড়ি পরে এমন মানায় না। কেমন যেন রুক্ষ রুক্ষ দেখায়। রোমানিয়ান মেয়েদের চেহারায় কিন্তু ভারি সুন্দর একটা লাবণ্য আছে—আর খুব একটা দশাসই লম্বা-চওড়া ফিগারও নয় কারো। অনেকটা যেন আমাদের সঙ্গেই মিলে যায় ; আর গায়ের রং ! ফর্সা হলেও কাগজের মতন সাদা নয়। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যে বলতেন পাকা হত্তেলের মতন গায়ের রং—অনেকটা সেই রকম। কালো চোখ।

কালো চুলও অনেক চোখে পড়ে। আর গায়ের রং যে সবায়েরই খুব ফর্সা। তাও নয়। আমাদের মতন রং-ও বেশ চোখে পড়ে।

কয়েক মাস রোমানিয়া থাকার পর যখন ওদের চালচলন, কথাবার্তা সব ব্যাপারেই পাকাপোক্ত হয়ে উঠলাম। তখন তো অনেকে আমাকেই রোমানিয়ান মেয়ে বলে ভুল করত। শীতকালে যখন ওভারকোট পরে রাস্তায় বেরোতাম, শুধু পায়ের কাছের শাড়িটুকুই দেখা যেত। ওদের দেশে গ্রামের মেয়েরা তখনও ঐ রকম গোড়ালি-ঝুল ঘাগরা পরত। তাই লোকে ভাবত—হবে একটা গাঁইয়া মেয়ে।

একদিন তো রাস্তায় একটি বৃদ্ধা মহিলা বলেই বসলেন শহরে এসেছ একটা ছোট ঝুলের নতুন ফ্যাশনের ফ্রক কি স্কার্ট কিছু তো পরতে পার। ঐ সব ঝোলাঝুলি আবার গ্রামে ফিরে গিয়ে পোরো বাছা।

তাঁর কথা শুনে হেসে ফেললাম। বললাম যা ভাবছেন তা নয়—এটা হল শাড়ি। আমি আপনাদের দেশের নই—ভারতবর্ষের মেয়ে। বাস—শুনেই তো মনে হল ভদ্রমহিলা হাতে চাঁদ পেলেন।

—শাড়ি! বল কি এরই নাম শাড়ি! আর তুমি খোদ ভারতবর্ষের মেয়ে! আমার এক বন্ধু বুখারেস্ট অপেরায় পোশাকের ডিজাইন করে। একটা নতুন অপেরায় শাড়িপরা ভারতীয় মেয়ের চরিত্র আছে। ও যে কি করে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। দোহাই তোমার। চল আমার সঙ্গে—ওকে একবার দেখিয়ে দাও।

এখন হলে হয়ত এক পায়ে নেচে উঠে চলে যেতাম। কিন্তু তখন সবে দেশ থেকে গেছি—যাবার আগে সবাই বলে দিয়েছে—সাবধান, বিদেশ-বিভুঁই অচেনা লোককে বিশ্বাস কোরো না। সেই ভয়ের গণ্ডীর বাহিরে পা দিতে পারে, মনটা তখনো অত তৈরী হয় নি। তাই পরীক্ষা, পড়াশোনার চাপ এই সব বলে কাটিয়ে দিলাম। ভদ্রমহিলা মনক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন তাহলে আমাকেই বুঝিয়ে দাও—যা পারি আমিই বলব।

অগত্যা একটা দোকানে ঢুকে তাঁকেই শাড়ি সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে চলে এলাম।

এরকম অভিজ্ঞতা আরো হয়েছিল। একদিন একটা দোকানে এক ভদ্রমহিলা এমনি নিজে থেকে এসেই আলাপ করে বলেছিলেন তিনি নাকি ভাস্কর্যশিল্পী। শাড়িপরা মেয়ের একটা পাথরের মূর্তি গড়তে চান। তাঁর

ষ্টুডিওতে যদি আমি যাই তাহলে সে কাজটা হয়। বলা বাহুল্য সে কথা শুনে আরো ঘাবড়ে গেলাম। সত্ত সত্ত গেছি বাংলা দেশ থেকে। কি করে বিশ্বাস করি যে, কোন মেয়ে এতবড় ভাস্কর হতে পারে যে তার নিজের ষ্টুডিও থাকবে। তাই সেখান থেকেও মাথা চুলকে পালিয়ে এলাম।

পরে যখন শুনলাম যে, ওদেশে সবাই সমান ভাবে বড় হওয়ার সুযোগ পায় আর ললিতকলা-বিভাগে জীবিকা অর্জন করতে আসেন মেয়েরাই বেশি। তখন কী আপশোষই যে হল সে আর কী বলব! কী দারুন সুযোগটা হাতে এসেও ফসকে গেল বলুন তো। বিনা চেষ্টায়, বিনা খরচায় ষ্ট্যাচু হয়ে ম্যুজিয়নে থেকে যেতাম—কপালে না থাকলে আর কী হবে।

তারপর একষট্টি সালে যখন চলে আসছি, তার কয়েক দিন আগে হষ্টেলে এসে হাজির হলেন এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। বুখারেষ্টের এক বিখ্যাত ফিল্ম ষ্টুডিয়োর একটি ভারতীয় মেয়ের চরিত্র নিয়ে সিনেমা করার কথা হচ্ছে আর কথাটা উঠেছে নাকি পথেঘাটে একটি শাড়ি পরা মেয়েকে দেখেই। এখন সেই মেয়েটি যদি অভিনয় করতে রাজি থাকে, তাহলে গল্পটা লিখে ফেলে কাজে নেমে পড়া যায়।

ওঁরা আসছিলেন সেই চিত্রপ্রযোজকের তরফ থেকে। তখন অবশ্য বিদেশ সম্বন্ধে ভয় কেটে গেছে। কিন্তু তখন তো too late—কাজেই তাঁদের নিরাশ করতে বাধ্য হলাম। যাবার সময়ে তাঁরা বলে গেলেন ও গল্পটা আদ্দেক তৈরি —কাজ শুরু করার কথাবার্তাও হচ্ছে। কি আর করব—দেখি আফ্রিকান মেয়ে কাউকে পাই কি না—বিদেশী মেয়ে তো চাই। তবে তাদের কী আর এমন সুন্দর পোশাক আছে।

সিনেমায় নামা-ও হল না। ষ্ট্যাচু হওয়াও হল না। তবে আমার ওদেশী বন্ধু লিদিয়ার ভালুর ইয়ন সালিশ্‌তেয়ানু ওদেশের এক নামকরা চিত্রশিল্পী। তিনি আমার একটা ছবি এঁকে রেখেছিলেন। সেই ছবিটা এখনো তাঁর কাছে আছে। ভারতীয় শিল্পের অনেক সংগ্রহ আছে ওঁর নিজের—তারই একটা নিদর্শন বোধ হয় ঐ শাড়ি-পরা ছবিটা।

দেশে এসে ভাবতাম শাড়ি পরা নিয়ে অত ঝামেলা আর অত ভালো ভালো অভিজ্ঞতার সবই মুছে যাবে। থাকবে শুধু ঐ ছবিটা। কিন্তু সেই

ভুলও ভাঙল উনিশ শো সাতষট্টি সালে যখন রোমানিয়ার বৈদেশিক সাংস্কৃতিক-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠানের অতিথি হয়ে দ্বিতীয় বার রোমানিয়া যাবার সুযোগ পেলাম।

তখন আবার দেখা করলাম বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ শ্রীমতী আনা আশলামের সঙ্গে—যিনি জরা-নিবারক 'জেরোভিটাল' ওষুধ আবিষ্কার করে একশো বারো বছর বয়েস পর্যন্ত মানুষকে সুস্থ, কর্মক্ষম দেহে বাঁচিয়ে রাখছেন। দেখা হল রোমানিয়ান নারী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং রোমানিয়ার পার্লামেণ্টের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীমতী মারিয়া গ্রোজার সঙ্গে। এঁদের সঙ্গে আগে পরিচয় হয়েছিল বুখারেষ্টে, ভারতীয় এমব্যাসীর বিভিন্ন উৎসবে। এবার ওঁদের হাসপাতালে বা অফিসে যেতেই ওঁরা বলে উঠলেন—ওমা; তোমার সঙ্গেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। আমরা ভাবছি ভারতবর্ষ থেকে কোন নতুন অতিথি বুঝি এসেছেন—তিনিই আমাদের কথা জানতে চান। তুমি তো আমাদের সেই শাড়ি-পরা ছাত্রী—চেনা লোক।

ভাগ্যে শাড়ি পরতাম, তাই না এত কাজের লোকেরাও এতদিন পরে আমার কথা মনে রেখেছেন। তারপরে দেখলাম শুধু এঁরাই নন, পরিচিত জনেরা কেউই ভোলেন নি আমার কথা। সেদিনকার সব বন্ধু, সব অধ্যাপক—যাঁদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল শাড়ির সূত্রে—তাঁরা সবাই মনে রেখেছেন। বন্ধু থেকে যাঁরা আত্মীয়তুল্য হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও স্মৃতির মধ্যে ধরে রেখে দিয়েছেন সাত বছর আগেকার স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রীতির সব ক'টি মুহূর্ত।

রোমানিয়ার কাছে দ্বিতীয় দফায় বিদায় নিয়ে এসে প্লেনে বসে সেই কথাই মনে হচ্ছিল—রোমানিয়ায় থাকব না জানি। কিন্তু রোমানিয়ার মানুষের মনে তো থাকব। শিল্পীর ষ্টুডিওতে ষ্ট্যাচু হয়ে থাকার চেয়ে মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে থাকাটাই কি কিছু কম লাভ?

———

সোভিয়েত রাশিয়ার মেয়েরা

শান্তা বসু

দিনপঞ্জীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনের সামনে ভেসে উঠলো সারি সারি কয়েকটি মুখ—প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা, খুশীতে উজ্জল বুদ্ধিতে দীপ্ত। কতদিন আগের দেখা—সাত সমুদ্র পারের দেশের মেয়ে—সেই দেশ হোলো সোভিয়েত রাশিয়া। একদিন সেই দেশে গিয়েছিলাম অতিথি হোয়ে।

অপরিচয়ের সংশয় আশঙ্কা আর নতুনকে জানার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গিয়েছিলাম—ফিরেছিলাম স্বার্থকতার পূর্ণতার একটি উজ্জল পরিচয়ের স্মৃতি বহন করে।

ওদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বিবরণের আগে একটি ঘটনা দিয়েই রচনা করা যায় তাদের পটভূমি। একবার ট্রেনেতে মস্কো যাবার পথে আমাদের সহযাত্রিনী ছিলেন বিভিন্ন পদমর্যাদার মহিলারা। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপিকা থেকে সুরু করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিতা এমনকি সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামেরও একজন সদস্যা। তাছাড়া ছিলো সেই ট্রেনের কর্ম্মী ও একটি মেয়ে। যাদের কাজ ট্রেনের কামরা আর করিডোরগুলি পরিষ্কার করা, সাজানো, ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি—সোজা কথায় ঝাড়ুদারনীর কাজ করতো তারা। পরিচয় হোলো সবার সাথেই। কিন্তু মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম ওই শিক্ষিতা বুদ্ধিজীবি মহিলাদের সঙ্গে ঝাড়ুদারনী মেয়েটির সমান ভাবে মেলামেশায়—খাওয়া, বসা, নাচ-গান হাসি গল্পের মধ্যে কোনো বাধা কোনো ভেদ নেই। সামাজিক শ্রেণী বিভাগ তাদের আলাদা করেনি।

ওদেশে প্রত্তিটি মেয়েই সাধ্যানুসারে কাজ করে, শাসন-পরিষদ থেকে কলকারখানা ক্ষেত খামার কোথাও কাজের বাধা নেই। তাই প্রত্তিটি ঘরণীরই একটি কর্মজীবন আছে। তারা জেনেছে ওদের দেশ তাদের সব ভার নিয়েছে—সেই দেশকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার ভার তাদেরই। এই কথাই শুনেছিলাম একটি তরুণী গৃহিণীর কাছে। কাপড়ের কলে কাজ করে মেয়েটি। ইতিমধ্যেই সে 'ষ্টাখানোভাইট' হোয়েছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দক্ষ কর্মী।

তাকে বলা হয়েছিল এখন সে অনেক পারিশ্রমিক পায় অতএব নিশ্চয়ই সে রীতিমত ধনী গৃহিণী। মেয়েটি হেসে বলেছিল নিশ্চয়ই দেশের সেরা ইঞ্জিনীয়ররা আমাদের ঘর তৈরী করে দিয়েছে। সেরা শিল্পীরা আমাদের জন্য শিল্প সৃষ্টি করছে। সেরা বিশ্ববিত্যালয় গড়ে তুলছে আমাদের দেশ। যেখানে আমার ছোটো ছেলেটি একদিন পড়বে—অতএব ঠিকই তো, আমি দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন বই কি।—

তবুও কৌতূহল যায়না। ওর কারখানার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করা হোয়েছিল এত সম্মান সম্পদ প্রতিপত্তি এই সময়ে লাভ করে মাথা ঠিক রাখে তো? উত্তর এসেছিলো "বিগড়ে যাবার সময় কখন? ও যে গৃহিণী,—জননী আর ওযে সোভিয়েতের একটি কর্ম্মী। এই তিনটি গুরুদায়িত্বই। ভরে রেখেছে ওর সবকিছু"—। একথায় মুগ্ধ হয়েছিলাম আর তখনই চেয়েছিলাম ভালো করে দেখতে ওদের গৃহকোণটি। যেখানে সে জননী আর ঘরণী।

সোভিয়েতের প্রতিটি মেয়েই জানে তার দায়িত্ব নিয়েছে রাষ্ট্র। তার সন্তানের জন্মের আগের পরের দু'টি মাস করে পুরা পারিশ্রমিকে ছুটি আর প্রসূতিসদনে তার খরচ বরাদ্দ। অসুস্থতায় চিকিৎসার খরচ নেই। সন্তান পালনের জন্য অর্থ সাহায্য পাবে। তার শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সবার উপরে সে জানে আপন সংসারের কাজ করার মত দেশের কল্যাণে কাজ তার জীবনের এক বৃহত্তম মর্যাদা।

একটি ছোট্টো পরিবারের দিনযাত্রার সুরু। মা ব্যস্ত রান্নাঘরে প্রাতরাশ তৈরীতে। মেয়ে স্কুলের অঙ্ক কষতে কষতে উঠে এসে মায়ের সঙ্গে হাত লাগালে টেবিল সাজাতে। গৃহকর্তা একটি 'অটোমবাইল' প্লান্টের বিভাগীয় প্রধান। তিনি তখন বারান্দায় বসে ভাঙা জলের ঝারি মেরামেত করছেন। খাওয়ার টেবিলে এসে প্রস্তাব করলেন স্কুলের পড়া শেষ হলে মেয়েকে নিয়ে কাছেই ক্লাবের প্রদর্শনী দেখে আসবেন। স্কুলের সময় অনেক আছে। মেয়ে খুশী হোয়ে জানালে স্কুলের কাজ প্রায় শেষ এখনই যাওয়া যাবে। রুটির প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে মা সঙ্গে সঙ্গেই সেটি নাকচ করলেন—আজ নয়—ওটা আর একদিন। আমাকে এখন ওর স্কুলে যেতে হবে স্কুল বসবার আগেই অভিভাবক সমিতির একটি মিটিং আছে। ওখান থেকে সোজা যাবো

অফিসে। অতএব রাতের রান্নাটা বাবাকেই সেরে রেখে কারখানায় বেরোতে হবে। সোৎসাহে বাবা জানালেন—খুব ভালো—তাহলে এখনকার প্রোগ্রাম হোলো ডিনার তৈরী মেয়ের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"তারপর তুমি স্কুল আমি অফিস" ছোট্টো মেয়েটি উজ্জল খুসী ভরা চোখে বললে "তার আগে তুমি আমি তুজনেই রান্নাঘরে—" ছোট্টো ছবি। তবু দেখি সংসারটি গৃহিণীরই বোঝা নয়। তুজনার সম্মিলিত শক্তি সানন্দে বহন করে তার দায়িত্ব আর কর্তব্য।

এদেশে অবশ্য পরিবারের অনেক দায়িত্বই বহন করে রাষ্ট্র। তার মাও শিশু কল্যাণের ব্যবস্থায় মায়েদের পক্ষে সহজ হয়েছে ঘরে বাইরের সমন্বয় সাধন। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট থাকে ক্রেশে, নার্সারি, কিণ্টার গার্ডেন। তুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়েরা সময় পান খাইয়ে আসতে। এই বিরতিটুকু কাজের হিসাবেই থাকে। বিনামূল্যে শিশুর চিকিৎসা আর মাকে নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা এখানে থাকে। তাছাড়া ছোট ছোট দলে মেডিক্যাল ওয়ার্কাররা বাড়ী বাড়ী গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করেন। এই দলে থাকেন চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী আর ল্যাবোরেটারী বিশেষ। ইলেক্টোকার্ডিওগ্রাম, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করা এইসব কাজও এরাই করেন। রাষ্ট্রই বহন করে প্রসবের খরচা।

এছাড়া মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থারও ত্রুটি নেই। প্রতি কর্মকেন্দ্রের বিভাগগুলিতে আছে 'রেডকর্ণার'। নানা ধরণের শিল্পকলায়—প্রচুর বই বিভিন্ন পত্রিকা তাছাড়া ফুল সুন্দর সুন্দর ছবি ইত্যাদিতে সাজানো হল। কর্মী মেয়েরা এখানে এসে পড়াশোনা, আলাপ আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে। কর্মকেন্দ্র সংলগ্ন টেকনিক্যাল স্কুলে মেয়েরা দক্ষতালাভের জন্য শিক্ষা পায়। ইচ্ছামত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভও করতে পারে। প্রতিটি কর্মী মেয়েই বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবার সুযোগ পায়। ভারী কাজের মেহনতী মেয়েরা বাড়তি খাদ্য হিসাবে তুধ, মাখন, ডিম ফল ইত্যাদি পায়। এককথায় জীবন যাত্রার প্রধান সমস্যাগুলির জন্য তারা নিশ্চিন্ত। তাই কাজকে তারা গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে। তাইজন্যই বোধহয় এক সত্তর অতিক্রান্তা অবসর প্রাপ্তা বৃদ্ধাকে বলতে শুনেছিলাম চারপাশে বান্ধবজন আর কর্মব্যস্ততার মাঝখানে থাকাই অভ্যাস—চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকার কথা আমি ভাবতেই পারিনা। অবশ্য বাড়িতেও কাজ

করা যায় তবু যতদিন ক্ষমতা আছে আমার কারখানার কাজকর্ম নিয়েই আমি থাকতে চাই। পেনসন নিয়ে নিশ্চিন্ত অবসর চালনা সত্তর বছরেও—কারণ এদেশে বার্দ্ধক্য দুর্ভাবনার বোঝা আনে না—গলগ্রহ হোতে হয় না। কর্ম জীবনের শেষে পেনসন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা তাদের ত্রুটি ঘটায়না।

তোমরা সবাই কাজ কর কেন? ইচ্ছে করে না বাধ্য হয়ে? প্রশ্ন করেছিলাম একটি গৃহিনীকে। সে হেসে হেসেই পাল্টা প্রশ্ন করেছিল "তোমরা কেন ঘরকন্নার কাজ কর? ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা কর? অসুখ বিসুখে উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় ডাক্তার ডাক পরিচর্যা কর—তাদের ভালোবাস বলেই তো! তেমনি করেই আমরা ভালোবাসি দেশকে যে দিলে আমাদের নারীত্বের পূর্ণ সম্মান আর মনুষ্যত্বের মর্য্যদা"—।

আর একটি গৃহকোণের ছবি এঁকে স্মৃতিচারণ শেষ করি। ছোট্টো ফ্লাট। দুটি ছেলেমেয়ে মা বাবা আর ঠাকুরমা। মা বাবার মিলিত রোজগার মাসে ২৪০ রুবল। আর ঠাকুরমার পেনসন। স্বামী স্ত্রী দুজনাই একটি ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন বিভাগের কর্মী। মেয়েটি দেখালে তার সাজানো সংসার। ফ্লাট ভাড়া ইলেট্রিক ইত্যাদি মিলিয়ে ৬০ রুবল। সুন্দর সৌখিনভাবে সাজানো সব কিছু সূক্ষ্ম সাদা লেসের পর্দা, বেডকভার, ছবি মূর্তি ফটো ফুল দিয়ে সাজানো প্রতিটি ঘর। সর্বত্রই সুন্দর মার্জিত রুচির ছাপ। বাইরের বিভিন্ন কাজকর্মের পরেও এমন গৃহশ্রীর জন্য সোভিয়েতের মেহনতী মেয়েরা গর্ব করতে পারে বৈকি। তখন সন্ধ্যা নামছে। টেবেলের একধারে পড়ার বই খাতার উপর দুটি কচি মাথা ঝুঁকে আছে—অন্যধারে ঠাকুরমা বসে সেলাই করছেন। এধারের দেয়ালে আলমারী আর তাকে প্রচুর বইএর সংগ্রহ-টেবেলের উপর কয়েকটি কবিতার বই। গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাস করলাম কবিতার ভক্ত কিনা। মৃদু হেসে প্রচ্ছন্ন গর্বের ভঙ্গীতে জানালেন 'আমি নয় আমার স্ত্রী'—পাশেই চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত ঘরনীর দিকে চেয়ে বললেন—অবশ্য ও নিজেও একজন কবি। মুগ্ধ বিস্ময়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম কারখানার দক্ষ মেহনতী কর্মীটি কোথায় হারিয়ে গেছে—স্বামীর উক্তিতে সলজ্জ গৃহবধূর ছায়া নেমেছে ওর মুখে—নরম মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরে এগিয়ে দিলে চায়ের পেয়ালা।

কয়েকটী মিষ্টি খাবার

পুর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

চকোলেট টোষ্টিং

আধ পাউণ্ড খুব ভাল চকোলেটের সঙ্গে পরিমাণমত দুধের সর মিশিয়ে উনুনে চাপান। কাদা কাদা হয়ে এলে কয়েক ফোঁটা ভ্যানিলা বা গোলাপ জল ছড়িয়ে দিন। এবারে আগে থেকে টোষ্ট করে চকোলেট পাউরুটীর উপরে মাখন দিয়ে এ পিঠে চামচে করে চকোলেট মাখিয়ে দিয়ে উপরে আর এক স্লাইজ রুটী বসিয়ে দিন।

পাউরুটীর মালপোয়া

কয়েকখানা পাউরুটীর ধার বাদ দিয়ে বেশ পরিষ্কার আকারে চাকা চাকা করে কাটুন। এবারে খানিকটা চিনির রস তৈরী করে একটী পাত্রে রাখুন। এখন পাউরুটীর স্লাইজগুলি ঘিয়ে ভেজে এ রসে ফেলে দিন। খুব বেশীক্ষণ রসে রাখবেন না তাহলে থস্‌থসে হয়ে যাবে। ওপরে একটু চিনি আর গোলাপ জল ছড়িয়ে দেবেন।

পাউরুটীর পায়েস

ক্ষীর ঘন করে নিন—কতকগুলো পাউরুটীর টুকরো ঘিয়ে ভেজে এ ক্ষীরে দিয়ে দিন। অথবা দুধটা খুব ঘন না করলে ও যখন ফুটতে থাকবে তাতে চিনি দিয়ে এ পাউরুটীর টুকরো ঘিয়ে ভেজে দিতে পারেন। নামিয়ে একটু ভ্যানিলা অথবা গোলাপ জল ছড়িয়ে দেবেন।—
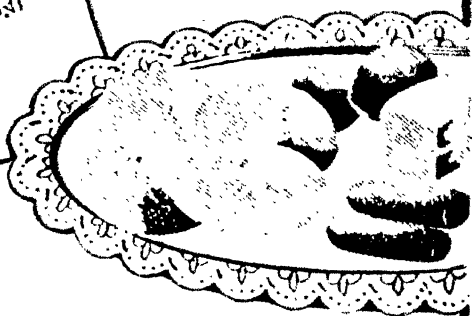
পূজোর দিনে
ও উৎসব অনুষ্ঠানে
লক্ষ্মী ঘি
বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে